সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য

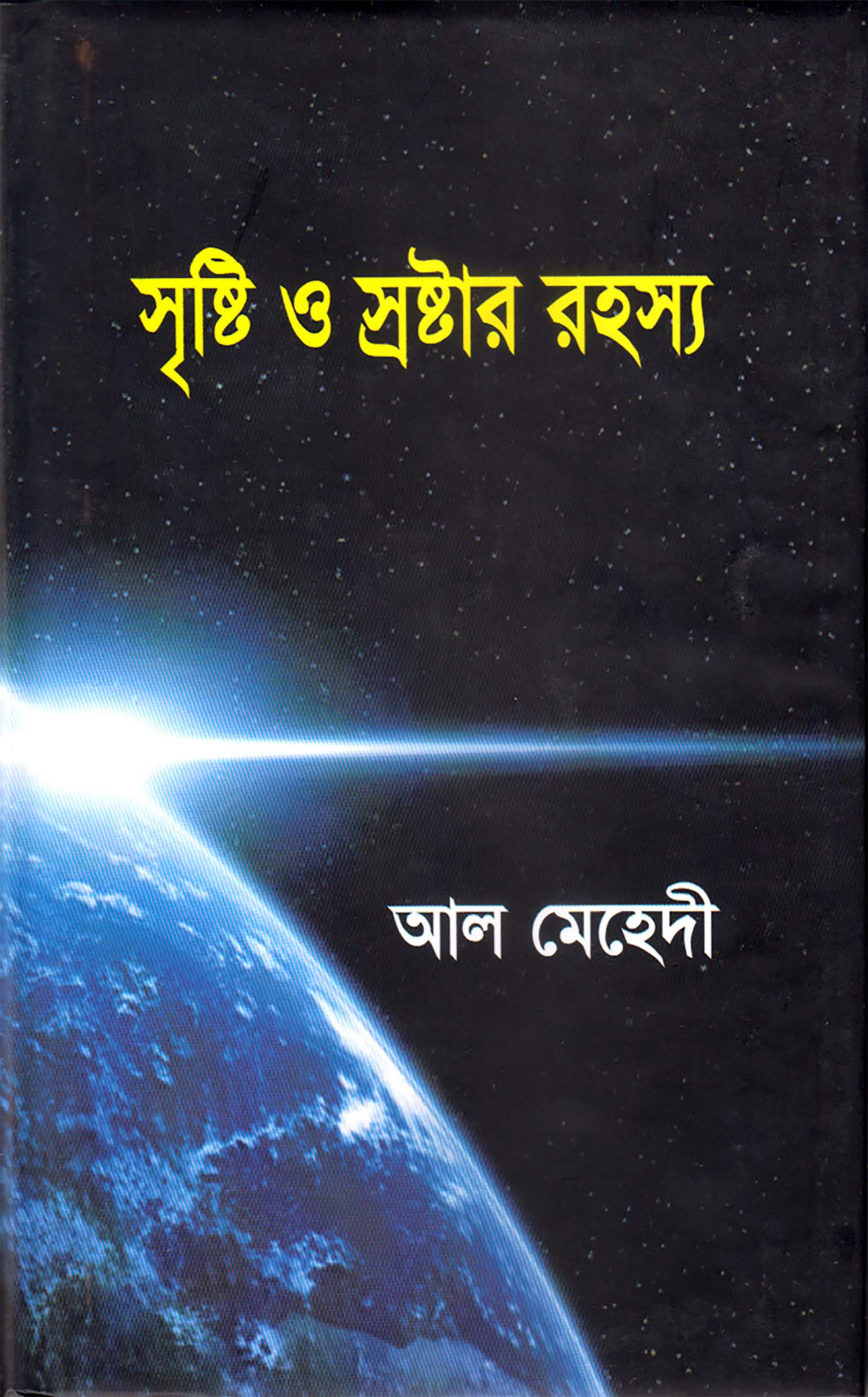

আল মেহেদী

সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য

আল মেহেদী

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য

আল মেহেদী

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

ISBN : 984-300-000294-7

প্রকাশনায়

পরিচালক

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স

১৫ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা।

শো-রুম

দোকান নং-৪, বায়তুল মোকাররম বই মার্কেট

(নীচতলার অযুখানার সামনে) ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭৩৭৪১৯৬২৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

পরিবেশনায়

❖ **আহসান পাবলিকেশন**

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৫৭১৬৪০৪৯, ০১৭২৮১১২২০০

❖ **জ্ঞান বিতরণী**

৩২/২ক নং বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

❖ **খেয়া প্রকাশনী**

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

কম্পোজ ও মুদ্রণ

র‍্যাক্স কম্পিউটার

১৫ নং সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭।

মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

SHRISTI O SHRASTER RAHAIYSSHA Written by AL-MEHEDI Published by RAQS Publications 15 Sideshwary Road, Dhaka-1217, First Edition February, 2009 Second Edition September, 2019. **Price Tk. 300.00 ($ 10.00) only.**

RAQS Book Series : 02

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লেখকের কথা

অপ্রাপ্ত বয়স থেকেই ভাবতাম আল্লাহ্ কিভাবে এতো মানুষের কথা শুনেন? কি করে তাদের ন্যায়, অন্যায়ের খবর রাখেন? দু'চোখ হলে এতো কিছু দেখেন কি করে? মানুষ রাতে দিনে, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কত কিছুই না করে-এর প্রতিদান দেয়া একজনের (আল্লাহর) পক্ষে কি করে সম্ভব? হাশরের মাঠে বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে কে পাপী, কে নেককার তা পার্থক্য করে জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে প্রেরণের সময় তাদের শাস্তির অথবা শান্তির উপাদান, কোত্থেকে দিবেন? এগুলো কি কোন রাজ ভাণ্ডারে পূর্ব থেকে মওজুদ আছে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে উপাদান দিয়ে তৈরী সেগুলো কোথায় ছিল? এগুলো কি আদি হতে বিরাজিত ছিল? থেকে থাকলে কিভাবে, কোথায় ছিল? অথবা না থেকে থাকলে সেগুলো সৃষ্টি হলোই বা কিভাবে? নূর নামের যে পবিত্র সত্তা দিয়ে এ বিশ্বজগতের সকল কিছু পয়দা করলেন, সে সত্তাই বা কি জিনিস? মানুষের সুকৃতি (পুণ্য) ও দুষ্কৃতির (পাপকণা) নামের যে উপাদান মিজানের পাল্লায় ওজন করা হবে, সেগুলোর কি কোন অস্তিত্ব আছে?

এ পৃথিবী আখেরাতের কর্মক্ষেত্র বিধায় সেগুলো কি পৃথিবীর থেকে উৎপন্ন হয়ে কোথাও গোপনে গিয়ে জমা হচ্ছে? গতিশীল গাড়ি কিংবা অন্যান্য মেশিনারীজ (যন্ত্রপাতি) থেকে কালো ধোঁয়া বের হয় আবার পানির স্রোত থেকে প্রযুক্তির মাধ্যমে উজ্জ্বল সত্তাও (বিদ্যুৎ) তৈরী করা যায়। এই পৃথিবীর একটি কণাও স্থিতিশীল নয়। আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা। সে হিসেবে আমরাও কর্মের দায়ে গতিশীল থাকি। তাছাড়া আমাদের জীব কোষের অণু-পরমাণুগুলো পৃথিবীর আপেক্ষিক গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এমনিতেই তাকে গতিশীল আবার এর ভেতর দিয়ে মনের আবেগ কর্ণফুলী নদীর স্রোতের মতো প্রবাহিত হলে তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনের আবদার রাখতে গিয়ে গতির পোশাক পরে কর্মে লেগে যায়। এতে দেহ

www.nagorikpathagar.org

প্রচুর জ্বালানী শক্তি ব্যয় করে। গাড়ি যেমন পেট্রোল, ডিজেল খেয়ে গতিশীল হয়, সে তুলনায় পৃথিবীর খাদ্যের উপাদান থেকে মানুষ জ্বালানী শক্তি পায়। মানুষের বিকীর্ণ জ্বালানী শক্তি (কর্মশক্তি) পৃথিবীর আনাচে কানাচে কোথায়ও জমা থাকে না। এগুলো ক্ষণিকেই অদৃশ্য হয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায়। এই বিকীর্ণ কর্মশক্তি কি কালো ধোঁয়ার মতো কিংবা জীবাণুতুল্য কোন উপাদান? এগুলোর সাথে কি পাপ-পুণ্যের কোন সম্পর্ক আছে?

আল্লাহই যে বিশ্বের আদি সত্তা এর প্রমাণ কি? তিনি কোথা হতে কিভাবে এই বিশ্ব জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তিনি বর্তমানে আমাদের থেকে গুপ্ত থাকার কারণই বা কি? বিশ্ব প্রভু রাজাধিরাজ কাছে আসলে কিংবা দূর থেকে দেখা দেয়াতেই বা সমস্যা কিসের? আল্লাহ কি মানুষের মতো পাপ (অন্যায়) ক্ষমা করে দেন? বিবর্তনের মাধ্যমেই কি পৃথিবীতে আদি মানব মানবীর আবির্ভাব হয়েছিল? আদম (আ) হাওয়া কি স্বর্গ মুলুক থেকে ধরার রাজ্যে নেমে এসেছেন?

ইত্যাদি..... ইত্যাদি অগণিত জটিল জটিল প্রশ্ন আমার মনে কেন জানি সেই বয়স থেকেই উদয় হতো। কাজে অকাজে পথ চলার সময়ও আমি এসব নিয়ে ভাবতাম। কিন্তু আমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় খুব সীমাবদ্ধ ছিল। সেজন্য এই ছোটখাট বুদ্ধির খুঁটি দিয়ে সাগরের মতো কূলহীন প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব ছিল না। তবু আমি সাঁতরাতে থাকি কূল পাওয়ার জন্য। একসময় আল্লাহর মহিমায় সাঁতরাতে সাঁতরাতে ঐ সাগরের মাঝেও আমি আলোর ঝিলিক দেখতে পাই। তখন থেকেই আমার হৃদয়ের দরজাটা একটু ফাঁক হয়। এতে সেই অন্ধকার ফুটিয়ে আলোর কিরণ পড়ে। ফলে মনের সংকীর্ণতাও কিছুটা কেটে যায়। যার মাধ্যমে আমি আলোর মুখ দেখি তা ছিল আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস। কুরআনের শাশ্বত বাণী কোন এক সময় আমাকে মোহিত ও অভিভূত করে এবং রাসূলের (সা) হাদীস আমাকে শত শত প্রশ্নের সমাধান দিতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি যখন কুরআনের বাণী ও রাসূলুল্লাহর হাদীসকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি তথ্যের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তখন এর মাঝে সৃষ্টি তথ্যের নিগূঢ় রহস্য খুঁজে পেয়ে স্রষ্টার প্রেমাবেগে মুগ্ধ হয়ে যাই। এর ফলে স্রষ্টা মহা মহিয়ানকে কিভাবে যে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাব তার ভাষা খুঁজে পাইনি। কিন্তু আল্লাহর মহিমা ও প্রজ্ঞা এতো অসীম যা অনেক সময় বিজ্ঞানের যুক্তি সীমাও ছাড়িয়ে যায়। এর কারণ হলো বিজ্ঞান বস্তু তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই

www.nagorikpathagar.org

তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত মনে করে বলে ধর্মের যেসব তথ্য বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোকে দর্শনের আলোকেও বিচার বিবেচনা করে দেখাচ্ছি। এতে মোটামুটিভাবে আমার মনের বাসরে যেসব প্রশ্ন দানা বাধা ছিল, সেগুলোরও সম্ভাব্য কাছাকাছি সমাধান পেয়েছি। তারপর থেকে এসব জটিল জটিল প্রশ্নের সমাধানগুলো একত্র করে বই আকারে প্রকাশ করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কিন্তু সব মিলিয়ে বই আকারে জন হিতার্থে প্রকাশ করার মতো যোগ্যতা তখন আমার ছিল না। পরিশেষে অপেক্ষার মধ্যেও মনের ভেতর একটা আবেগ কাজ করতে থাকে। যখন বয়সের চাকা চল্লিশের দাগ স্পর্শ করছিল তখন পরম করুণাময়ের অসীম কৃপায় লিখার মতো একটা প্রবল স্পৃহা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে কলম নিয়ে বসায়। এই ক্ষুদ্র বইখানি সেই প্রচেষ্টারই ফসল। যার মধ্যে অনেক প্রশ্নেরই সমাধান রয়েছে।

এই বইটি লিখতে বসে অনেক সময় দেখা গেছে অনেক প্রশ্নের সমাধান বের করতে যেয়ে যখনি আমি জটিল সমস্যায় পড়েছি তখন বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিতে হাত বাড়াতেই তারা অনেকেই বলেছেন– এতো জটিল প্রশ্নের সমাধান বের করতে যেয়ে কি জানি বিভ্রান্ত হয়ে যান কিনা? কিন্তু আমার মনে একটা ধারণা ছিল, চিন্তা শক্তির মাধ্যমে কর্ম প্রভাবিত হলেও ঈমান, আকীদা ও দৃঢ় বিশ্বাস চিন্তা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে গোটা কর্মই বিশ্বাসের অনুকূলে ধাবিত হয়। সেজন্য পরম করুণাময় ধর্ম প্রীতির জন্য আমাকে বিভ্রান্ত হওয়ার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের কিছু কিছু অপরিপক্ক তথ্য আমাকে মাঝে মধ্যে খুব সমস্যায় ফেলে দেয়। তন্মধ্যে যেগুলোর প্রতিবাদ না করলেই চলে না সে সবের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে কিছু লেখতে হয়েছে। কিন্তু গোটা লেখাগুলো যতটুকু প্রাণবন্ত হওয়ার দরকার ছিল তা হয়তো আমি করতে পারিনি। যতটুকু লিখেছি তাও হয়েছে আল্লাহর মহিমায় ও মুরব্বীদের দোয়ার বরকতে। মূলত আল্লাহ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কীয় এতো সব জটিল তথ্য তুলে ধরার কারণ হলো ধর্মের (ইসলামের) ভিত্তিকে মজবুত প্রমাণ করা এবং যেসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং কুসংস্কারচ্ছন্ন, ধর্মীয় নীতি মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করেছে তার অমরত্ব প্রকাশ করা। সূচীপত্রে উল্লিখিত দুরুহ জিজ্ঞাসার বিষয়গুলো সমাধান দেয়া আমার কাছে চন্দ্র বিজয়ের মতো দুঃসাধ্যের ছিল। তবু স্রষ্টা মহিয়ানকে সকল কার্যের সাহায্যকারী হিসেবে প্রার্থনা করে এ গ্রন্থ লিখতে হাত দেই।

www.nagorikpathagar.org

আশা করি স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য নামক এই ব্যতিক্রমধর্মী পুস্তকখানি মানুষের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারবে। ফলে বিভ্রান্তির বেড়াজালে যারা বন্দি তাদেরও আলোর পথ খুঁজে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে।

আমি যা লিখেছি তা একেবারে অকাট্য সত্য নাও হতে পারে। কারণ এসব বিষয়ের উপর আমার প্রাতিষ্ঠানিক দখল একেবারে নগণ্য। সেজন্য একই কথা হয়ত বার বার এসেছে। জ্ঞানের আপেক্ষিকতায় অস্পষ্টতা ও অনিচ্ছাজনিত ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। ইসলামী গবেষক দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণের সাথে আলোচনা করা এবং তাদের পরামর্শ নেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তাঁরা আন্তরিকভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। এজন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

এবই লিখতে আমার যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলেও আমার কোন বিষয়ে ভুল হতে পারে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে থেকে কেউ যদি বইখানা মনোযোগের সাথে পড়ে আমার ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেন কিংবা অতিরিক্ত তত্ত্ব বা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন, তবে সে মোতাবেক পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়ার আশা রাখি। এ গ্রন্থের শিরোনাম থেকে নিয়ে প্রতিটি লেখা লিখতে গিয়ে আমি অনেক লেখক গবেষক ও চিন্তাবিদগণের প্রমাণ্য পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি। তাঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ঋণী। সেজন্য আমি সকলের দু'কূল জীবনের মঙ্গল কামনা করি।

কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি বিশ্ব মানবকূলের কিছু উপকার হয় তাহলে আমার ত্যাগ ও শ্রম সার্থক ও ফলপ্রসু হয়েছে বলে মনে করব। সেই সাথে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী আমি যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি। বিদায়লগ্নে বিশ্ব প্রভুর দরবারে আকুল মিনতি আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির প্রভাব থেকে পাঠককুলকে যেন মুক্ত রাখেন এবং আমাকেও যেন তার প্রভাব কেটে উঠার তাওফীক দেন, আমিন।

বিনীত

গ্রন্থকার

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

পাপ-পুণ্য সম্পর্কে শ্রেণীভেদে ধারণা ৯
মানব দর্শন অপূর্ণ ও আপেক্ষিক ১৫
বস্তু সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা ২০
বস্তু সম্পর্কে বর্তমান ধারণা ২১
বিকিরণ শক্তি কী? ২২
মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তি কি পাপ-পুণ্য? ২৫
মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির রূপ ও তার গুণাগুণ ৩৪
আল-কুরআনের তাৎপর্য ও পাপ-পুণ্যের দৃষ্টান্ত ৪৪
বিশ্বনবীর দৃষ্টিতে কর্মফল ৫৩
মুসলিম দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য ৫৭
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিকীর্ণ কর্মশক্তি ৬৩
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ ৬৮
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুণ্য সত্তা ৭৮
বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক ৮৫
জান্নাত ও পুণ্য সত্তার সম্পর্ক ৯০
জাহান্নাম ও পাপ কণার সম্পর্ক ৯৬
পাপ-পুণ্য হয় কোন পথে ১০১
গতি, বস্তু ও মানুষের বিকীর্ণ সত্তার সম্পর্ক ১০৫
বস্তু ও প্রতিবস্তু এবং বিকীর্ণ শক্তির সম্পর্ক ১০৮
প্রতিবস্তু, পাপ-পুণ্য ও জগতের সম্পর্ক ১১৪
ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও পরজগতের সম্পর্ক ১১৯
পাপ-পুণ্যের কর্তা কে? ১২৫
বস্তুর উপাদান ও Negative-এর উৎস ১২৮
গতি, স্থিতি জগৎ ও পরজগতের সম্পর্ক ১৩৫
জোড়া সম্পর্কে পরকালের ইঙ্গিত ১৩৭
পরকালের সময় সম্পর্কে নতুন ভাবনা ১৪০

www.nagorikpathagar.org

জাহান্নামের আযাব ও বিকীর্ণ কর্মশক্তির সম্পর্ক ১৪৫
জাহান্নামের অবস্থান ও তার বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ১৫১
জান্নাতের সুখ শান্তির বর্ণনা ও কর্মের বিকীর্ণ শক্তির সম্পর্ক ১৬৭
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জান্নাতের অবস্থান ও সুখ-শান্তির সম্পর্ক ১৭৪
ঈমান ও আমলের রহস্যময় শর্ত ১৮১
পরকালের সময় স্থির কেন? ১৮৬
পুনরুত্থানের ধারণা ১৮৯
মৃত্যু কি? ১৯২
মহাবিশ্বের সূচনা কোত্থেকে ১৯৫
শয়তানের অস্তিত্ব ২০৩
আল্লাহ্ই অনাদি সত্তা ২০৯
আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব? ২১৬
আল্লাহ্ কি করে সৃষ্টিকুলের খরব রাখেন ২২২
আল্লাহর রাজ্যশাসন ব্যবস্থার নমুনা ২৩০
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফেরেশতার অস্তিত্ব ২৩৬
নূর কি এবং তা কিভাবে পয়দা হলো ২৪৮
ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সত্তার জন্ম তথ্য ২৫৭
আল্লাহর সৃষ্টি জগতের স্নায়ু রজ্জু ২৬৫
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ কিভাবে মাফ হয় ২৬৮
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মি'রাজ ২৭৫
সশরীরে মি'রাজের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ২৭৬
বোরাক ও রফরফের যান্ত্রিক কৌশল কেমন হতে পারে ২৭৭
বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে নাস্তিক, আস্তিক
ও কুরআনের ব্যাখ্যার পর্যালোচনা ২৮২
এ যেন কেমন কথা! ২৮৩
বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে জড়বাদীদের ধারণা ২৮৪
ভাইত সেকার ও স্মিটের সংশোধিত নীহারিকাবাদ ২৮৫
বিশ্বজগৎ উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও এর পর্যালোচনা ২৮৭

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

পাপ-পুণ্য সম্পর্কে শ্রেণীভেদে ধারণা

মানুষ কল্পনার ডানায় ভর করে নীল-নীলিমার সুদূর ঠিকানায় বেড়াতে চায়। অজানাকে জয় করা যেন তার মনের অদম্য ইচ্ছা। সেজন্য কেউ যদি সাঁঝ-সকালে একটি সাদা বককে এক পায়ে ডোবার হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তখন তার মনে বকটির আগমনের সময়, উড়ে আসার দিক ইত্যাদি নিয়ে ভাবনার উদয় হয়। সে আরও ভাবতে পারে বকটি কখন থেকে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে? কেন এভাবে প্রতীক্ষা করছে? বকটি কোথা হতে উড়ে এসেছে? তার কি কোন সঙ্গী-সাথী নেই? তার পিতা-মাতা কোথায়? তারা কী এখনও জীবিত আছে? ওরা কেন সাথে আসেনি? ঝড় বৃষ্টি আসলে সে একা যাবে কোথায়? বক গোষ্ঠীর প্রথম মাতা-পিতা কোত্থেকে এলো? কে তাদেরকে বানালো? তাদের গায়ের রঙ সাদা হলো কেন? মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থেকে এরূপ হাজারো ভাবনার উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। জ্ঞানীর মাথায় এরূপ কত যে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় করে তার ইয়ত্তা নেই।

এখন প্রশ্ন হলো মানুষ কেন এতো সব ভাবে? কেনইবা মানুষ প্রত্যেক জিনিসের কিনার খোঁজে? এই পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য নীল আকাশ ইত্যাদি কে বানালো? কেনই বা বানালো? মানুষ কেন হলো? মানুষের শেষ ঠিকানা কোথায়? পাপ-পুণ্য বলতে কিছু আছে কী? অথবা পাপ-পুণ্যের সাথে দুনিয়ার জীবনের কি কোন সম্পর্ক আছে?

আমরা যতই ভাবি না কেন শত জিজ্ঞাসার স্পৃহা আমাদেরকে ক্লান্ত করতে পারে না। কিসে যেন আরও জানার প্রেরণা জোগায়। এই ভাবনা আর প্রেরণা থেকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের সব জায়গায় একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাই। তখন ভাবি, এই সম্বন্ধ কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই এর কোন নিয়ন্তা আছে। তখন মনের হৃদয়পটে ভাসে সেই নিয়ন্তার ইচ্ছা অভিব্যক্তিরস্বরূপ। তিনিই এই সুন্দর পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়মের চালক।

এখানের সাদা বক, খয়েরি বক, লাল বক; তাদের পিতা-মাতা, নীল আকাশ,

www.nagorikpathagar.org

আকাশের বুকে অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র বেষ্টিত ওজন স্তর, সবই সেই নিয়ন্তার অভিব্যক্তির ফল। এভাবে ভাবতে গিয়ে অজানাকে জানা হয়। যতই জানা যায়, ততই যেন মানুষ সুখী হয়, শান্তি পায়। জানতে জানতে প্রকৃতির শেষ ঠিকানা, অন্তহীন আকাশ, মানুষের কথা, সৃষ্টির ঠিকানা, গ্রহ-নক্ষত্রের সন্তরণ, মর্তের খবর, পরজীবনের দেনা পাওনার হিসাব নিকাশের খবর, একে একে সবই জানা হয়। জানতে পারলে কাছে যাওয়া যায়। প্রেম করা যায়। এই প্রেম সুখ দেয়, শান্তি দেয়। তাহলে নবতর প্রশ্ন প্রেম কি? প্রেম হলো ঐশী চেতনাবোধ। একে দেখা যায় না, এর কোন গন্ধ নেই, রূপ, রঙ, আকার আকৃতি কিছুই নেই। তবু এতে স্বাদ আছে, সুখ আছে, আনন্দ আছে। এতে যৌবনের মতো পরম তৃপ্তি আছে। আছে এর রাজ সিংহাসন। এর স্বাদ বুড়োবুড়ির গল্প বলার মতো সুখময়। এর সিংহাসন প্রজাপতির ডানার মতো গতিময়। এর যৌবন চাঁদনি রাতের আকাশের মতো নির্মল। এর আকর্ষণ কিশোরীর ডাগর চোখের দৃষ্টির ন্যায়। প্রেমের সম্পর্ক গভীর হলে, যতই দেখা যায় ততই কাছে যেতে মন চায়। তবু তার স্বাদ যেন ফুরায় না। আরো... আরো... আরো... গভীরে যেতে মন হয় ব্যাকুল। কিন্তু যত কাছে যাওয়া যায় তখন দেখা যায় তার কোন কূল কিনারা নেই। সে তো এক অসীম জগৎ। অফুরন্ত রহস্যের খেলা।

এই অসীম জগতের অন্তরালে কার যেন অদৃশ্য কুদরতি হাত প্রসারিত। সেই কুদরতি হাতের কারুকার্যে এপার দুনিয়ার কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণের সাথে ওপার জীবনের রয়েছে নিগূঢ় সম্পর্ক। আত্মার সাথে দেহের যেমন সম্পর্ক, ক্রিয়ার সাথে প্রতিক্রিয়ার যেমন মিল, নাড়িভুড়ির সাথে খাদ্যের যেমন দুস্তি, বস্তুর সাথে প্রতিবস্তুর যেমন সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ তেমনি দুই অভিব্যক্তি। একটি যেমন দেহ অপরটি হলো তার ছায়া। সেজন্য দুনিয়ার অন্ধরা (মূর্খরা) ওপার জীবনেও থাকবে দৃষ্টিহীন। কিন্তু পরপারের জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে দুই ব্যতীক্রমধর্মী নিবাস। যার সাথে পৃথিবীর আলো বাতাসের কোন মিল নেই। এই দুনিয়ার প্রকৃতি নামের দ্রুতযানের কামরায় চড়ে একই সাথে যেমন শিশু-কিশোর যুবক-বৃদ্ধ, সুখী-দুঃখী, পাপী-তাপী, মুমিন-মুসলমানসহ সকল যাত্রীরা তাদের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে কিন্তু পরপারের জীবনে সুখীর সাথে দুঃখীরা থাকতে পারবে না, একের সাথে অন্যের কোন দিন হবে না দেখা, হবে না কোন দিন মনের ভাব বিনিময়। তাই সুখীর স্থানে আছে শুধু সুখ-শান্তি, আরাম আর আরাম, আনন্দ ভালবাসাময় স্বর্গীয় অনুভূতি। অপরদিকে দুঃখীর স্থানে আছে শুধু দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণা।

www.nagorikpathagar.org

এই দুনিয়াতে কোন প্রাণীই দুঃখ চায় না, কষ্ট চায় না, চায় শান্তি-সুখ, ভালোবাসা আর আনন্দ। সেজন্য পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই শান্তির সোনার হরিণের খোঁজে তার অন্বেষায় ঘুর ঘুর করে ঘোরে। পাখিরা যেমন ঝড়ের সময় ঠাঁই খোঁজে, পশুরাও তেমনি ঝড় বৃষ্টির সময় আশ্রয় খোঁজে। মানুষ খোঁজে চির-শান্তির যৌবন, খোঁজে চির-সুখের আবাস ভূমি। তারা চায় না দুঃখ-কষ্ট, চায় না মৃত্যু, ক্ষুধা, চায় না রোগ-যন্ত্রণা। চায় অমৃত সুধা, চায় চির যৌবন। কিন্তু এই পৃথিবী নামক গতিশীল প্রকৃতির কামরায় তো সে সুখ, সে যৌবন বসে থাকে না। গাড়ির গতির সাথে সাথে দেহ ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি যন্ত্রগুলোও একদিন খটখটে হয়ে যায়। তখন প্রকৃতির জীবাণু যাত্রীরা সেই ফাঁকা জায়গায় চড়ে বসে। এতে করে দেহ যন্ত্রের অস্তিত্বের মাঝে শুরু হয় বিদ্রোহ, চলে যুদ্ধ। পরিশেষে ঐ যুদ্ধে সে পরাজয় বরণ করে। তখন মৃত্যুই তাকে শান্তি এনে দেয়, বিশ্রাম এনে দেয়। সেই সাথে যৌবনেরও মৃত্যু ঘটে। আশার তরী অকালেই ডুবে যায়।

প্রকৃতি নামের চলন্ত গাড়ির কামরায় প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে অবিরাম গতির মধ্যেও যারা হতাশার সাগর পাড়ি দিয়ে জীবন যুদ্ধে হেরে যেয়ে, জীবনের স্তব্ধতায় সবকিছু থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখন তার বেলায় গতির মৃত্যু ঘটে। ফলে সময় তার ক্ষেত্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন থেকে সে অপেক্ষা করতে থাকে নতুন জীবনের জন্য, নতুন বাসস্থানের জন্য। তার প্রতীক্ষা অফুরন্ত যৌবনের জন্য। জীবন চায় অসীম সুখ-শান্তি ভালোবাসা। কিন্তু সেখানের সকল সুখ-শান্তি আনন্দ-ভালোবাসা সবই তো দুনিয়ার কর্মের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। কর্মফল ভালো হলে জীবন হবে সুখের, আনন্দের, আর মন্দ হলে জীবন হবে দুঃখের ও বিস্বাদের। দুনিয়ার ভালো কর্ম থেকে হয় পুণ্য আর মন্দ কর্ম থেকে হয় পাপ। আমরা প্রকৃতির নিয়মের সাথে একাকার হয়ে পাপ-পুণ্যের আকার, আকৃতি, রূপ-শোভা কিছুই দেখতে পারি না।

যে জিনিস দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না; তাকে নিয়েই যত সব সমস্যা। কেউ বলে পাপ-পুণ্য আছে। কেউ বলে পাপ-পুণ্য বলতে কিছুই নেই। কেউ বলে দুনিয়াটাই পাপের জায়গা। মরলেই মুক্তি। যত মন তত মতি, ততই যেন যুক্তির মহড়া। কেউ কারও সাথে হার মানতে চায় না। সত্যকে সহজে স্বীকার করে নিতে চায় না। সেই থেকে অনেক ভাবনার দানাগুলো দিয়ে উৎপত্তি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। সেই ভাবনার জগৎ পাহাড়ের মতো। মানুষের মনের ভাবনার পাহাড়গুলো হলো অসীম হিসেবে তার সীমাবদ্ধতার প্রাচীর। এই প্রাচীর ছেদ করে কেউ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না, মানুষ জ্ঞানের দিক থেকে যেমন

www.nagorikpathagar.org

অপূর্ণ তেমনি সৃষ্টির শ্রেণীগত বৈষম্যের জন্যও তার দৈহিক সত্তা সবকিছুতে সহনশীল নয়। আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়, অনুরূপভাবে রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলেও মানুষ অস্বস্তিবোধ করে। আগুন দ্বারা যেমন আগুন আক্রান্ত হয় না তেমনি জীবাণুর দ্বারা জীবাণু আক্রান্ত হয় না। পরিবেশের অধীনে শ্রেণীগত বৈষম্য এক প্রকার অপূর্ণতা। আমাদের পক্ষে এই অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাকে হজম করা সম্ভব হয় না। তবু আমরা নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও আপেক্ষিকতাকে অবহেলা করে নিজেদের এই অপূর্ণতাকে কোন কোন ক্ষেত্রে চরম পূর্ণতা মনে করি। আমরা চিন্তার সাগরে যে যতটুকু অতিক্রম করতে পারি, সে ততটুকু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি। মনে করি এর মাঝেই আছে সব সত্য, সব সমস্যা ও সব রহস্যের সমাধান। অথচ জগতের রহস্যের তখনো আমাদের বিন্দু পরিমাণও জানা হয়নি। কিন্তু এসব বিন্দু জ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দল, বিভিন্ন মতবাদ। এসব মতবাদ থেকে ধর্মীয় বিষয়েও ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে।

মানুষের গড়া মতবাদ থেকে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে শ্রেণীভেদে যত ধারণার উৎপত্তি হয়েছে সবই আপেক্ষিক ও ভুলের জালে আবদ্ধ। আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং প্রবৃত্তির লালসা থেকে যেসব ভ্রান্ত মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলো মানুষের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সেখান থেকে সত্যের হাতিয়ার দিয়ে ভুলের জাল ছিঁড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু এই জাল খুব মিহি ও শক্ত। এতে শয়তানী হাতের কারুকার্য মেশানো। সেজন্য একে ছিঁড়তে হলে আলোর পথ অনুসরণ করতে হবে। কারণ শয়তানের কলিজা অন্ধকার ও বক্রবাহু সীসাঢালা প্রাচীরের মতো শক্ত। সেই পথের অনুসারীদেরও অবস্থা অনুরূপ। তারা জগৎময় অন্ধকার ব্যতীত কিছুই দেখে না। তাদের কাছে আলেয়ার আলোই পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। অথচ তাদের ধারণা অন্তঃসার শূন্য বিভ্রান্তিময়। এদের রয়েছে অনেক দল-উপদল, রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। তারা একে অন্যের কথা বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকেই নিজেদের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে করে। বিভ্রান্তির অতল নরকেও তারা বেহেশতের সুখ তালাশ করে। কিন্তু শিকারীর অন্ধকার ফাঁদ থেকে তারা আলোর সন্ধান পায় না। তাই নিম্নে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে শ্রেণীভেদে যে ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তা তুলে ধরা হলো :

১. এক শ্রেণীর লোক মনে করেন পৃথিবীটাই মহাপাপ ও মহাশাস্তির স্থান। যতদিন এই জড়-জগতের সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক থাকবে ততকাল তাকে মৃত্যুর পর পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এখানেই ফিরে আসতে হবে। তাদের

www.nagorikpathagar.org

ধারণা মানবাত্মার প্রকৃত মুক্তি তাদের ধ্বংসে। একে তারা মহানির্বাণ বলে। পুণ্য যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হয় তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

২. আর একটি দল আছে তারা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষগণ ছিল আল্লাহর অতীব প্রিয় ও মনোনীত ব্যক্তি। সেজন্য তারা পাপী হিসেবে দোযখে নিক্ষিপ্ত হলেও আল্লাহ তাদেরকে ঐ বংশের মর্যাদায় বেহেশতে প্রমোশন দিবেন।

৩. পরকালে বিশ্বাসী একদল লোক মনে করে খোদা তার একমাত্র পুত্রকে শূলবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এর বিনিময়ে তিনি মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্তি দিবেন। সেজন্য এই পুত্রের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে তাঁর কিছু গুণগান করলেই পরপারে মুক্তি পাওয়া যাবে।

৪. আর একটি শ্রেণী আছে, যারা পরকালীন জীবনের সবকিছুতে বিশ্বাসী হলেও তারা দুনিয়াতে বিশেষ কিছু গুণসম্পন্ন ও অতি শক্তিশালী ব্যক্তিগণকে পরকালের মুক্তির বাহন মনে করে, আর এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (সা) সুন্নতী জীবন ব্যবস্থাকে অনুসরণ না করে তাদের সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের ধারণা তিনি সন্তুষ্ট হলেই তাকে পরকালে মুক্ত করে দিবেন।

৫. আর একটি দল আছে এরা পুনঃজীবন লাভ বিশ্বাস করে না। তাদের ধারণা পাপ ও পুণ্য বলতে কিছুই নেই। তারা মনে করে মানুষের দুনিয়ার জীবন ফুরিয়ে গেলেই তার বিলুপ্তি ঘটে।

৬. আর একটি দল আছে নির্বোধ শ্রেণীর। এরা নদ-নদীর প্রবাহমান স্রোতের উপর ভাসমান কচুরীপানার মতো। তারা স্রোতের টানে ঢেউ এর ছন্দে ছন্দে নেচে দুলে হেলায় খেলায় জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা কোথা হতে এলো, কোথায় যাবে, কেন দুনিয়ায় এলো, কিছুই জানে না। এদের মনে পাপ-পুণ্যের বোধ বলতে কোন ধারণা নেই।

৭. আমাদের মাঝে পরকালে বিশ্বাসী আর একটি শ্রেণী আছে এরা পাপ-পুণ্যে বিশ্বাসী হলেও দ্বীনের হুকুম আহকাম তেমন মানতে রাজী নয়। তারা মনে করে অন্যায় ও অসৎ কাজ না করলেই হলো। বিচার তো অন্যায় আর অসৎ কাজেরই হবে, না করলেই তো মুক্তি পাওয়া যাবে। মূলত এরা পুণ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

৮. সবশেষে ঐশী মতবাদে বিশ্বাসী শুদ্ধ ধারণা পোষণকারীগণ মনে করেন, এ জগৎ পাপ-পুণ্যের সত্তা তৈরীর প্রকৃত স্থান। এই সত্তা নিজেদের অর্জিত

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ। তাদের বিশ্বাসের মূল তাবিজ হলো ঐশী কিতাব। এদের মধ্যে নিজেদের কোন দর্শন নেই। তারা মনে করেন মানুষের জ্ঞান সসীম। তাই মানব রচিত দর্শন ভিত্তিক ধারণার উপর জীবন ব্যবস্থা চলতে পারে না।

উপরোল্লিখিত পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে কোনটি নির্ভুল ও সঠিক তা যাচাই বাচাই করার একমাত্র পথ হলো ঐশী কিতাব। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন নির্ভুল জীবন বিধান দিয়ে, যেন মানুষ বিভ্রান্তির বেড়াজাল ভেঙ্গে আলোর পথে আসতে পারে। বর্তমান যামানায় একটি মাত্র ঐশী কিতাব ব্যতীত প্রায় সকল নবীর কাছে প্রেরিত ঐশী কিতাবগুলোর সংরক্ষণ ধারা ঠিক না থাকায় সেগুলোতে অনেক কুসংস্কার প্রবেশ করেছে। একমাত্র নির্ভুল ও সঠিক ঐশী কিতাবটি হলো আল-কোরআন। যারা এখনো আল-কুরআনের আলো পায়নি তারা এখনো বংশানুক্রমেই তাদের মুরব্বিদের ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে আসছে। তাদের রীতি-নীতি ত্রুটিপূর্ণ হলেও তারা একেই বিশুদ্ধ মনে করে। এমনকি তারা প্রয়োজনে নিজেদের দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রশাসনের তাগিদে সেসব ধর্মীয় রীতিনীতি রদ-বদল করে শিথিল ও সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনের মর্জি মতো বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মানুষের মর্জি মতো জীবন ব্যবস্থা চালানোতে যেমন কোন সার্থকতা নেই তেমনি এটি স্রষ্টার কাছেও গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষেই মানুষের দর্শনভিত্তিক অনুমান বিজ্ঞানের যুক্তিতেই অকাট্য নয়। বিজ্ঞানের কথা হলো মানুষের দর্শন আপেক্ষিক। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– "তাদের কাছে কোন সত্যিকার কিতাব নেই, তারা শুধু আন্দাজ-অনুমানের পায়রুবী করে চলে। আর অনুমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা সত্যের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পূরণ করে না।" (সূরা-৫৩ : ২৮)

"যারা জ্ঞানবান লোক, তারা তোমার প্রতি প্রভুর কাছ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাবকে মনে করে যে, এ-ই হচ্ছে সত্য; এটি মানুষকে পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত আল্লাহর দিকে চালিত করে।" (সূরা-৩৪ : ৬)

"হে মুহাম্মদ! বলে দাও যে, যিনি আসমান ও জমিনের সমস্ত রহস্য জানেন, এ কিতাব তিনিই নাযিল করেছেন।" (সূরা-২৫ : ৬)

বাস্তবিকপক্ষে আজ মানুষ যেটি সত্য মনে করে কাল সেটি সত্য নাও হতে পারে। কিংবা আজকে যা ভুল সেটিই আবার পরবর্তীতে মানুষের কাছে সত্য হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

তাই পাপ-পুণ্য কি এবং কোন পথে তা হয় সে কথা মানুষের পক্ষে সত্য করে বলা সম্ভব নয়। আমরা যদি প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দর্শনের আপেক্ষিকতা যাচাই বাছাই করে নিজেদের দর্শনের উপর নির্ভরশীল না হয়ে ঐশী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী পথ চলতে সক্ষম হই, তাহলেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।

মানব দর্শন অপূর্ণ ও আপেক্ষিক

মহাবিশ্বের বিশালত্বের মাঝে এই সুন্দর পৃথিবী একটি পরমাণুর মতোও নয়। অঙ্কের বেলায় যেমন .০০০০০১ এরূপ ভগ্নাংশ পরিমাণ সংখ্যাকে বাদ দিলেও অঙ্কের ক্ষেত্রে তেমন ভুল হয় না, তেমনি মহাবিশ্বের বিশালত্বের মাঝে এই পৃথিবীকে বাদ দিলেও তেমন কোন ভুল হবে না। যে পৃথিবী মহাবিশ্বের তুলনায় একটি নগণ্য পরমাণুর ন্যায়ও নয়, সেই পৃথিবীই আমাদের কাছে কিনারাবিহীন সাগরের মতো অসীম মনে হয়। আদৌ এর আগা গোড়া দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। না পারি জানতে সাগরের তলদেশের খবর, না পারি জানতে অরণ্যের পশু-পাখির মনের কথা। এই পৃথিবীর একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে আমরা বাস করি। এখানে পশু-পাখির চেয়েও আমাদের সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি মনে হয়। এক রাষ্ট্রের পশু পাখি পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই অন্য রাষ্ট্রে ঘুরে বেড়াতে পারে। বি.ডি.আর, বি.এস.এফ-এর সামনেই সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে এক দেশের গাছ থেকে অন্য দেশের গাছে আসা যাওয়া করে। কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে আমরা ততটুকু স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারি না। পাখিকুলের আকাশে উড়তে উড়োজাহাজ রকেটের প্রয়োজন হয় না। এ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাধা অতিক্রম করে অনেক উপর দিয়ে প্রকৃতির মাতৃসাগরে সাঁতার কেটে কেটে মনের আনন্দে পরম সুখে বিচরণ করে দিন ভর। কখনো বাতাসের সাথে মিতালী করে তার প্রবাহের অনুকূলে ডানা মেলে শান্তভাবে শুয়ে থাকে। কখনো আবার অভিমান করে তার উল্টো দিকে সাঁতার দেয়। মেঘ মুল্লুকের দেশ, পাহাড়ের চূড়া নিমিষেই তারা ঘুরে-ফিরে আসতে পারে। তাদের চলা ফেরার কোন ভয় নেই, বাধা নেই, নিষেধ নেই, নেই কোন পাসপোর্ট ভিসার সমস্যা।

কিন্তু এদের তুলনায় আমাদের সীমাবদ্ধতা প্রচুর মনে হলেও এদের জানার আগ্রহ নেই, চিন্তার মণিকোঠা, ভাবনার ঝুড়ি এসব কিছুই নেই। অথচ আমাদের জানার ব্যগ্রতা আছে, চিন্তার মণিকোঠা, ভাবনার ঝুড়ি সবই আছে। আমরা রহস্যের সন্ধান পেলে তার আগাগোড়া খুঁজি, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কিনার না পাওয়া যায় ততক্ষণ শুধু খুঁজতেই থাকি। কখনো ধ্যানের আসর বসিয়ে নিভৃত চিন্তার

www.nagorikpathagar.org

মণিকোঠা থেকে বের হয়ে আকাশের অনন্ত ঠিকানা পর্যন্ত, এমনকি পাতালপুরীর রহস্য রাজ্য ঘুরে আসতে পারি। তারপরও আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, দেখার অপূর্ণতা সীসাঢালা প্রাচীরের মতো কঠিন মনে হয়। আমরা একে কোনক্রমেই ভেদ করতে পারি না, তার বাইরে যেতে পারি না। স্থান-কাল, গতি, বস্তু ও ঘটনার সাথে একাকার হয়ে মিশে থাকি বলে আমরা আগে পরের কোন খবর বলতে পারি না।

আমার জন্মের পূর্বে বিশ্বজগতের অবস্থা কেমন ছিল তা যেমন আমার পক্ষে সঠিকভাবে কখনো বলা সম্ভব নয়, তেমনি আমার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে কি ঘটবে তাও কখনো বলা যাবে না। আগে পরের ধারণার মাঝে যেমন রয়েছে আমাদের সীমাবদ্ধতা তেমনি বর্তমানের ধারণার মাঝেও রয়েছে প্রচুর অপূর্ণতা। আমরা মুখে বিভিন্ন কথা বলি চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি অথচ এই কথাগুলো আদৌ পুরোপুরি সত্য কি না, তাও তলিয়ে দেখি না। কান দিয়ে যদি শুনা-ই যেতো তাহলে প্রতি সেকেণ্ডে ২০ এর কম ও ২০,০০০ এর বেশি কম্পন সংখ্যার শব্দ কেন শুনতে ও বুঝতে পারি না। কেনই বা অন্য প্রজাতির প্রাণীর শব্দ বুঝতে পারি না। অপরদিকে চোখ দিয়ে যদি দেখা-ই যেতো তাহলে আমরা অন্ধকারের জিনিস, দূরের জিনিস কেন দেখতে পারি না। সে কারণে দেখতে হলে যেমন আলো থাকা দরকার তেমনি শুনতে হলে শ্রুত শব্দ ও কম্পন সৃষ্টিকারী মাধ্যম থাকা প্রয়োজন।

আলো যদি কোন দৃশ্যের প্রতিবিম্ব তুলে নিয়ে আমাদের চোখের পর্দায় না ফেলতো তাহলে চোখ অবিকল থাকলেও আমরা দেখতে পারতাম না। সেরূপ পৃথিবীতে যদি কম্পন সৃষ্টি হওয়ার মতো কোন মাধ্যম না থাকতো তাহলেও আমাদের কান থাকা সত্ত্বেও কিছুই শুনতে পারতাম না। আমরা অনেক না দেখা জিনিসকে হৃদয়ের মণিকোঠায় ভাবনার সূক্ষ্ম দানাগুলোকে দিয়ে আলোর প্রতিবিম্বের মতো সাজিয়ে সাজিয়ে তার ছবি এঁকে অনেক অদৃশ্য জিনিসেরও অস্তিত্ব অনুভব করি। জ্ঞানের পর্দার উপর অনুভূতি নামক সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে ধরে তাকেই যুক্তির নিক্তিতে তুলে ওজন করে বিশ্বাস করি। অথচ আমরা যত নিখুঁতভাবেই দেখি না কেন, জ্ঞান সাগর কূলহীন বলে এবং দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য কোন জিনিসকে নির্ভুলভাবে দেখতে পারি না। পক্ষান্তরে সসীম হিসেবে অসীমের দূরত্ব পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একটি জিনিসের সম্পূর্ণ অংশ এক সাথে দেখতে পারি না বলে আমরা সে জিনিসটির সম্পূর্ণ অংশ দেখার জন্য একই জিনিসের প্রতি খানিক স্থান পরিবর্তন

www.nagorikpathagar.org

করে আবার দৃষ্টি দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রথমে যেটুকু অংশ দেখা হয় সেখানেই যদি পর মুহূর্তে কোন কিছু ঘটে তাহলে সে অবস্থাটি আমাদের জানার বাইরে থেকে যায়। এখানেই আমাদের অপূর্ণতা। সে কারণে আমাদের দেখার বিষয়টি সর্বক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিজ্ঞানের ভাষায়, আমরা যা কিছু দেখি সব আপেক্ষিক। বস্তু ও সময়ের সূচনা একই সময় হয়েছে বিধায় বস্তু, কাল এবং গতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ফলে আজ যে জিনিসটি সত্য কাল তা সত্য নাও হতে পারে। অপরদিকে আমাদের বাহ্যিক জ্ঞান স্থান-কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও পরিবেশের অধীন। সে জন্য আমাদের পক্ষে কোন জিনিসের পূর্ণ জ্ঞান নিতে হলে তার অভ্যন্তরের খুঁটিনাটি জিনিস অবগত না হয়ে তার সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব হয় না। বরং এই জ্ঞানও একটি বিশেষ সময়ের জন্য কার্যকরী থাকে। যেমন সকাল বেলা পুকুরের পানি ঠাণ্ডা হলেও দুপুরে কেমন তা জানার জন্য আবারও পানিতে নামতে হয়। কারণ সকালের অভিজ্ঞতার উপর দুপুরের বর্ণনা দিলে তা সত্য নাও হতে পারে। সৃষ্টিকর্তা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন– "আমি প্রত্যেক জীবিত পদার্থকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি।"

কিন্তু আমরা পানিকে ভেঙ্গে রেণু রেণু করে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মৌল উপাদান পেলেও শত চেষ্টা করেও কোন জীবিত পদার্থ সৃষ্টি করতে পারি না। পক্ষান্তরে আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা থাকার পেছনে অনন্ত রহস্য বিরাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়। রাতের আকাশের অসংখ্য তারার মিটিমিটি দৃশ্য দেখে আমাদের নয়ন মন মুগ্ধ হলেও সেখানে যে কি ঘটছে তা তো আমরা দেখতে পারি না। হয়তো এমন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাচ্ছে যা দেখলে আমাদের চোখ বিস্বাদে বন্ধ হয়ে যেতো। তখন নয়ন মেলে দ্বিতীয় বার আর কিছু দেখার সাহস থাকতো না। কিংবা ভয়ে মন প্রাণ শিহরিয়ে হৃৎ কম্পনের গতি বৃদ্ধি হয়ে দেহ কোষের আবরণ ভেদ করে পানির নহর বয়ে চলতো। তাই আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা জগতের অনেক কিছুকে আড়ালে রেখে আমাদেরকে পরম করুণায় বাঁচিয়ে রেখেছে বৈকি। আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা শুধু প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখে না; সেই সাথে এটি সমাজ জীবনের আইনকে করে দেয় শিথিল ও লাগামহীন। এসব কারণে মানুষের দর্শন আইনে পরিণত করা যায় না কিংবা তা সমাজ কাঠামো গড়ার জন্য অপরিহার্য মনে করাও ঠিক নয়।

মানুষের মনে রহস্যময় এক কীট সর্বদাই নড়াচড়া করে। সেটি ভাবনার পোকা। এই পোকা সৃষ্টির রহস্য খোঁজে, তার কিনারা তালাশ করে। এক সময় এই পথে

www.nagorikpathagar.org

ভাবতে ভাবতে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এ থেকে জগতের স্রষ্টার অনুপম দর্শন (মারিফাত) লাভ হয়। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন মহাশিল্পীর শিল্পকর্মের উদ্ভাবিত ফর্মূলার নিয়ম নীতি অনুসরণ করা। যারা তাঁর উদ্ভাবিত ফর্মূলা অনুসরণ না করে নিজেই দক্ষ কারিগর সেজে স্রষ্টার সৃষ্টির তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে, তারা সৃষ্টি সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এর ফাঁক দিয়ে সামান্য কিছু একটা জ্যোতির ঝলকানি দেখেই বলে দেয় জীবনের উৎপত্তি সাগরের লোনা পানি থেকে। পানি হতে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর উৎপত্তি ঠিকই কিন্তু পরম আত্মার উৎপত্তি অন্য কোথাও। বর্তমানে আস্তিক বিজ্ঞানীদের ধারণাও তাই। কিন্তু জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য ভিন্ন পথের ভুল ব্যাখ্যাকারীগণ এবং তার অনুসারীরাও ভুলের মাঝে হাবুডুবু খায়। সেজন্য মানব রচিত জীবন দর্শন মূল্যহীন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই ভুলের দিকটিই আমাদের চোখে পড়ে। অথচ অমঙ্গলদায়ক রিপুটি প্রতিবারই আড়ালে থেকে যায়। অবশেষে এই রিপুটি একদিন প্রবল আকার ধারণ করে সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। তখন চরম বিশৃঙ্খলার প্লাবন শুরু হয়ে যায় জীবন ও জগৎ জুড়ে। এতে দুর্ভিক্ষ, অনাচার, শোষণ, নির্যাতন মহামারী জীবনকে অকালেই মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেয়।

এদিকে স্রষ্টার জীবন বিধানই অভ্রান্ত ও নির্ভুল। এ পৃথিবীতে জীবন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা গড়ার জন্য মানব রচিত যত তন্ত্র, মন্ত্র দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে মূলত তার সবকটি দর্শনই অপরিপক্ক। সে কারণেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হোতা কার্ল মার্কস ও লেলিনের দর্শন আজ আত্মহত্যা করেছে।

আমাদের দর্শনের আপেক্ষিকতার জন্য আমাদের মাঝে শ্রেণীভেদে পাপ সম্পর্কে যত মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তার সবক'টি বিভ্রান্তিকর। একমাত্র সত্য পথ ও জীবন দর্শন হলো ওহীর নির্দেশিত পথ। সেটি চিরন্তনভাবে এখনও মজবুত সংরক্ষণ ধারায় নির্ভুল ও অভ্রান্ত আছে। আমাদের পক্ষে পাপ-পুণ্যের অস্তিত্ব দেখা সম্ভব হয় না বিধায় এই পৃথিবীর বাইরে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর স্থানে পাপ-পুণ্যের সত্তা দিয়ে কোথায় কি তৈরী হচ্ছে তাও জানা সম্ভব হয় না। কারণ আমরা কোনক্রমেই স্থান কালের ঊর্ধ্বে বিচরণ করতে পারি না।

আমরা না পারি একদিনের জন্য পৃথিবীর জীবন থেকে অবসর নিয়ে পরকালীন জীবন ব্যবস্থার স্বাদ, গন্ধ অনুভব করে পৃথিবীতে ফিরে আসতে, না পারি মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম নিয়ে সেখানের তর্জন গর্জন কিংবা সুখ শান্তির খবর পৃথিবীবাসীকে দিয়ে যেতে। যেহেতু আমাদের পক্ষে সেরূপ জগতে পৌছে ফিরে এসে সেখানের আরাম-আয়েশ সুখ দুঃখের জ্ঞান নেয়া সম্ভব হয় না, সেজন্য

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর বস্তু ও তার গুণাগুণ বিচার বিবেচনা করেই পরজগত ও তার উপাদানের ধারণা নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই পরিদৃষ্ট হয় যে, ঐশী গ্রন্থে আমাদের স্থান কালের অধীন বস্তু ও তার উপাদানের গুণাগুণের সাথে পরকালীন জীবনের অনেক সাদৃশ্যমূলক উপমা তুলে ধরা হয়েছে।

এককালে বস্তু সম্পর্কে বস্তুবাদীদের নিছক ধারণা মানুষকে পরকাল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তুলেছিল। তাদের ধারণা ছিল বস্তুর মৌল উপাদান ও তার গতি চিরন্তন। ফলে তারা এই পৃথিবীকেও চিরন্তন মনে করতো। সেজন্যই তারা পরকালীন জীবন এবং পাপ-পুণ্য আছে বলে বিশ্বাস করতো না। মানুষকে তারা বস্তুর উন্নততর বিকাশ বলে ভাবত। অথচ আমাদের দর্শনের এই আপেক্ষিকতার জন্য তারা একটি বিরাট সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উৎস হলো বস্তু সম্পর্কে অতীত ধারণায় পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন। কালের চক্রে বিজ্ঞানেও চরম পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন অনন্ত অসীমের মূল সৃষ্টি রহস্যের কপাট উন্মোচন করে দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কল্পনার দেশে। আশার বৈতরণী ধীরে ধীরে সেই জীবন রহস্যের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে নতুন করে পাল তুলে ঐ জীবন সাগরে। সেই সাগর অনেক গভীর, অনেক প্রশস্ত। তাই যতই কাছে যাই না কেন তবু তার কূল-কিনার পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বিশ্বজগত তার সম্প্রসারণ ধারায় প্রচণ্ড গতিতে অনন্ত অসীমের দিকে ক্রমশঃই বেড়ে চলছে। পৃথিবীর স্বল্প আয়ু দিয়ে এর কিনার পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই আমাদের দেখার মাঝে চিরদিনই আপেক্ষিকতা ও অপূর্ণতা থাকবে, এটিই সত্য। প্রকৃতপক্ষে সব যদি জানাই যেতো তাহলে অনন্ত অসীম বলতে কিছুই থাকতো না। অথচ এই চিরন্তন সত্যকে যারা অবিশ্বাস করে পাপ-পুণ্যের ধার ধারে না তাদের যখন দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির আপেক্ষিকতা তুলে নেয়া হবে তখন তারা বলবে :

"হে আমাদের প্রভু! আমরা দেখলাম এবং শুনলাম। অতএব আমাদেরকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক কাজ করব; নিশ্চয়ই এখন আমরা বিশ্বাসী হয়েছি।' (সূরা-৩২ : রুকূ-২)

অতএব বস্তু সম্পর্কে অতীত ধারণার ভুল বিশ্বাসটুকু স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য বর্তমান বিজ্ঞান আমাদেরকে প্রকৃতির রহস্য সন্ধান করার জন্য অধীর ব্যাকুল হয়ে ডাকছে আর করুণ সুরে যেন বলছে, "এসো..... হে পথ ভুলা মানব গোষ্ঠী! অন্ধকার পাপের পথ ছেড়ে কল্যাণের পথে এসো। এখানেই তোমাদের মুক্তি।"

www.nagorikpathagar.org

বস্তু সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা

আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি এসবই বস্তু বা পদার্থ। কিন্তু যা দেখি না এবং যার ওজন নেই সেখানে বস্তু বলতে কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ওজনহীন অথচ অস্তিত্ব আছে, অনুভব করা যায় কিন্তু স্থান দখল করে না সেগুলো হলো শক্তি। সেজন্য পদার্থের বেলায় বলা হয়েছিল সেটি স্থান দখল করবে, ওজন থাকতে হবে এবং এর আদি মৌল ও গতি চিরন্তন হতে হবে। তা না হলে তাকে বস্তু বা পদার্থ বলা যাবে না। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ক্রমধারায় বিজ্ঞানীগণ মনে করতেন বস্তু বা পদার্থের মৌল বা যৌগের একমাত্র ক্ষুদ্রতম কণা হলো অণু। এ ধারণা কিছুকাল বিশ্বাস মূলে আবদ্ধ থাকার খানিক পরেই বিজ্ঞানী জন ডেলটন (Dalton) পদার্থের অণুর ভেতর থেকে পরমাণু আবিষ্কার করেন এবং একেই তিনি বস্তুর ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য ও অবিনশ্বর কণিকা হিসেবে গণ্য করেন। তার এ মতবাদ কিছুকাল চলতে থাকার পর বিজ্ঞানী জে.জে থমসন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পরমাণুর ভেতর আর একটি কণা 'ইলেকট্রন' আবিষ্কার করে পূর্বের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটান। এর পরপরই আবিষ্কারের ক্রমধারায় একটার পর একটা নতুন তত্ত্বের সন্ধান মিলতে থাকে। পরিশেষে বিজ্ঞানের চিন্তা চেতনা আরও গভীরে চলে গেল। সাথে সাথে আবিষ্কার হলো আরও দু'টি মৌলিক কণা : নিউট্রন ও প্রোটন। বর্তমানে সে আবিষ্কারের ধারায় আরো অনেক কণা আবিষ্কার হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এই Electron ও proton ইত্যাদি কণার মূলে রয়েছে বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎও আবার দু'ধরনের ঢেউ এর ন্যায় সর্বদাই উঠা নামা করে। তবে সার্বিক চিন্তা চেতনায় বিশ্বাস ছিল যেটি কোন ভর-শক্তি যা আলোর গতিতে চলে সেটি বিকীর্ণ শক্তি এবং কোন ভর-শক্তি যা আলোর গতিতে চলে না সেটি পদার্থ। সুতরাং বিজ্ঞানীগণ বস্তুর সংজ্ঞায় বলেছিলেন শক্তি রূপান্তরিত হতে পারলেও পদার্থ শক্তির মতো কাল্পনিক ছায়ায় রূপ নিতে পারে না। এ বিশ্বাস মূলে আবদ্ধ হয়ে বস্তুবাদী রাজনীতির আবর্তে মানুষ তখন হয়েছিল যান্ত্রিক মেশিন।

বস্তুত এই চিন্তা-চেতনার দূষিত বায়ুর পঁচাগান্ধা তন্ত্র-মন্ত্র বেশি দিন আর মানুষকে ধোঁকা দিতে পারেনি। যখন বস্তুর আসল মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেল তখন বস্তুবাদী ধারণার জগদ্দল পাথরের বোঝা অপসারণ করে বস্তু এমন একপর্যায়ে এসে গেল, যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই এখন মানুষ কল্পনার রাজ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলো। এতে পুনরুজ্জীবিত হলো ধর্মীয় চেতনা। বস্তু এবং ঘটনা কালক্রমে হয়ে গেল একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। স্থান-কাল-গতির নিরিখে প্রতিটি ঘটনাই যেন এক একটি বস্তু বা পদার্থ।

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বস্তুর ব্যাখ্যা আমাদেরকে এমন একপর্যায়ে নিয়ে চলেছে যার শেষ যে কোথায় তা নিশ্চিত করে বলাই কঠিন। বস্তুর এই নতুন ব্যাখ্যাতে মৃত্যুর খবর, পুনরুত্থানসহ বেহেশত-দোযখের যেন সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। তাই বলা যায় বস্তু সম্পর্কে বর্তমান ধারণা যেন জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য পারমাণবিক বোমার চেয়ে বড় হাতিয়ার।

বস্তু সম্পর্কে বর্তমান ধারণা

শক্তি ও পদার্থের সংজ্ঞার দ্বন্দ্ব যখন তুঙ্গে উঠেছিল তখন আবিষ্কার হলো নতুন এক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব পদার্থের আবরণ ছেদ করে তাকে করেছে বস্ত্রহীন। ১৯২৪ সালে ডি ব্রগলি প্রমাণ করলেন বস্তুর দ্বৈতরূপ আছে। যেমন কণিকা রূপ এবং ঢেউ-এর রূপ। অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত রূপ কাঠামোর আকারেও থাকতে পারে, আবার শুধু ঢেউয়ের ন্যায়ও থাকতে পারে। তাই ঢেউ বা তরঙ্গ যখন নিজের স্বতন্ত্র অবস্থায় অণু বা পরমাণুর দ্বারা শোষিত বা বিকিরিত হয় তখন এই ঢেউ ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। এতে প্রতিটি ঢেউ একটি পূর্ণ একক সত্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই ঢেউ বা তরঙ্গগুচ্ছকে বলা হয় ফোটন। এটি 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব' নামে পরিচিত। এ তত্ত্ব আবিষ্কার হওয়ার পর বস্তু এমন একপর্যায়ে এসে অবস্থান নিয়েছে যে, বস্তু এখন মনন-অনুভূতির কাছে কাল্পনিক ছায়া মাত্র। যা আকারবিহীন, অদৃশ্য শূন্যে বিলীয়মান, অতিসূক্ষ্ম সত্তা হিসেবে পরিচিত। এটি একটি বিদ্যুতের কণা কিংবা সম্ভাব্য কোন ঢেউও হতে পারে। সে যাই হউক না কেন; তবু সেটি বস্তু। এই আবিষ্কারের পর থেকে বর্তমান চিন্তা-ভাবনায় আর এক নতুন যুগের সন্ধান নিতে লাগলো। হয়তো বা এই আবিষ্কারের সিঁড়ি বেয়ে যাওয়া যাবে অনেক দূর সীমানায়। তখন হয়তো আমরা জানতে পারব বিকীর্ণ কর্মশক্তির খবর। যা আমাদের মন ও দেহ থেকে বিকীর্ণ হয়। এই পথ ধরে হয়তো আরও জানা যাবে পরকালের কথা। সে আশা কল্পনার বিষয় নয়। কারণ যে আলোক শক্তির আচরণকে আমরা দীর্ঘদিন তরঙ্গরূপে জেনে এসেছি এবং ইলেকট্রনকে কণিকারূপে অথচ বর্তমান বিজ্ঞান এই আলোকের কথাই বলছে যে, সেটি শক্তি গুচ্ছরূপে আচরণ করে এবং গতিশীল কণিকা তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়। তাই তরঙ্গ অবস্থা বিশেষে পদার্থ এবং একটি তরঙ্গই একটি স্বতন্ত্র কোয়ান্টাম। এই কোয়ান্টামের অপর নাম ফোটন।

বিজ্ঞানের এসব যুগান্তকারী পরিবর্তন দিনে দিনে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে দিচ্ছে। অনেক অজানা পথকে করছে আবিষ্কার। তাই বিকীর্ণ কর্মশক্তির পথ ধরে

www.nagorikpathagar.org

পরকালের সন্ধান পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আধুনিক বস্তু আজ সেই অজানা রহস্যের দ্বার প্রান্তে এসে প্রহরীর মতো ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে বৈকি? এ পর্যায়ে এসে বস্তু এবং ঘটনা একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ মনে হয়। পূর্বেই বলেছি এখন আর ঘটনা থেকে বস্তুকে এবং বস্তু থেকে ঘটনাকে আলাদা করা যায় না। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বস্তু এবং ঘটনা একই জিনিস মনে হয়। এখন ঘটনাকে তত্ত্ব কণা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। কার্যত ঘটনার কোন পারিপার্শ্বিক অস্তিত্ব থাকে না। একে না পারা যায় ধরে রাখা, না থাকে তার পদার্থের মতো কোন রূপ। বর্তমান পদার্থের সংজ্ঞায় যেহেতু পদার্থ আর আগের অবস্থায় নেই সুতরাং এখন আর ঘটনাকেও পদার্থ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। একে পদার্থ না বলে প্রতিবস্তু বা তত্ত্ব কণা বললেও ভুল হবে না। এই মহাবিশ্বের কোথায় যে কি আছে তা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি যে হারিয়ে যাচ্ছে এ কথা তো আর জোর দিয়ে বলা যায় না। বস্তুকে ভেঙ্গে যতই ভেতরে যাওয়া যাচ্ছে ততই যেন একে শক্তিশালী মনে হচ্ছে। আসলেই স্থূল জিনিস এখন বোঝার মতো মনে হয়। এর যেন ঘুম-নিদ্রা খাওয়া-পরা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। কিন্তু সেদিক থেকে সূক্ষ্ম সবকিছু শক্তিশালী ও চলা ফেরায় সহজ মনে হয়। তাই আমাদের মনে কল্পনা জাগে আলোর মতো সূক্ষ্ম দেহ হলে কতই না সহজ হতো। এই ভাবনা পরকালের অনন্তের সন্ধানে আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে নতুন পথ তালাশ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেজন্য এখন আমরা ভাবতে শুরু করেছি আমরা কোথা হতে এসেছি? কোথায় চলেছি? কেনইবা এই আসা যাওয়া?

সারা জীবন খেয়ে কত শক্তি না হজম করে ধোঁয়ার মতো কিংবা আলোর মতো বিকিরণ করেছি! এগুলো কি আমাদের দুনিয়ার উপার্জিত সম্পদ? এর সাথে কি পাপ-পুণ্যের কোন সম্পর্ক আছে? আধুনিক বস্তুর সংজ্ঞা এখন আমাদেরকে নতুন করে বিকীর্ণ কর্মশক্তি সম্পর্কে এতো কিছু ভাবার পথ করে দিচ্ছে।

বিকিরণ শক্তি কী?

বিকিরণ শক্তি বলতে শূন্যে বিলীয়মান অদৃশ্য শক্তিকেই বুঝায়। যা প্রতিনিয়ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা কাজের মাধ্যমে ব্যয় হয়। সূর্য যেমন তার মওজুদ ভাণ্ডার থেকে অহরহ শক্তি বিকিরণ করে তেমনি এ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকণা শক্তি শোষণের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত অনুরূপভাবে বিপুল পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে। সেরূপে এই পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে আমাদের দেহ কোষের পরমাণুর গা ভেদ করে শক্তি বিকিরণ হয়। যে শক্তি একবার বিকীর্ণ হয় সে শক্তি পৃথিবী কিংবা সূর্য কেউ কোন দিন ফিরে পায় না। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এই বিকীর্ণ শক্তি শূন্য মাধ্যমে সঞ্চালনের সময় তার কোয়ান্টাম অবস্থা বজায় রাখে।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ শক্তি বিকিরণের সময় সেটি অবিরতভাবে না হয়ে সবিরামভাবে শক্তি গুচ্ছের আকারে বিকিরণ হয়। এই স্বতন্ত্র শক্তিগুচ্ছকে ফোটন নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ফোটন তার নিজের তরঙ্গ প্রকৃতি ও স্বতন্ত্রতা সকল সময় বজায় রাখে। যখন বিকীর্ণ শক্তি কোয়ান্টাম হিসেবে নিঃসৃত হয় তখন তার শক্তি পরিবর্তন করে ভিন্ন কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট স্বতন্ত্র শক্তির ফোটন রূপ পরিগ্রহ লাভ করে। এতে প্রতিটি ফোটন একটি পূর্ণ একক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান থাকে। বিকীর্ণ শক্তির বেলায় কতগুলো ঘটনা এর স্বতন্ত্র রূপ প্রকাশ করে। যেমন কৃষ্ণকায়া বিকিরণ (Black body radiation) শক্তি, আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি, কম্পটনের প্রভাব ইত্যাদি। বিশেষ করে এই স্বতন্ত্র প্রভাবগুলো তাদের গুণগত আচার-আচরণকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সত্তা হিসেবেই আলাদা করে রাখে।

যেহেতু সূর্য কিংবা পৃথিবী এগুলো ফিরে পায় না, তাই এই বিকীর্ণ সত্তার স্বতন্ত্র কাঠামোর সত্তাগুলো স্বীয় স্বতন্ত্র গতিতে নিজ আচরণ ও স্বভাবের স্থায়িত্ব নিয়ে মহাবিশ্বের কোথাও গিয়ে হয়তো জমা হচ্ছে। পক্ষান্তরে শক্তির অবিনশ্বরতা বা ধ্বংসহীনতায় বিশ্বাসের পথ যেন আমাদেরকে বাতলিয়ে দেয়। তবে ইলেকট্রনের মতো ফোটনেরও ভগ্নাংশ আছে কি-না-তা এ মুহূর্তে বলা কঠিন। বর্তমান বিশ্ব কোন সময়ই এক জায়গায় বসে থাকছে না। বাতাস ভর্তি করার সময় বেলুন যেভাবে ফুলতে থাকে, সেভাবেই এটি অহরহ সম্প্রসারণ হয়ে চলছে। এই সম্প্রসারণের গতি এতো দ্রুত যেন আলোর পক্ষেও তার কিনারা পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, এ বিশ্বের সম্প্রসারণ বিকীর্ণ শক্তি দিয়েই হচ্ছে। কারণ এই সত্যকে অস্বীকার করার মতো কোন প্রযুক্তি আমাদের হাতে এখনো আসেনি। বরং এই যুক্তির পক্ষে হাজারো উপমা দেয়া সম্ভব। কারণ বিকীর্ণ শক্তির অবিনশ্বরতার জন্য এর একটা অবস্থান স্বীকার করেই নিতে হবে। বিকীর্ণ স্বতন্ত্র শক্তির গুচ্ছ (ফোটন) শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়েও আলোর গতিতে সঞ্চালিত হয়। এই ফোটন কণা আমাদের দেহ কোষ থেকে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে অবিরাম একটার পর একটা নিঃসৃত হতে থাকে। এর শক্তির পরিমাণ $E=hv$।

এখন আসা যাক মূল কথায়। আমি কেন বিকীর্ণ শক্তি নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছি? এর একটি মাত্র কারণ, তা হলো আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে যে শক্তি বিকিরণ করি এগুলোর সাথে কি পাপ-পুণ্যের কোন সম্পর্ক আছে? সূর্যের মতো আমরাও যে শক্তি বিকিরণ করি, এর একটি মাত্র প্রমাণ হলো আমাদের ক্ষুধা লাগা। যেহেতু কিছু সময় পর পর আমাদেরকে ক্ষুধায় তাড়িত করে, আবার

www.nagorikpathagar.org

খাদ্য খেলে তা নিবারণ হয়ে যায়। সুতরাং ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক আমাদের পক্ষে শক্তিকে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। একবার খেলে যদি আমাদের দেহ হতে শক্তি বিকিরণ না হতো তাহলে ক্ষুধা লাগার প্রশ্নই দেখা দিত না। কিন্তু কর্ম আর অকর্মের মাধ্যমে যে শক্তি আমাদের দেহ থেকে হারিয়ে যায় সেগুলোর গুণগত মানের সাথে আমাদের পাপ-পুণ্যের কোন সম্বন্ধ আছে কী? এ মুহূর্তে হয়ত আমরা এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না। কারণ এ সম্পর্কে আমরা অদ্যাবধি কোন দিন চিন্তা করিনি। হয়তবা কুরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণার ফল থেকে যদি একটি নিখুঁত সিদ্ধান্তে পৌছা যায় তাহলে বলা যেতে পারে। অন্যথায় এ বিষয়ে কথা বলাই হবে মূর্খতার সমান।

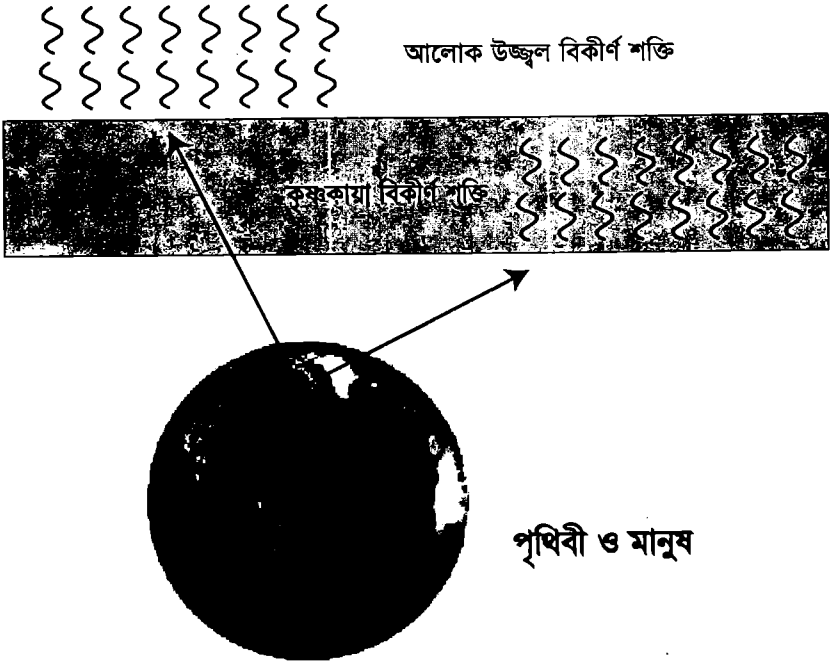

"যারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, তাদের সৎ কাজগুলো হবে ভস্মস্তূপের ন্যায়। ঝড় ঝঞ্ঝার দিনে প্রচণ্ড বায়ুবেগে ভস্মস্তূপ যেমন শূন্যে উড়ে যাবে, ঠিক সে সৎ কাজগুলোর কোনো অংশেরই বিনিময় তারা লাভ করবে না। কারণ আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে গিয়েছিল।" (সূরা ইবরাহীম : ১৮)

"সেদিন প্রত্যেকেই তার কৃত নেকী এবং তার কৃত বদীকে উপস্থিত পাবে।" (আল-কুরআন)

www.nagorikpathagar.org

আমরা যদি আমাদের বিকীর্ণ শক্তিগুলোকে শূন্য থেকে ধরে এনে দেখতে পারতাম, তাহলে হয়ত এর উত্তর দিতে কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু শূন্য থেকে বিকীর্ণ শক্তিকে ধরে এনে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সে কারণে এর একটা অনুমানভিত্তিক তত্ত্ব তালাশ করে, এর সত্যতা যুক্তির মাপকাঠিতে ফেলে যাচাই করতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'ধরি' কিংবা 'মনে করি' এরূপ আঁচ করার নিয়ম প্রচলন থাকতে দেখা যায়। সুতরাং দর্শনের দৃষ্টিতে এরূপ ভাবে এগুতে এগুতে যদি এর কাছাকাছি কোন তাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া যায় তবে বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। তারপর দর্শন, বিজ্ঞান, কুরআন ও হাদীসের যুক্তি যদি একই স্তরের হয় তবেই বলা যাবে মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক নিহিত আছে।

মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তি কি পাপ-পুণ্য?

যদি মনে করি অনেক দূরে যাব, এমন দূরে যেখানে আকাশ মাটির সাথে মিতালী করছে। তবে এমন জায়গা কি কখনো খুঁজে পাব? যদি না পাই তবুও কি হাঁটতেই থাকব আজীবন? এ বিশ্বের অনেক জিনিসের অন্ত আছে, শেষ আছে আবার অনেক জিনিসের কোন অন্ত নেই, শেষ নেই, পরিমাণ নেই। তবু আমরা অন্তহীন জিনিসেরও ঠিকানা খুঁজি। এতে আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা কেটে যায়। হৃদয় তখন সাগরের মতো কূলহীন বিস্তৃতি লাভ করে। এতে সৃষ্টির প্রতি জাগে অপার করুণা। স্রষ্টাকে তখন অনন্ত অসীম মনে হয়। প্রসঙ্গত জিজ্ঞাস্য মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তি কী পাপ পুণ্য? এ বিষয়টি এক কূলহীন ভাবনা। এ প্রশ্নের কতটুকু সমাধান পাব এ মুহূর্তে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবু এ পথে এগুতে এগুতে যে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি নেয়া যাবে সেকথা জোর দিয়েই বলা যায়। পৃথিবীতে সুস্থ দেহ-মন নিয়ে কেউ বসে থাকে না। সূর্যটা ডিমের কুসুমের মতো উঁকি দেয়া শুরু করলেই মানুষ কর্মক্ষেত্রে সৈনিকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ বের হয় স্রষ্টার আনুগত্যশীল হয়ে, হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে, আবার কেউ বের হয় অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেজন্য সবার নিয়্যত ও কর্ম এক রকম হয় না। তাই জীবন থেকে কর্মের সুকৃতি কিংবা দুষ্কৃতি মুছে ফেলা যায় না। এর সাথে কর্মের যেমন সম্পর্ক তেমনি পাপ-পুণ্যের সাথে কর্মফলেরও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

দেহ যদি জীবনহীন হয়ে পড়ে তবে সেটি কর্মহীন হয়ে যায়; অনুরূপভাবে

www.nagorikpathagar.org

পাপ-পুণ্য ও কর্মফলের দরজায় তালা লেগে যায়। তখন জীবনহীন দেহ ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয় না। ফলে সে যেমন খাওয়া দাওয়া করে না তেমনি এর বিকিরণের দরজায়ও লেগে যায় তালা। সেজন্য এখানে কর্ম ও বিকীর্ণ কর্মশক্তির সাথে পাপ-পুণ্য ও কর্মফলের সম্বন্ধের একটা আভাষ পাওয়া যায়। তাই যদি না হবে তবে পৃথিবীর জীবন কি দিকভ্রান্ত, পালহীন নৌকার আরোহীর মতো, অথবা এটি কি কোন তাসের ঘর? এর কি কোন মূল্য নেই? লক্ষণীয়, জীবন সমস্যার অথৈ-সাগরে শত ভয়-ভীতি দুঃখ-কষ্টের মাঝেও আশার বৈতরণী আমাদের প্রেরণার উৎস। অনেকের এই যাত্রা পথ হয় উদ্দেশ্যহীন। উদ্দেশ্যহীন যাত্রীরা ভাবে জীবনের এখানেই শেষ। তবু তারাও আশার তরী নিয়ে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে। তবু একদিন আশার বৈতরণীর পাল ভেঙ্গে জীবন চলে যায় মাটির দেহটিকে মাটির ভুবনে একাকী ফেলে দিয়ে? জানি এর কোন বাস্তব চিত্র তুলে ধরা যাবে না, তবু জীবনের জন্য কার না মায়া হয়। একে সবাই আঁকড়ে থাকতে চায়। এর জন্য প্রেম হয়, আবেগ জাগে। তাই জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ কার না আছে? আসলেই জীবনের শেষ হয়ে যাওয়া কেউ চায় না। সকলেই চায় আপন আপন জীবন সত্তা নিয়ে অমর হয়ে বেঁচে থাকতে। ফলে বেঁচে থাকার জন্য জীবনকে নিয়ে জীবনপ্রেমীদের ভাবনার শেষ নেই। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের চিত্র তুলে ধরতে শিল্পীরা তুলি নিয়ে থাকেন বসা। তারা জীবনকে আপন করতে চায়, পোষ মানাতে চায়। সেজন্য আগ্রহ ভরে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে, কেন এই পৃথিবীতে আসা হলো? কেনই বা আবার চলে যেতে হয়? আসা যাওয়ার মধ্যেই কি জীবন শেষ হয়ে যায়? পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এ নিয়ে কতজনই না ভাবতে ভাবতে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় জীবনের এখানেই শেষ ইতি ভেবে জীবনকে পঙ্গপালের মতো যথেচ্ছা ভোগ করার জন্য নিয়ম-নীতি মানতে রাজি হয়নি। কিন্তু ঐশী বিধান তো এ কথা স্বীকার করেনি। নদীর যেমন দু'কূল আছে, টাকার যেমন এপিঠ ওপিঠ থাকে, জল ও স্থল নিয়ে যেমন প্রকৃতিক পরিবেশ, শোষণের সাথে যেমন বিকিরণের সম্পর্ক তেমনি এপার জীবনের সাথে ওপার জীবনের রয়েছে আত্মিক সম্পর্ক। প্রকৃতির সুষম নীতির পক্ষ থেকে আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, এপার জীবন-নদীর ঢেউ ওপারেই হবে ঠাঁই। জীবন-নদীর এপারের কর্ম ওপারেই বাধবে বাসা। একূলের ঢেউ ওকূলকে সাজাবে নিজের মতো করে। এটিই যেন প্রকৃতির কাছে সত্যতার বড় প্রমাণ। এক ঘরের তিন দিক বায়ুরুদ্ধ করে যদি এক দিক খোলা রাখা হয় তাহলে প্রকৃতিগতভাবেই সে ঘরে বায়ু প্রবেশ করবে না।

www.nagorikpathagar.org

বায়ু প্রবেশ করার জন্য কমপক্ষে দু'দিক খোলা রাখা প্রয়োজন। যদি দু'দিক খোলা থাকে তবে ঠাণ্ডা সুশীতল বায়ু প্রবেশ করে ঘরটিকে তার স্পর্শে শীতল ও প্রাণ উদ্দীপনার স্পর্শে মুগ্ধ করে ঐ বায়ুর দানাগুলো ঘরের কিছু সুগন্ধ তার গায়ে মেখে বের হয়ে যাবে অন্য রাস্তায়, এটিই নিয়ম। তবে ঐ ঘরে সুগন্ধিমূলক উপাদান থাকতে হবে। অথবা কখনো গা পোড়া গরম বাতাস সবেগে প্রবেশ করে ঘরটিতে তুফান তুলে সেই ঘরের পচা, দুর্গন্ধ তার গায়ে মেখে অনন্তের দিকে উড়ে যাবে এটাই সত্য। অসংখ্য ময়লা আর ধূলি-বালি ও সংক্রামক জীবাণু তার শিরায় শিরায় লাগিয়ে ঐ বায়ুর দানাগুলোও বের হয়ে যাবে অন্য রাস্তা দিয়ে। কিন্তু এই দু'ধরনের বায়ুকে যদি প্রকৃতির মুক্ত বায়ু গ্রহণ না করে তবে ঐ বায়ুর দানাগুলো যাবে কোথায়? নিশ্চয়ই সেগুলো নিজেরা ঠাঁই পাওয়ার আশায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন হয়ত কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিবে। এটিই প্রকৃতির বিধান। তা না হলে সেগুলো যাবেই বা কোথায়? সেজন্য জীবনের যেমন একপিঠ থাকতে পারে না, সেই সাথে কর্মশক্তিও (বিকীর্ণ শক্তি) হারিয়ে যেতে পারে না।

জীবনের যদি একপিঠ থাকতো তাহলে প্রকৃতির নিয়মেই তা বহু আগেই বন্ধ হয়ে যেতো। সেজন্য জীবনের ওপিঠের কথা এখানেই চিন্তা করতে হবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে যতদিন সে বেঁচে থাকে ততোদিনই সে মুখের সাহায্যে উদরে খাদ্য নেয়। এই উদর ভর্তি খাবারের সার অংশ দিয়েই তার জীবন সচল থাকে। যে শক্তি তাকে সচল রাখে সেই শক্তি জীবকোষের পরমাণুর সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়েই ক্রমে ক্রমে নির্গত হয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ছাড়া এগুলো যাবেই বা কোথায়? কিন্তু এই অদৃশ্য শক্তিগুলো শূন্যে বের হয়েই সে হয়ে যায় অসহায়। একে পৃথিবী কিংবা সূর্য আর ফিরে নেয় না। বাতাসও তাকে ধরে রাখতে পারে না। পানিতেও সেগুলো মিশে না। আকাশের মেঘ মুল্লুকেও তাকে ঠাঁই দেয় না। তাই সেগুলো খুঁজতে থাকে নিজের ঠিকানা। আলোর বেগে ছুটে চলে নিয়তির তালাশে। যেতে থাকে মহাবিশ্বের অসীম অনন্তের দিকে। তারপর বিশ্ব বিধাতার সৃষ্টি রহস্যের জালে সেগুলো অবশ্যই ধরা পড়ে। কিন্তু সেখানে এগুলো দিয়ে যে কি বানানো হচ্ছে তা নিশ্চিত করে আমরা বলতে পারি না।

মানব দেহের সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ, যৌনাঙ্গ ইত্যাদি ও তাদের কথাবার্তা এবং অদৃশ্য মনের মাধ্যমে দু'ধরনের সত্তা তৈরী হয় বলে জানা যায়। ধর্মের পরিভাষায় এর নাম পাপ এবং পুণ্য। প্রকৃতপক্ষে এ দু'ধরনের সত্তার সাথে বিজ্ঞানের পরিভাষার বিকীর্ণ সত্তার কোন সম্পর্ক আছে কী?

www.nagorikpathagar.org

পাপ-পুণ্য যদি স্রষ্টার মওজুদ ভাণ্ডারের গচ্ছিত কোন সম্পদ হয় তাহলে এর সাথে সম্পর্ক থাকার কথা নয়। যদি পৃথিবীটা পাপ-পুণ্য তৈরীর ক্ষেত্র হয় তাহলে এর সাথে সম্পর্ক থাকাটা যুক্তিতে আসতে পারে। আসলেই তো দুনিয়াটা আখেরাতের কর্মক্ষেত্র। তাই একে যুক্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। পাপ-পুণ্যের যদি প্রকৃতিগত অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয় তবে এর সঠিক উত্তর দেয়া যাবে। তখন হয়তো দেখা যাবে মূল জিনিসটি একই। কিন্তু ভিন্ন পরিভাষায় তাদের নাম হয়েছে ভিন্ন রকম। মানুষের কর্ম জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম আচার-আচরণ শরীরকে গতিশীল না করে করা যায় না। পক্ষান্তরে মানব মনও কর্মহীন থাকে না। অনেক সময় দেহ বসে থাকলেও মন নিরবে বসে কাজ করে। মনের কাজ ভাবনার মাঝে কেটে যায়। এ সময় মনের শরীর বসে থাকে না। তার মধ্যেও চঞ্চলতা বিরাজ করে। মূলত দেহ ও মন উভয়ের কাজের বেলায় তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের সত্তাকে গতি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হয়। সার্বিক অর্থে মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজহীন থাকে না। তার ঘুম-নিদ্রা, আহার-বিশ্রাম সবই তার কাজ। অন্যদিকে সকল কাজই মনের উদ্দীপনায় হয়। শরীর যখন মনের উদ্দীপনায় গতিশীল হয়ে তার বাস্তবকর্ম সম্পাদন করার জন্য কর্মে লিপ্ত হয় তখন তার কর্মের মাধ্যমে শক্তি ব্যয় হয়। সেজন্য কিছু সময় পরপর শরীর চায় শক্তি। সে কারণে নির্দিষ্ট সময় বিরতির পর আবার আমাদের খাদ্য খেয়ে নিতে হয়। এভাবে প্রতিদিন প্রতিটি মানুষ শক্তি আহরণ (খাদ্য থেকে) করে এবং ব্যয় করে। এই চক্র এক দু'দিন নয় যত দিন জীবিত থাকে ততদিনই চলে। কিন্তু যে শক্তি কর্ম জীবনের আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকৃতিতে বিলীন হয়, সেই শক্তির গায়ে কী গতির কোন নিজস্ব প্রলেপ পড়ে? গতির প্রলেপের জন্যই কি বিকীর্ণ শক্তির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়? কি করে এর উত্তর জানবো। এই শক্তি এতো মিহিন যে, একে না দেখা যায়, না স্পর্শ করা যায়।

ভর শক্তির নিত্যতা সূত্রের ব্যাখ্যা হলো শক্তির ধ্বংস বা বিনাশ নেই। শক্তি শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপ নিতে পারে। আমরা যে শক্তি বিকিরণ করি একে যেহেতু পৃথিবী এবং সূর্য ফিরে নেয় না, বাতাসও গ্রহণ করে না সুতরাং আমাদের দেহের বিকীর্ণ কর্মশক্তি বা জ্বালানি শক্তি ক্ষয় না হয়ে ভিন্ন রূপ নিয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়। এই শক্তি যদি অদৃশ্য হওয়ার সময় আগের অবস্থায় থাকতো তবে সূর্য ফিরে না নিলেও পৃথিবী তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে নিত। মায়ের গর্ভে সন্তান আসলে সে তো আর কোন দিনই সেখানে বিলীন হয়ে যায় না। গর্ভের সন্তান জীবিত কিংবা মৃত অথবা বিকলাঙ্গ যাই হউক না কেন তাকে মাতৃগর্ভ থেকে কোন না কোনভাবে পৃথিবীতে বের হয়ে আসতেই হয়। এখানে আসলে

www.nagorikpathagar.org

পরে সে যদি জীবিত থাকে তাহলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে বরণ করে নেয় কিংবা মৃত হলে তাকে মাটির গর্তে পুঁতে রাখতে হয়। তারপর ঐ গর্তের মাটির সাথে সেটি পঁচে গলে মিশে যায় তবু তার অস্তিত্ব ধ্বংস হয় না। এর শেষ থেকেই যায়। প্রাথমিক অবস্থায় একে মাটি গিলে ফেললেও সময়ের আবর্তে মাটি দেহের সত্তাগুলোকে প্রকৃতিতে বমি করে দেয়। কোনক্রমেই একে হজম করতে পারে না। পক্ষান্তরে আমাদের উদর যে খাদ্য খায় তার সারাংশ যখন রক্তে মিশে দেহের শক্তির যোগান দেয় তখন এই শক্তিকেও দেহ হজম করে ধরে রাখতে পারে না। এই শক্তি সময়ের ফাঁকে ফাঁকে কর্মের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়। আবার শূন্যও তাকে হজম করে বিনাশ করে দিতে পারে না। কারণ এরূপ হওয়া বিজ্ঞানের বিধানে নেই। মাতৃ-গর্ভের সন্তান যেমন জীবিত অথবা মৃত কিংবা বিকলাঙ্গ হতে পারে সেরূপে আমাদের দেহের ও মনের বিকীর্ণ সত্তা উত্তম মানের অথবা মন্দ স্বভাবের কিংবা মৃত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

ভালো-মন্দ, মৃত কিংবা জীবিত যাই হউক না কেন সেগুলোর গুণাগুণ যে অক্ষুণ্ন থাকবে সেটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সন্তান জীবিত কিংবা মৃত অথবা বিকলাঙ্গ ইত্যাদি হওয়ার ব্যাপারে সন্তানের কোন ভূমিকা না থাকলেও মায়ের কিছু বিশেষ আচার-আচরণ ও সংক্রামক ব্যাধি সন্তানের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তার সৌন্দর্য বিকৃতিও ঘটতে পারে। আমাদের বিকীর্ণ কর্মশক্তি পয়দা হওয়ার ব্যাপারে আমাদের সরাসরি হাত না থাকলেও আমাদের আচার আচরণগত গতির কিছু প্রভাব তার গায়ে লাগতে পারে। এই বিকীর্ণ কর্মশক্তি আমাদের স্বভাব গতির উৎপাদিত সন্তান। এই সন্তান ভাল কিংবা মন্দ প্রকৃতির হওয়ার পেছনে অনেক যুক্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু একে ধরে এনে দেখানো সম্ভব নয়। এই সন্তান জন্ম নিয়ে শূন্য রাজ্যে অদৃশ্য হলে এটি কারও ধার ধারে না। মহাশূন্যের কোটি কোটি ছায়া পথের সুদূর কোন ঠিকানায় সেগুলো জায়গা করে নিয়ে তার জন্মদাতার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে দিন গুনতে থাকবে নিরবে, এটিই প্রকৃতির খেলা। শেষ দিবসের বিচার অনুষ্ঠানের পর তার পিতাকে সে নিজের মাঝে ঠাঁই দিয়েই সে ধন্য হবে। এ বিকীর্ণ সন্তান যদি ভালো স্বভাবের হয় তবে পিতার জীবন হবে সুখময় আর যদি মন্দ স্বভাবের হয় তাহলে পিতা ভোগ করবে সন্তানের জ্বালাময় কষ্ট। এটিই চিরন্তন সত্য। মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্মশক্তিগুলো দেহ কোষের জন্ম দেয়া অদৃশ্য সন্তান। মা যেমন প্রসব পথে সন্তান জন্ম দেয় অনুরূপভাবে দেহ কোষের পরমাণুর সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে যে শক্তি প্রসব হয়ে আসে এগুলোও অঙ্গের কোষস্থ পরমাণুর জন্ম দেয়া সন্তান। এই

www.nagorikpathagar.org

অদৃশ্য সন্তানগুলো ইন্দ্রিয় দৃষ্টিকে ধোকা দিয়ে চলে গেলেও কল্পনার রাজ্যে তারা ঘুরে বেড়ায়। আমাদের দৃষ্টির আপেক্ষিকতায় একে কল্পনার রাজ্যে বন্দী করে রাখে। তাই একে এখন দেখতে না পারলেও দৃষ্টির আপেক্ষিকতার অবসান হলে তাকে দেখতে কষ্ট হবে না। আমরা যদি এই অদৃশ্য বিকীর্ণ সন্তানের স্বভাব, চরিত্র, আকার, আকৃতি রূপ গুণকে মানব চরিত্রের আচার-আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রমাণ করতে পারি, তবেই সেগুলোকে পাপ-পুণ্য হিসেবে মূল্যায়ন করতে পারব।

পৃথিবীতে আমরা কোটি কোটি মানুষ একই পরিবেশের অধীনে বসবাস করি। এখানে আছে সৎ, অসৎ চরিত্রের লোক। আছে আস্তিক, নাস্তিক, খুনী, হাইজাকার ও কত রঙ বেরংয়ের লোক। কিন্তু পরজীবনের বৈশিষ্ট্য হবে স্বতন্ত্র ধরনের। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা জগৎ থাকবে। সেখানে সুখ-দুঃখ আলাদা হয়ে যাবে। অর্থাৎ সুখীর স্থানে দুঃখ থাকবে না আবার দুঃখীর স্থানে সুখ থাকবে না। বিকীর্ণ শক্তির বেলায়ও দেখা যায় একই রকম নিয়ম। যেমন কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি ইত্যাদি কোন সময় একে অপরের মাঝে দুস্তি করে বসবাস করে না। পক্ষান্তরে বিশ্ব জগতের অন্তহীন কাঠামোতেও রয়েছে দু'টি স্তর। যেমন অন্ধকার নিষ্প্রভ নীহারিকার জগৎ এবং আলোক উজ্জ্বল নীহারিকার জগৎ। মানব জীবনের বিকীর্ণ সন্তান যদি পাপ-পুণ্যেই না হবে তাহলে আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা যে পাপ, পুণ্য সৃষ্টি হওয়ার কথা ধর্মীয় কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোই বা কি?

পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু কণার ক্ষুদ্রতম অংশের মাঝে অবিরাম গতির স্রোতে মূল স্থায়ী কণা থেকে কিছু কিছু অস্থায়ী কণা এবং তার কিছু প্রতিকণার সৃষ্টি হয়। এই অস্থায়ী কণাগুলো অতি অল্পসময় পরেই মূল কাঠামো হতে প্রকৃতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরূপ অস্থায়ী প্রতিকণা মানব দেহের কোষস্থ পরমাণু থেকেও অদৃশ্য হয়। ব্যক্তি বিশেষের আচরণ বা গতি থেকে প্রতিকণার রূপ ভিন্ন চরিত্রের যে হবে না একথার কি কোন প্রমাণ আছে বরং সুকৃতি ও দুষ্কৃতি পূর্ণ হওয়ার পেছনে যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করানো সম্ভব। এই প্রতিকণা বিকীর্ণ কর্মশক্তিরই প্রতিরূপ। তাই এর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বিকীর্ণ শক্তির অনুরূপ নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য। বিকীর্ণ কর্মশক্তি একে অন্যের সাথে সহ অবস্থান, সংমিশ্রণ, রূপান্তর, অবলুপ্তি, ধ্বংস ইত্যাদি হওয়ার যেহেতু কোন নিয়ম নেই, সে কারণে এদের দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি না হয়ে তারা যাবেই বা কোথায়? সবদিক পর্যালোচনা করে পাপ পুণ্যকে বিকীর্ণ কর্মশক্তির সাথে সম্পর্কশীল হওয়ার ব্যাপারটি উড়িয়ে দেয়া যায় না। অসৎ চরিত্রের থেকে যদি কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং সৎ ঈমানদারগণের

www.nagorikpathagar.org

আমলের মাধ্যমে যদি আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি সৃষ্টি হওয়ার মতো কোন যুক্তি প্রমাণ দেয়া সম্ভব হয়, তবে উল্লিখিত বিষয়টি স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী রাখে।

জীব ও জড় পদার্থের কাঠামোর ভৌতশক্তি এক প্রকার অদৃশ্য সত্তা। এটি অপরিমেয়, ওজনহীন এবং অবিভাজ্য। এর নিঃশেষ বলতে কিছু নেই। বিশ্বের সমস্ত মানুষ মিলে এর একটি দানাকেও নিঃশেষ করতে পারবে না। এই সত্তা এতো ছোট যে, একে খালি চোখে দেখা যায় না। তবু তার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার না করে পারি না। বস্তু বা প্রাণীদেহের কোষ অভ্যন্তর হতে যে অদৃশ্য ও অস্থায়ী প্রতিকণা জন্ম হয়ে প্রকৃতিতে লুকিয়ে পড়ে, একে না দেখা গেলেও তার অস্তিত্ব স্বীকৃতির বাইরের কিছু নয়। জীব ও জড় হতে যদি শক্তি বিকিরণ না হতো তাহলে ক্ষুধা তো হতোই না বরং পৃথিবী এবং তার বাসিন্দারা ফুলে ফেঁপে বিরাট আকার ধারণ করতো। সে সূত্রেই বলা যায় আমাদের কাজ-কর্ম থেকে যে শক্তি বিকীর্ণ হয় সেগুলোও স্বীকৃত সত্তা। এই স্বীকৃত সত্তাগুলোও বিকিরণের সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলে। অর্থাৎ এদেরও গায়ে কালো (কৃষ্ণ) বর্ণ ও আলোক বর্ণের মতো গুণাগুণ থাকতে পারে।

আমরা যা আহার করি এর কিছু অংশ প্রথমেই উচ্ছিষ্ট হয়। এই উচ্ছিষ্ট অংশ শরীর থেকে মল, মূত্র ও ঘাম হিসেবে নিঃসরণ হয়। তারপর খাদ্যের যে সার অংশ গ্লুকোজ ও চিনি হিসেবে আমাদের রক্তে মিশে এ থেকে আমরা শক্তি পাই। পেট্রোল যেমন গাড়ির জ্বালানী শক্তি হিসেবে ব্যবহার হয়ে গাড়িকে গতিশীল করে, তেমনি খাদ্যের এই পরিশোধিত অংশ আমাদেরকে কর্মচঞ্চল ও গতিময় রাখে। এই শক্তি যখন কাজ-কর্মের মাধ্যমে বিকীর্ণ হয় তখন এর কিছু অংশ খারাপ আচরণের জন্য উচ্ছিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে ভালো আচরণের মাধ্যমে উত্তম মান লাভ করাও অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু মানব জীবনের আচার-আচরণ গতিরই অংশ, সুতরাং গতির বেলায় যেমন অবক্ষয়তা ও বিপর্যয় থাকে সেরূপে আমাদের বিকীর্ণ কর্মশক্তি গতির নিয়মে খারাপ-ভালো হওয়া প্রসঙ্গত নীতি বিরুদ্ধ নয়।

মনের চেতনায় দেহের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রতঙ্গ যখন কর্মশীল হয় তখন ঐ অঙ্গটিকে গতিশীল হয়েই কাজ করতে হয়। গতির ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি মানতে হয়। অন্যথায় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ১০০ কিঃ মিঃ গতি সম্পন্ন গাড়িতে যদি ৫০০ কি: মি: গতি তোলা হয় তাহলে ঐ গাড়িটিতে যেমন বিপর্যয় ঘটতে পারে, তেমনি তার থেকে নিঃসৃত হওয়া শক্তিগুলোতেও চরম ক্ষতির সৃষ্টি হয়ে তা কালো ধোঁয়ায় পরিণত হতে পারে। সেজন্য সীমালঙ্ঘনকারীদের বেলায় দুনিয়ার

www.nagorikpathagar.org

জীবন ও পরকাল উভয়টিই বিপর্যয়ের। এদিক থেকে মানব জীবনের জন্য ঈমান ও উত্তম আমল (কাজ) গতিকে নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ পন্থা। অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম দুনিয়া এবং আখেরাতের সুন্দর-সুস্থ ও আরামদায়ক জীবন পদ্ধতি তৈরী করার এক বিশেষ প্রযুক্তিগত কৌশল। এই প্রযুক্তি বা কৌশল অনুসরণ করে আমরা আমাদের জীবনী শক্তির বিরাট অংশকে উত্তম মানসম্পন্ন করে পরজীবনের জন্য সঞ্চয় করতে পারি।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায় মানুষের মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। দুনিয়ার জাগতিক ধ্যান ধারণা ও কাজ কর্মের মাধ্যমে সর্বদাই নিয়োজিত থাকলে সেক্ষেত্রে আত্মিক উন্নতি ব্যতীত দুনিয়া মত্ত জীবন ব্যবস্থায় সে শক্তি তৈরী হয় না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আত্মিক উন্নয়নের একটি কৌশল। আধ্যাত্মিক সাধনাকে ইসলামী মতে মারেফাত বলা হয়। যুগে যুগে মানুষ পৃথিবীর বহু বস্তু ও প্রাণী নিয়ে দিন-রাত গবেষণা করে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। তেমনি এ যুগে আধ্যাত্মিক সাধনারও নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন হয়েছে। সিলভা মেথড-এর মধ্যে একটি আত্মিক সাধনার দাবীদার। সে যাই হউক না কেন আত্মিক উন্নতি ব্যতীত ভালো মানের সত্তা তৈরী আশা করা যায় না।

একটি ত্রুটিপূর্ণ গাড়ির ইঞ্জিন থেকে যেভাবে কালো ধোঁয়া বের হয়, পক্ষান্তরে একটি ভালো ইঞ্জিনের গাড়ি থেকে সেরূপ ধোঁয়া বের হয় না। মানুষের দেহ ইঞ্জিনটি চালায় তার মন। অর্থাৎ মন হলো দেহের চালক। এ চালক যদি খারাপ থাকে তাহলে তার দেহ ইঞ্জিনের কোষ প্রাচীর ভেদ করে যে শক্তি বের হবে, সেগুলো তো কালো ধোঁয়ার মতো হওয়াই স্বাভাবিক। সেজন্য অবস্থা দৃষ্টে পাপ-পুণ্য ও বিকীর্ণ কর্মশক্তিকে একই মনে হয়। মূলত দু'ধরনের কিতাবে একই জিনিসেরই ভিন্ন নাম হয়েছে।

পাপীর বাসস্থান অন্ধকারাছন্ন ও জ্বালাময় এবং পুণ্যবানের বাসস্থান আলোকোজ্জ্বল ও শান্তিময়। পাপের সত্তার রূপ অন্ধকারাছন্ন এবং পুণ্যের সত্তার রূপ উজ্জ্বলতর। পক্ষান্তরে বিকীর্ণ সত্তার মধ্যে খারাপ মানের সত্তা হলো কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং ভালো মানের সত্তা হলো আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। এসব লক্ষণ দেখে পাপ-পুণ্য ও বিকীর্ণ সত্তাকে অবস্থান্তে একই মনে হয়।

কোন বস্তুর রূপ যদি পাল্টে যায় তাহলে তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য পাল্টে যাবে। যেমন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রূপ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হলেও যখন এই মৌলিক পদার্থগুলো মিলে পানি তৈরী হয় তখন তাদের গঠন ও রূপ যেমন পাল্টে যায় তেমনি তাদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বিলীন হয়ে যায়। আবার গতির

www.nagorikpathagar.org

তারতম্যের জন্য গঠন পাল্টাতে পারে। গতির সাথে বস্তুর রূপ, গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কযুক্ত। সে কারণে বিকীর্ণ সত্তা ও পাপ-পুণ্যের মহামিলন গতির কারুকার্য বিশ্লেষণ করা ব্যতীত উপলব্ধিতে আনা কষ্টদায়ক। অতঃপর মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্মশক্তিকে আমরা তখনি পাপ-পুণ্য বলতে পারব যখন দেখা যাবে বিকীর্ণ কর্মশক্তির রূপ ও তার গুণাগুণ মানব জীবনের আচার আচরণের সাথে সম্পর্কশীল।

মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তি

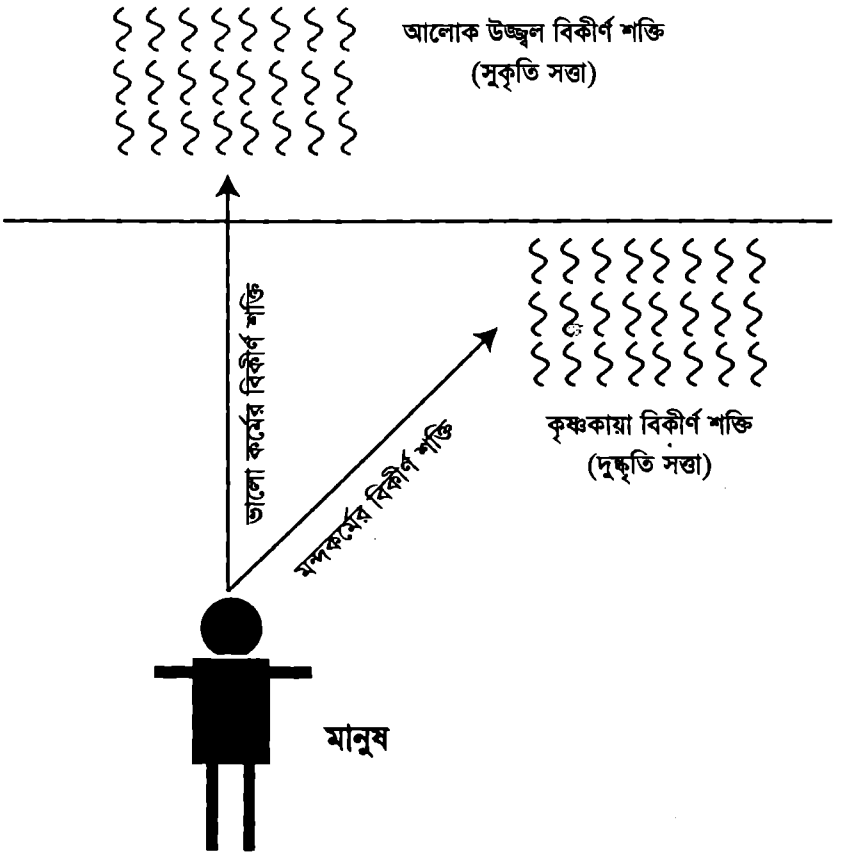

"সেদিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্য পৃথক পৃথকভাবে বের হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও সৎ কাজ করবে তাও সে দেখতে পারবে, আর যে বিন্দু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে; তাও সে দেখতে পারবে।" (সূরা আল-যিলযাল : ৬-৮)

"পাপ-পুণ্য দু'টি সৃষ্ট বস্তু।" (আল-হাদীস)

www.nagorikpathagar.org

মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির রূপ ও তার গুণাগুণ

পৃথিবীটাই রূপ রংগের খেলা। কোটি কোটি মানুষের রূপ, রঙ, গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি এতো বিচিত্র, এতো ভিন্ন যার ফলে প্রতিটি মানুষকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হয় না। বাগানে রয়েছে অনেক রংয়ের ফুল। হলুদ, লাল, খয়েরি আরো কতো রঙ বেরংয়ের ফুলেরা মিলে করেছে বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি। সূর্যের রশ্মিতে রয়েছে সাত রকম রংয়ের সমাহার। বাগানের বিচিত্র শোভা, মানুষে মানুষে প্রভেদ ইত্যাদি কতই না রহস্যময়? কে করছেন এতো পরিবর্তন।

সৃষ্টির নিয়মে কোন কিছুর রূপ, কাঠামো গুণ চিরন্তন নয়। যখন একটি আকার অন্য আকারে ঢুকে তখন তার রূপ, কাঠামো ও গুণ সবই পরিবর্তন হয়। একই জিনিস বা শক্তি ভিন্ন আকার বা ডাইছের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হওয়ার সময় তার রূপ, গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি সবই পরিবর্তন লাভ করে। এর জন্য অবশ্য কৌশল মেনে চলতে হয়। যেমন মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরী করতে যেরূপ কৌশল অবলম্বন করতে হয় তেমনি অন্যান্য জিনিসের বেলায়ও কৌশলের প্রয়োজন পড়ে।

প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকণা অহরহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিংবা জীবন যুদ্ধের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর সময় সেগুলো থেকে শক্তি বিকিরণ হয়। এই শক্তি সে খাদ্য অথবা সূর্য থেকে আহরণ করে। এ শক্তিগুলো বিকিরণ হওয়ার সময় একটি আকারের মধ্যে দিয়ে বিকিরণ হয়। এতে ঐ আকার বা ডাইছের কোন ছাপ তাতে পড়ে কিনা, তা আমরা বলতে পারি না। অদৃশ্য বিকীর্ণ শক্তিগুলো ঢেউয়ের আকারে চলে। এদের কম্পাংক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিগ্রহ রূপ একটি পূর্ণ একক সত্তা হিসেবে নিজ অস্তিত্ব নিয়ে শূন্য মাধ্যম দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় যায়? তার ঠিকানা আমাদের জানা নেই। আমরা জানি এদেরকে পৃথিবী কিংবা সূর্য কেউ আদর করে না। গ্রহণ করে না। বিকিরণের নিয়মেই একের বিকীর্ণ শক্তির সাথে অন্যে বিকীর্ণ শক্তির কোন সংমিশ্রণ হয় না। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়েই হারিয়ে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে।

পৃথিবীতে একটি মানুষের স্বভাব, আকৃতি প্রকৃতির সাথে অন্যজনের কোন মিল না থাকলেও প্রত্যেকের জড়গঠনে রয়েছে একই ধরনের শক্তি। কিন্তু একই রকমের শক্তি দিয়ে সবকিছু তৈরী হলেও, কেন এই অমিল? কেন এই ভিন্নতা? আসলে এই ভিন্ন গঠন প্রকৃতির সাজানো খেলা। আর এই প্রকৃতি স্রষ্টার কুদরতি হাতে গড়া। এ জগৎ যেন আলো আর গতির ধাঁধাঁয় গড়া। এর সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে স্রষ্টার অভিব্যক্তির ছাপ। মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি বা খলিফা। যাদের

www.nagorikpathagar.org

অভিব্যক্তি বা ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে তাদের অভিব্যক্তি থেকেও বিচিত্র ধরনের রূপ, রঙ ও আকৃতির সত্তা জন্ম হতে পারে। জীবন খেলায় আমাদের মনের প্রভাব এই দেহ রাজ্যের থেকে যে সত্তা বিকিরণ হয় এতেও তার ছাপ লাগতে পারে। এতে সেগুলোর রূপ রঙ আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের হওয়া স্বাভাবিক। যেখানে তরঙ্গের পুটলা আর বিদ্যুতের ঢেউ দিয়ে রঙ বেরংয়ের জীব ও জড় অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে সেখানে আমাদের বিকীর্ণ সত্তা দিয়ে কি কিছুই সৃষ্টি হবে না ? সকল মানুষের বিকীর্ণ সত্তার রূপ রঙ কি এক রকম হবে ?

আমরা জীব। আমাদের জীবন আছে। আমরা কাজ-কর্ম চলা-ফেরা করি। প্রজনন ধারা সৃষ্টির নিয়মেই আমাদের মধ্যে চালু আছে। এখানের প্রকৃতির সবকিছু আমাদের সুহৃদ নয়। এখানে আছে আমাদের বৈরী সত্তা। বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে জীবন গতির গাড়িতে ভর করতে হয়। সে কারণে আমরাও ডুবে আছি গতির সাগরে। সোফায় বসে থেকে যদি বলি আয় খাবার আমার মুখে আয়, এতে খাবার মুখে আসে না। খাবার গ্রহণের জন্য হাত নাড়তে হয়, মুখ নাড়তে হয় আবার ঐ খাবার যোগাড় করতে গিয়ে কাজ করতে হয়। তাই এই পৃথিবীতে গতিশীল না হয়ে কিছু করা যায় না। এই গতির জন্য দুনিয়াতে মৃত্যু, ক্ষুধা, রোগবালাই ইত্যাদি আমাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকে। এদের থেকে কোনক্রমেই আমরা রেহাই পাই না।

দুনিয়ার জীবনে মৃত্যু আসলেও প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের দেহের বিভিন্ন জীবকোষগুলোর কিছু অংশ মৃত্যুবরণ করে। আবার সময়ের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো নব জন্মও লাভ করে। তাই জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন জীবদেহের নিত্য দিনের খেলা। এক্ষেত্রে ক্ষুধার ভূমিকা অনন্য। সেজন্য ক্ষুধাকে আমরা জয় করতে পারি না। এই ক্ষুধাই আমাদেরকে অহরহ তাড়িত করে। একে এটম দিয়ে জয় করা সম্ভব হয় না। খাদ্য পেলেই সে পরাজয়বরণ করে। খাদ্যের যে অংশটুকু দেহ গ্রহণ করে, তা থেকেই সে পায় শক্তি। কিন্তু এই শক্তি একবার গ্রহণ করলে সে শক্তি দেহে চিরদিন মওজুদ থাকে না। সেজন্য দেহ কিছু সময় পরেই আবার খাদ্য গ্রহণ করার জন্য পাগল হয়ে যায়।

কেন এই ক্ষুধা আমাদেরকে বার বার আক্রমণ করে? কেনই বা পাকস্থলী বার বার খাদ্য খাওয়ার জন্য বিদ্রোহ শুরু করে? তার কারণ আর কিইবা হবে, পাকস্থলীতে যে খাদ্য থাকে সে তো পরিপাক হওয়ার পর থেকেই তার সার অংশ কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একে একে ব্যয় হয়ে থাকে। সেজন্য ক্ষুধা বার বার

www.nagorikpathagar.org

লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই শক্তি যখন দেহ থেকে বের হয়ে চলে যায় তখন কি ব্যক্তি জীবনের চরিত্রগত আচরণের (গতির) কোন ছাপ সেই বিকীর্ণ সত্তার ব্যূহ প্রাচীর ভেদ করে তার গায়ে আঁচড় কাটে কিংবা দুষ্কৃতি অথবা সুকৃতির গন্ধ লাগিয়ে দেয়? আমার বিশ্বাস আঁচড় লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার দৃষ্টান্ত পূর্বে দেয়া হয়েছে। তবু এর পরও প্রশ্ন থেকে যায় এই বিকীর্ণ সত্তার রূপ উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল হওয়ার কি কোন প্রমাণ দেয়া সম্ভব? কিংবা এরূপ হলে তার রূপ, বর্ণ, গোত্র ও গুণাগুণ আলাদা হওয়ারই বা কারণ কী?

পৃথিবীর কোন মাধ্যমের বিকীর্ণ সত্তাই আমরা দেখি না এবং এর বাহ্যিক গুণাগুণ কেমন তাও আমরা ভোগ করিনি। কেউ যদি বলে আমটি ফজলি আমের মতো মিষ্টি। কিন্তু যে ফজলি আম খায়নি তার পক্ষে আমের স্বাদ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তেমনি কেউ যদি পাত্রী দেখে এসে অন্য যারা দেখেনি তাদের কাছে বর্ণনা করে তখন সে নিজের পারিপার্শ্বিক পরিসরের মধ্যে অন্য একটি মেয়েকে দিয়ে তুলনা করে বুঝাতে চেষ্টা করে। হয়তো সেই মেয়ে হুবহু তার মতো না হলেও দেখতে অনেকটা সাদৃশ্যমূলক হয়। এভাবে না বুঝালে কারও বুঝে আসাই সম্ভব নয়। তাছাড়া যে বুঝবে তার পক্ষেও বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

সেজন্য যে জিনিস দেখানো সম্ভব নয় এবং যার গুণাগুণ ও স্বাদ উপলব্ধি করা যায়নি তার বেলায় রূপক বর্ণনা ছাড়া কোন সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়ার আশা করা ঠিক নয়। সে কারণে বিকীর্ণ সত্তার বেলায় রূপক অস্তিত্বকে দর্শন ও যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। এ ছাড়া তার সঠিক বর্ণনা দেয়া দুরূহ ব্যাপার।

অবস্থা দৃষ্টে দেখা যায়, কালো গাভীর গর্ভের বাছুর কালোই হয় যদি পাল দেওয়ার ষাড়টিও থাকে কালো। অসৎ পথে উপার্জিত খাদ্য খেয়ে যদি কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে দুনিয়ার জীবনের পাপাচারে নিমজ্জিত থাকে তাহলে তার বিকীর্ণ সন্তান নষ্ট বা মন্দ স্বভাবের হওয়াই স্বাভাবিক। এটিই স্রষ্টার কুদরতি হাতে গড়া প্রকৃতির প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা।

মানুষের আচার-আচরণ গতির মধ্যে কাটে। গতির তারতম্যের জন্য কোন জিনিসের কাঠামো এক রকম হয় না। যেমন রিক্সা, জীপ, প্লেন ইত্যাদির গতির তারতম্যের জন্য তাদের কাঠামো এক রকম নয়। পাখি আকাশে উড়ে তার ডানা আছে। মানুষ পায়ে হেঁটে চলে তার পা আছে বলে। কিন্তু মানুষের উড়ার মতো ডানা নেই বলে সে উড়তে পারে না। প্রত্যেকের চলার গতি যেমন ভিন্ন তেমনি

www.nagorikpathagar.org

তাদের আকার-আকৃতি ও রূপ-গুণ ভিন্ন। উদরের উচ্ছিষ্ট খাবার ত্যাগ করার জন্য মানুষ প্রকৃতির ডাকে সকল ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে বাইরে যায়। সে যা ত্যাগ করে তা থাকে দুর্গন্ধযুক্ত। কিন্তু খাবার সময় উদর যা গ্রহণ করেছিল তা ছিল সুস্বাদু ও সুগন্ধময়। খাদ্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ জীবকোষগুলো গ্রহণ করে। এগুলোও জীবকোষ কাজে, অকাজে প্রকৃতির দায় সারতে বের করে দেয়। এগুলো যখন বের হয়ে যায় তখন কি এর পুরো অংশই উচ্ছিষ্ট থাকে? না এ থেকে ভালো মানের কিছু তৈরী হয়?

আমাদের উদরের উচ্ছিষ্ট অংশ প্রকৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু জীবকোষের বিকীর্ণ সন্তান প্রকৃতি বরণ করে না। খাওয়া-দাওয়া এবং পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি জীবের স্বাভাবিক আচরণ। যেমন পশুরাও খায়, আমরাও খাই। পশুরাও মল ত্যাগ করে, আমরাও করি। পশুরা যৌন কাজে লিপ্ত হয়, আমাদেরও যৌন ক্ষুধা আছে। তবে উভয়ের সঙ্গম ব্যবস্থা যেমন এক রকম নয়, তেমনি অন্যান্য কাজগুলোও মানুষ পশুদের মতো করে না। পশুদের বেলায় নিয়মনীতি মানতে হয় না কিন্তু মানুষ নিয়মের অধীন।

পক্ষান্তরে মানুষের ভেতরে একটি জটিল আচরণ বিরাজ করে। এই আচরণ স্রষ্টায় বিশ্বাস ও তার অনুগত্য স্বীকার করা। এই ঐশী জ্ঞানের জন্য মানুষকে স্রষ্টার কাছে তার কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু পশুদের এই গুণ নেই বলে তাদের কোন জবাবদিহিতা নেই। গতির জন্য যেমন প্রত্যেক জিনিসের রূপ, গুণ, গঠন ভিন্ন হয় সে কারণে আমাদের আচার আচরণের (গতির) বিকীর্ণ সন্তানের গঠন কাঠামো বর্ণ, রূপ, গুণ ভিন্ন ও ভালো-মন্দ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এরূপ না হলে পশুদের মতো আমাদেরও কোন বিধান অনুসরণ করতে হতো না। আমাদের জীবন নীতিতে কোন নিয়ম অনুসরণ করলে ভালো মানসম্পন্ন সত্তা সৃষ্টি হতে পারে তা আমরা জানি না। সেজন্য ঐ নিয়ম প্রকৃতির বিধানকর্তাই জানিয়ে দিয়েছেন।

মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির ধরন ও তার গুণাগুণ ভিন্ন আচরণের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্ণনা করা যায়। বিজ্ঞানের এই যুক্তি যদি সত্যকে বের করে আনতে পারে তাহলে সেই সত্য আমাদের নতুন জ্ঞান দিয়ে ঈমানের শক্তিকে করবে বলীয়ান।

এ বিশ্বজগতের গতির ফলে যে সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। এই

www.nagorikpathagar.org

গতির ফলেই প্রকৃতিতে শ্রেণীগত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন শ্রেণীগত রূপ স্রষ্টার অভিব্যক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল। মানুষ স্রষ্টার অভিব্যক্তির শ্রেণীগত বৈষম্যের উন্নততর বিকাশ। মানুষের আছে কর্মের স্বাধীনতা। তাদের আচার আচরণের মাঝে যেমন গতি বিরাজ করে তেমনি তার দেহের সূক্ষ্ম জীবকোষের পরমাণুর ভেতরও গতির তুফান চলে। এই গতির ফলে পরমাণুর উদরস্থ শক্তির মাঝে ব্যক্তি চরিত্রের গতির সংমিশ্রণ ঘটতে পারে। এই সংমিশ্রণ মানব মনের অভিব্যক্তির ফল। এর জন্য তার রূপ, গুণের শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

বস্তু বলতে আমরা যা কিছু বুঝি এর মৌলিক সত্তা সূক্ষ্ম বিদ্যুতের কণা। এই কণা দিয়েই তৈরী হয়েছে পরমাণু, তা থেকে কোটি কোটি পরমাণুর সাজানো স্তর দিয়েই স্থূল আকারে সৃষ্টি হয়েছে অণু। বস্তুর পারমাণবিক ভর তার রূপ, গুণ ও কাঠামোকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সাজিয়েছে। বিশেষ করে পরমাণুর প্রোটন সংখ্যার উপর বস্তুর পরিচয় নির্ভর করে।

সে যাই হোক এই প্রোটন তো আর সূক্ষ্ম বিদ্যুতের আঁধার ছাড়া সৃষ্টি হয়নি। পক্ষান্তরে বস্তুর সূক্ষ্মাতীত পরমাণুতে আছে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণিকা এবং নৈর্ব্যক্তিক কণিকা। ভাবতে অবাক লাগে, এরূপ কণিকা দিয়েই তো মাটি, পানি, বায়ু, ফুল-ফল আরও কত রঙ বেরংয়ের জিনিস সৃষ্টি হয়েছে। তবে মরিচ কেন ঝাল লাগে? চিনি কেন মিষ্টি হয়? ফুল থেকে কেন সুগন্ধি আসে? মল, মূত্র কেন দুর্গন্ধযুক্ত হয়? জীবাণু কেন যন্ত্রণা দেয়? আলোকরশ্মির কেন এতো বিচিত্র রূপ ও গুণ? আলোকরশ্মি, গামারশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি ইত্যাদিই বা কেমনে সৃষ্টি হলো?

প্রকৃত বাস্তবতায় দেখা যায় এসব রশ্মির প্রকারভেদ সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেক রশ্মির কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শ্রেণীভেদের উপর নির্ভর করে। এদের মধ্যে গামারশ্মি অত্যন্ত মারাত্মক। কোন মৌলের আইসোটোপকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে নিউক্লিয়ার ফিসন বা বিভাজন বিক্রিয়ায় পারমাণবিক শক্তি বের হয়। এই শক্তি খুব মারাত্মক। আর একপ্রকার শক্তি আছে তাকে বলা হয় তড়িৎ চুম্বক শক্তি (Electro magnetic energy) একে বেতার তরঙ্গ বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করে খবরা-খবর প্রেরণ করে। বেতার তরঙ্গের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পন সংখ্যার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ দিয়ে।

www.nagorikpathagar.org

টিভির প্রেরক যন্ত্র কোন দৃশ্যকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে রূপান্তরিত করে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয়। এই তরঙ্গগুলো শূন্য মাধ্যম দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিভির গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। এটিও তড়িৎ-চুম্বকশক্তি। আবার আলোকরশ্মির প্রকৃতিও তড়িৎ-চুম্বকশক্তির অনুরূপ। তবে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আরও ক্ষুদ্র। আলোকরশ্মি ভিন্ন রংয়ের ও রূপের হয়। যেমন লাল, বেগুনী, হলুদ ইত্যাদি। এই রশ্মির রংয়ের পরিবর্তন নির্ভর করে আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। লাল আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অন্যান্যদের চেয়ে বেশি বড়। সেই তুলনায় বেগুনী আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। কি বিচিত্র এই প্রকৃতির লীলা খেলা। লাল, বেগুনী, সবুজ আর কালো কত রঙই তো দেখি। যেখানেই চোখ যায় সেখানেই রংয়ের খেলা আর গতির ঝিঁঝিঁ রব। আমাদের চোখে যেন প্রকৃতির রঙিন চশমা লাগানো।

পৃথিবীর মাঠ-ঘাটে, আসমানের ছাদ জুড়ে আলো আর গতি মিলে করছে খেলা। আমরা যেহেতু আলো আর গতিরই উপাদান, সেজন্য এই খেলার দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। তাই বিস্ময়ে ভাবি এই গতি কে সৃষ্টি করেছেন? কে সেই প্রজ্ঞাবান? আমরা তো মানুষ, আমাদের বিকীর্ণ সন্তান আমাদের আচরণ (গতি) থেকেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সন্তানের রূপ ও গুণাগুণ কেমন তা কি ভেবেছি কোন দিন? নীল আকাশের অসীম গর্তে এই পৃথিবীর পৃষ্ঠে কত রঙ বেরংয়ের মানুষ বাস করে। এখানে সবাই গতিশীল ও কর্মময়। আমাদের মনের উদ্দীপনায় দেহ গতিশীল হয়। স্বামী-স্ত্রীর দেহ-মিলন থেকে নিয়ে পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যা গতিশীল না হয়ে করা যায়। তাই পরোক্ষভাবে আমরা আমাদের কর্মের স্রষ্টা। এই কর্মময় গতি যদি সৃজনশীল না হয় তাহলে আমাদের বিকীর্ণ সন্তান বিকলাঙ্গ বা মন্দ স্বভাবের হতে পারে।

আলোর গতির ভিন্নতার জন্য যেমন তার রূপ, রঙ ও গুণের পরিবর্তন ঘটে থাকে তেমনি মানুষের আচরণের (গতির) ভিন্নতার জন্য তার বিকীর্ণ সত্তার রঙ রূপ ও গুণের পরিবর্তন হতেই পারে। পৃথিবীতে বিভিন্ন টিভির চ্যানেল হতে যেভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের তরঙ্গ প্রেরণ করা হয় তেমনি মানুষকে যদি একটি জীবন্ত প্রেরক মাধ্যম ভাবা যায় তাহলে দেখা যাবে মানুষের পক্ষ থেকেও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়া কাল্পনিক কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ থেকে যে শক্তি বিকীর্ণ হয় সেটিও এক প্রকার তরঙ্গ। তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর যেহেতু তরঙ্গের রূপ, রঙ ও স্বভাবের পরিবর্তন নির্ভর করে সেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মানুষের

www.nagorikpathagar.org

আচার আচরণ থেকে তাদের বিচ্ছুরিত (বিকীর্ণ) শক্তির রূপ, রঙ ও স্বভাবের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ কিছু সংখ্যক সত্তার দ্বারা হুমকির সম্মুখীন। এর দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়। জীবন ধারণের জন্য পরিবেশ দূষণ হুমকির কারণ। কিন্তু তড়িৎ-চুম্বক শক্তি এদিক থেকে অনেক নিরাপদ। পক্ষান্তরে বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে মানব জাতির মঙ্গল-অমঙ্গল দু'টিই হতে পারে। সেজন্য গুণাগুণের দিক থেকে একে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন মঙ্গলকারী বিকীর্ণ শক্তি ও অনিষ্টকারী বিকীর্ণ শক্তি। আবার বর্ণের দিক থেকেও বিকীর্ণ শক্তি দু'ধরনের, যেমন কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি ও আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি।

অন্ধকার মানব মনের কাছে ভয়ভীতির ব্যাপার। আলোতে মানুষের প্রাণ যেমন উজ্জ্বল ও ভীতিহীন থাকে অথচ অন্ধকারে তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও ভীতিমুক্ত থাকতে পারে না। সূর্য যখন ডুবে যায় তখন অন্ধকার দানবের মতো সবগ্রাস করে। আমাদের তখন আশা থাকে ১০/১২ ঘণ্টা পর আবার সূর্য ফিরে আসবে। তাই হয়তো রাত্রিটা কেটে যায় দিবসের প্রতীক্ষায়। আমাদের তখন ভয় থাকে না। সে মুহূর্তে মনের কোণে আশা নামক প্রহরীটি ভয়কে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু এমন যদি হয় যে রাত্রি আর কাটবে না। দিন আর ফিরে আসবে না। সূর্য আর কখনো উঠবে না। তাহলে অন্ধকারের মাঝে মহাসুখে থাকলেও কেউ তা চাইবে বলে মনে হয় না। কারণ সুখের অন্ধকারও মহাযন্ত্রণাদায়ক। অথচ জাহান্নামের অন্ধকারে আযাবও থাকবে।

সুতরাং সে স্থান কত কষ্টের হবে, কত বিষাদের হবে, সে তো ভাবাই যায় না। এমন স্থানের কথা মনে হলে ভয়ে কার না শরীরের পশম শিহরিয়ে উঠে! এ জগতে ভয় আছে, দুঃখ আছে, আছে ভালবাসা ও শান্তি-সুখ। পক্ষান্তরে পরপারের জগতে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। তবে পার্থক্য এতটুকু, পৃথিবীতে একই পরিবেশে যেমন ভয়, দুঃখ, ভালোবাসা-সুখ-শান্তি সব মিলে মিশে থাকে, পরকালের জগৎটি এমন হবে না। ভয়-দুঃখের জায়গায় ভালোবাসা, সুখ থাকবে না, আবার ভালোবাসা ও সুখের স্থানে ভয়-দুঃখের কোন গন্ধও থাকবে না। এটি হলো পরকালীন জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। ভয়ের জগতের প্রাণীরা থাকবে কুৎসিত ও কালো। তারা দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকবে। অপরদিকে ভালোবাসা আর সুখের জগতের মানুষ ও জ্বিনগণ থাকবে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদের কিরণের চেয়েও উজ্জ্বল।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর জীবনে আমাদের চিন্তাশক্তি এবং কর্মের স্থবিরতা আছে। আছে সর্বক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা। সে কারণে আমাদের জ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি, দেখার যেখানে শেষ, সেখানেও আমাদের জানা ও দেখার বাকী থেকে যায়। একটি বৈদ্যুতিক বাতি যেখানে জ্বলে তার উপরে দেয়ালের গায়ে কালো দাগ দেখে চিন্তা হয় আলোর কণা তো আর কালো নয়, তবে সেখানে কালো দাগ পড়লো কেন? মনে হয় আলোর উজ্জ্বল রশ্মির ফাঁকে ফাঁকে কিছু অনুজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ হয়। এর জন্য হয়তো দেয়ালের গায়ে কালো দাগ পড়ে। আমরা যে শক্তি বিকিরণ করি তাতে যে কালো রংয়ের অনুজ্জ্বল সত্তা নেই তা কি করে বলা যায়।

আমাদের জীবকোষের একটি পরমাণুকে একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব-এর সাথে তুলনা করা যায়। বৈদ্যুতিক বাল্বে যেমন পজেটিভ, নেগেটিভ ও নিউট্রাল ফেইজসহ একটি কুণ্ডলীকৃত তার থাকে তেমনি একটি পরমাণুর ভেতরেও প্রোটন (+) নিউট্রন (নৈর্ব্যক্তিক) এবং ইলেকট্রন (-) আধানসহ নিউট্রিনো থাকে। এখানে নিউট্রিনোর সাথে কুণ্ডলীকৃত তারটির সম্পর্ক দেখানো যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী পাওয়ার স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গ পজেটিভ তারটি দিয়ে তরঙ্গের ন্যায় নেচে নেচে এসে বৈদ্যুতিক বাল্ব-এ পৌছে। তবে মাঝে অনেক স্টেশন, সাব-স্টেশন পেরিয়ে সেটি আসে। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাল্ব-এ এসে সেই শক্তি যখন নেগেটিভ ফেইজ দিয়ে ফিরে যেতে চায় তখন এ দু'টি তারের মধ্যে সংযোগকারী কুণ্ডলীকৃত তারটি দিয়ে আলো বিকিরণ হয়।

তেমনি আমাদের দেহের অসংখ্য পরমাণু নামক জীবন্ত বাল্ব দিয়ে যে শক্তি বিকিরণ হয় এর মূল পাওয়ার স্টেশন হলো বাম পাঁজরের নিচে। এর চালক হলো মন। মনের টারবাইন ঘুরে যে অনুভূতি আর প্রেরণা উদয় হয় এগুলো ঢেউ এর ন্যায় ছুটে যায় দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর অসংখ্য বৈদ্যুতিক তারের ন্যায় নিউরন দিয়ে। দেহের এই বৈদ্যুতিক তার বা নিউরনের পথে পথে রয়েছে ছোট ছোট সাব-স্টেশন বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এই সাব-স্টেশন থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনী শক্তির ঢেউ, কাজ সম্পাদনকারী অঙ্গের কোষস্থ পরমাণুর ভেতরে পৌছে। তখন কোষ দেহের ঐ পরমাণু থেকে শক্তি বিকিরণ হয় যেমনি বৈদ্যুতিক বাল্ব হতে আলো বিকিরণ হয়।

পরমাণুর গর্ভ থেকে জীবনী শক্তির যে সন্তান তখন ভূমিষ্ঠ হয়, এ সন্তানের গায়ে অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম ছাপ লেগে থাকে। এই তথ্য কণা তখন ভালো-মন্দ ইত্যাদি স্বভাব নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ভালো মন্দ হওয়ার পেছনে চালকের মর্জি বা নিয়তের উপর সে সিস্টেমটিতে ত্রুটি দেখা দেয়। বৈদ্যুতিক বাল্ব যে আলো বিকিরণ করে

www.nagorikpathagar.org

সেটিতেও রয়েছে প্রযুক্তির ব্যাপার-স্যাপার। এর কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে পুরো ব্যবস্থাটিই অকেজো হয়ে যায়। এতে বাতি জ্বলে না। আলো বিকিরণ হয় না। এই ত্রুটি পাওয়ার স্টেশনে দেখা দিতে পারে কিংবা রাস্তার ছোট ছোট সাব-স্টেশনেও দেখা দিতে পারে। অথবা বাল্বটিতেও দেখা দিতে পারে।

পাওয়ার স্টেশন থেকে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলো প্রবাহের মাত্রা ঠিক করে (ভোল্টিজ ঠিক করে) বাল্ব-এ প্রেরণ করে। এই মাত্রার উঠানামা করলে বাতি জ্বলবে না। (যেমন ২২০ ভোল্টেজের বেশি হলে বাতি জ্বলে না)। এর জন্য বাল্বটি ফিউজ হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সেটি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তেমনি মানব মনের কর্ম প্রেরণার প্রবাহ যদি অতি মাত্রিক বা সীমালঙ্ঘনশীল হয় তবে জীবকোষের সূক্ষ্মাতীত পরমাণু নামক বাল্বটি আলো বিকিরণ না করে মরে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার চেতনা শক্তির অবক্ষয় আসবে।

জীবকোষের পরমাণু নামক বাল্বটি অকালে ফিউজ হয়ে বিকলাঙ্গ সত্তায় পরিণত হবে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ফিউজ বাল্ব সেখান থেকে খুলে নিয়ে যেমন নতুন বাল্ব লাগানো যায় তেমনি মানব দেহের পরমাণু নামক বাল্বগুলো মরে গেলে সেক্ষেত্রে সেখানে নতুন বাল্ব জন্ম নেয়। এভাবেই চলতে থাকে জীবন সংগ্রাম। সাথে সাথে ক্ষয়ে পড়ে জীবনের এক একটি মুহূর্ত। এর মাঝেই লুকিয়ে থাকে কর্মের গন্ধ। এই সত্তা হারিয়ে যায় মহাবিশ্বের অন্ধকার বলয়ের মাঝে। সেই রাজ্যের ঠিকানা হয়তো আমরা খুঁজে পাই না।

এভাবেই ধীরে ধীরে জমতে থাকে মানব জীবনের বিকীর্ণ শক্তির নিষ্প্রভ আলো। এই বিকীর্ণ নিষ্প্রভ আলোক সত্তা দিয়েই তৈরী হবে যন্ত্রণাকারীর বিকলাঙ্গ বিভীষিকাময় উদ্ভূত কালো-সন্তান। এই সন্তানগুলোর গায়ের রঙ হবে আল-কাতরার মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে সন্তানগুলোই একদিন জন্মদাতা পিতাকে নিজের উদরে টেনে নিবে। পরিশেষে এরাই তাকে যন্ত্রণা দিবে আজীবন।

আমাদের দেখার যেখানে সীমানা শেষ, এরপর আরও অনেক কিছু দেখার থেকে যায়। তাই যত নিখুঁতভাবেই আমরা দেখি না কেন এই সীমাবদ্ধতার আড়ালে যে কিছু লুকিয়ে নেই সেকথা বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া আমাদের দেখার মাঝেও অনেক ভুল থাকে। কিন্তু একমাত্র নির্ভুল ও অভ্রান্ত ব্যাখ্যা হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। সেই নির্ভুল কিতাবে পাপের স্বরূপ ও তার স্বভাব সম্পর্কে কি ধারণা দেয়া হয়েছে, তা তলিয়ে দেখে হৃদয়ের স্মৃতি পটে সেই ধারণা ধারণ করে সঠিক পথ খুঁজে নেয়াই আমাদের জন্য উত্তম।

www.nagorikpathagar.org

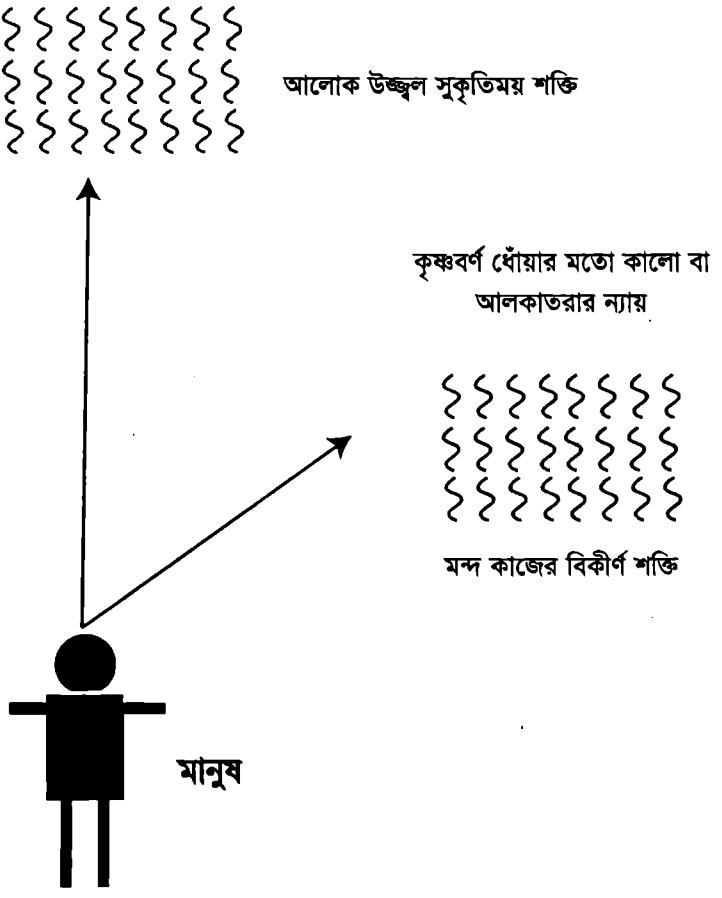

"তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি–যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না।" (সূরা ওয়াকিয়াহ : ৪৩)

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে।" (সূরা আলে ইমরান : ৩০)

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনের তাৎপর্য ও পাপ-পুণ্যের দৃষ্টান্ত

ঐশী কিতাব এমনি এক বিচিত্র গ্রন্থ যার মাঝে রয়েছে জীবনের সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান। এতে এমন কোন বিষয় উহ্য নেই যার জন্য আমাদেরকে সমস্যায় পড়তে হয়। এর মধ্যে যেমন আছে বিশ্বের উৎপত্তির কথা, তেমনি রয়েছে এর শেষ পরিণতির কথা। আছে এতে চোরের হাত কাটার বিধান, রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। সবদিক বিচার করলে এতে কোন বিষয় উহ্য পাওয়া যায় না।

মানুষ দুনিয়ায় এসে প্রবৃত্তির তাড়নায় আশার বৈতরণী নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তাই বাঁচার জন্য মানুষকে হতে হয় সংগ্রামী। আমাদের সংগ্রামী জীবন স্বভাবের নীতিবিরুদ্ধ হলে সমাজ ও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে পারে না। কারণ প্রকৃতির বিরুদ্ধ নীতি স্রষ্টার সৃষ্টি বিধানেরও নীতি বিরুদ্ধ। এতে চরম অবক্ষয় দেখা দেয়। কারণ স্রষ্টা নিজেই তৈরী করে দিয়েছেন জীবন নীতির কানুন। এই কানুন না মানলে মানুষের কর্মজীবন থেকে উৎপন্ন হয় পাপ সত্তা। পক্ষান্তরে স্রষ্টার কানুন অনুসরণ করলে হবে নেক সত্তা। এই পাপ-পুণ্যগুলো জটিল ধরনের জিনিস। এগুলো কোথায় থাকে? কিভাবে তৈরী হয়? এগুলো দেখতে কেমন? আমরা এর কিছুই জানি না।

মানুষ মরে গেলে তার দেহের প্রতিটি বস্তু সত্তা একদিন মিশে যায় মাটির গর্ভে। জীবিত অবস্থায় সে পাচার করে এক জটিল সত্তা। মরার পর তার সবকিছু শেষ হয়ে গেলেও থেকে যায় তার জীবদ্দশার সকল আমল, আচরণের সত্তা : যেমন দেহ, দিল বা আত্মার নেকী বা পাপ। এগুলো তার নিত্যদিনের কাজের কর্মফল। আমাদের কাজের গতি প্রকৃতি এক রকম নয়। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী নেক-আমল ও বদ-কাজ আমাদের কর্মের ভিন্ন নাম। এই কর্ম থেকে যে সত্তা তৈরী হয় এদের নাম নেক ও গুনাহ। এই সত্তাগুলো কালো না লাল আমাদের দৃষ্টি শক্তি তার কোন খবর দিতে পারে না। আমরা শুধু জানি চোর যদি পরের জিনিস চুরি করে তাহলে তার পাপ হয়।

সেরূপে যত প্রকার অন্যায় কাজ আছে তা থেকেও পাপ সত্তা তৈরী হয়। পক্ষান্তরে নেক আমল করলে পুণ্য হয়। এখন যদি ভাবি এই পাপ-পুণ্য কেমন? এর কি কোন আকৃতি প্রকৃতি আছে? এগুলো কী শূন্যের মধ্যেই তৈরী হয়? এই প্রশ্নগুলো প্রকৃতপক্ষেই খুব জটিল। তাই এর উত্তর পাওয়াও খুব কঠিন।

আমরা জানি শেষ বিচারের দিন পাপ-পুণ্যগুলো ওজন করা হবে। সেদিন যাদের

www.nagorikpathagar.org

পুণ্য সত্তা বেশী হবে তারা হবেন জান্নাতী, অপরদিকে যাদের পাপ সত্তার ওজন বেশি হবে তারা হবে জাহান্নামী। যে জিনিস মাপা যায় ওজন করা যায়, এর অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে যার অস্তিত্ব আছে, তার রঙ, রূপ ও গুণ না থাকাও প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ। তাই পাপ-পুণ্যের রূপ, রঙ, বৈশিষ্ট্য আছে এ কথা মানতে হবে।

এখন চিন্তা করে দেখতে হবে মানুষের কর্মের সাথে এর সম্পর্ক কতটুকু। তবে বিষয়টি বুঝার আগে কর্মফল কি তা বুঝা প্রয়োজন।

আমাদের এই পৃথিবী সবুজ, শ্যামলের ছায়ায় ঘেরা। এর প্রতিটি অণু কণা প্রকৃতির বিধানের অধীন। প্রকৃতির বিধানের সাথে মানব জীবনের কর্মের বিধানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বের করতে পারলেই কর্মফলের রহস্যের দ্বার খুলে যাবে। পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে অনেক মৌলিক রীতিনীতি। সরকার চালায় রাষ্ট্র। ব্যক্তি মালিকানায় চলে মালিকের অধীনস্ত কর্মচারী বৃন্দ। প্রত্যেক জায়গায় আছে ব্যবস্থাপনা নীতি।

যারা সরকার বা ব্যক্তি মালিকানায় চাকরি করে তারা যদি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে তবে তারা পায় কর্মের বিনিময় মূল্য। মালিক পক্ষ এই মূল্য পরিশোধ করে টাকা-কড়ি কিংবা অন্য কোন মালামাল লেনদেনের মাধ্যমে। এই টাকা কড়ি বা মালামাল মালিকের কোষাগারে মওজুদ থাকে। কিন্তু যারা আনুগত্যশীল না হয়ে অন্যায় ও অসদাচরণে লিপ্ত তাদের জন্য রয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রথায় বিচারের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের প্রথা অনুযায়ী জেল, জরিমানা ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নিয়ম আছে। দুনিয়ার বিচারে কেহ কষ্টের সীমা অতিক্রম করলে জীবিত থাকে না। একজন ব্যক্তি যদি ১০টি খুন করে তবে তাকে একবারই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে। ১০টি খুনের জন্য দশবার জীবিত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া দুনিয়ার বিচারে সম্ভব নয়। সেজন্য একবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তার অন্যান্য বিচারের ইতি টানতে হয়।

পক্ষান্তরে ভালো কাজের পুরস্কার টাকা, পয়সা অন্যান্য মালামালই দিতে হয়। কিন্তু পরকালের জীবন ব্যবস্থায় দুনিয়ার কর্মের জন্য যে কর্মফল দেয়া হবে, সেগুলো কি পূর্ব থেকেই কোষাগারে গচ্ছিত কোন কিছু? সেখানের জেলখানা কি দুনিয়ার অনুরূপ কোন কিছু? কিংবা জাহান্নামীর জন্য মওজুদ আছে কি নিকৃষ্টমানের সম্পদ এবং মুমিন ও নেক বান্দাদের জন্য মওজুদ রাখা হয়েছে কি উৎকৃষ্ট মানের সম্পদ? খোদার কোষাগার কি পূর্ব থেকেই এই দু'ধরনের সম্পদে ভর্তি রয়েছে। না কি ভালো-মন্দের সম্পদ আমরা এই দুনিয়া থেইে পাঠাই?

www.nagorikpathagar.org

এর উত্তরে কে, কি বলবেন, জানি না। তবে আমার হৃদয় আরশিতে এক অজানা রহস্য দীর্ঘদিন ধরে উঁকি মেরে আছে। তার কথা হলো দুনিয়া যেহেতু পরকালের কর্মক্ষেত্র সেজন্য এগুলো পূর্ব থেকেই মওজুদ থাকতে পারে না। অপরদিকে এগুলো শূন্য থেকে তৈরী হয় না। কিংবা এগুলো দুনিয়ার ভালো কর্মফলের ন্যায় বিনিময়তুল্য কিছু নয়। মূলত কর্ম না ঘটার আগেই কর্মফলের সত্তা তৈরী থাকতে পারে না। অর্থাৎ ক্রিয়ার ফলে প্রতিক্রিয়ার সত্তা ঐ ব্যক্তি থেকেই উড়ে যায়। তাই কর্ম ও কর্মফল একটি আর একটির পরিপূরক।

দুনিয়াতে কৃষক জমি চাষাবাদ করে তাতে বীজ বপন করে। এক সময় ঐ বীজ গজিয়ে বড় গাছ হয়। তারপর সময় হলে তাতে ফল ধরে। অবশেষে ফল পাকলে কৃষক তা আনন্দে ঘরে তুলে এনে গোলায় মওজুদ করে রাখে। তারপর ঐ খাদ্য সে সারা বছর ভোগ করে।

একজন শিল্পী যখন কোন চিত্র অঙ্কন করতে ইচ্ছে করে তখন সে প্রথমেই মনে মনে ঐ ছবিটির একটি নক্শা আঁকে। তারপর সেটি রঙ আর তুলি দিয়ে বাস্তবে আঁকে।

মূলত কোন কাজ করার আগে প্রথমে নিয়ত (দৃঢ় ইচ্ছা) করতে হয়। এরপর কাজের পরিকল্পনার নক্শা মনে মনে তৈরী করে সেমতো বাস্তবে রূপ দিতে হয়। সেজন্য কর্ম হলো মানব মনের অভিব্যক্তির ফল। তাই শিল্পী নিজেই হয় কর্মের স্রষ্টা। বিশ্বের সকল শ্রেণীগত রূপ স্রষ্টার অভিব্যক্তির প্রতিস্বাক্ষর। তাই ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতাকারী মানব মনের অভিব্যক্তির স্বাক্ষর হলো তার কর্মফল। এটি তার ইচ্ছা বা কর্মের বৈরী কিছু নয়, যা অন্য কোথাও মওজুদ থাকে। সেজন্য মানুষের কর্মফল শ্রেণীগত অভিব্যক্তির বৈষম্যের কারণে ভিন্ন রূপ ও গুণের হবে। মানুষে মানুষে যেমন প্রভেদ, মনে মনে যেমন অমিল, মূলত এসব শ্রেণীগত বৈষম্যের কারণেই আচার-আচরণের তারতম্যের প্রভাবে কর্মফলের সত্তার চরিত্র ও গুণাগুণ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

সৃষ্টির নিয়মে কর্ম চিরন্তন। এর ধ্বংস বা বিনাশ নেই। কর্মের প্রতিক্রিয়া কর্মের স্রষ্টা ভোগ করবে, এটিও প্রকৃতির বিধান। যেমন একজন লোক আজীবন মদ খেয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার লিভার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতে মদপানকারী নিজেই তার পরিণাম ফল বা কর্মফলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভোগ করবে।

কিন্তু আমাদের পৃথিবীর জীবন থেকে কর্মের যে অদৃশ্য সত্তা এই ঘন নীল আকাশ, পৃথিবীর চারপাশের বাতাসের অদৃশ্য সাগর আর ওজন স্তর ভেদ করে

www.nagorikpathagar.org

তিলে তিলে হারিয়ে যাচ্ছে অসীম রহস্যের অন্তরালে, তার পরিণাম ফল বা প্রতিক্রিয়া কী কোন দিন আমাদের ভোগ করতে হবে না? এই কর্মফল কেমন হবে? এর ঠিকানা কোথায়? আমাদের সাধ্যে আছে কি এর ঠিকানা খুঁজে পাওয়া? সেই রোমান্টিক জগৎ আমাদেরকে কতই না ভাবনায় বন্দি করে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যাকে টেনে রাখতে পারেনি, কোটি কোটি মানুষের দৃষ্টিকে যে সত্তা ফাঁকি দিয়ে চলে যায়, তার বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুনিয়ার জীবনে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেখানে আমাদের জানার ও দেখার সীমাবদ্ধতা আছে সেখানকার কথা প্রজ্ঞাবান সর্বজ্ঞ খোদা তা'য়ালা বান্দার উপকারার্থেই জানিয়ে দিয়েছেন ঐশী কিতাবের মাধ্যমে। এই কিতাবের বাণী জিবরাঈল (আ) নিয়ে এসেছেন নবী-রাসূলগণের (সা) কাছে। তাছাড়া আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সে জগৎ নিজের চোখে দেখে এসেছেন।

পক্ষান্তরে ঐশী কিতাব মহাপ্রজ্ঞাবান সর্বজ্ঞ খোদার বাণী বিধায় এতে কোন ভুল ভ্রান্তি নেই। অপরদিকে এই কিতাবের (আল-কুরআনের) বাণীর মর্মার্থ বুঝার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। এই কিতাব এমনি এক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর যার প্রতিটি আয়াতেই রয়েছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আলো। তাই জ্ঞানী ছাড়া তার নূর, তার আলো হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন ব্যাপার।

এতে রয়েছে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতির অফুরন্ত উপাদান। অগণিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই কিতাবে স্থান-কালের পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাথে পরকালীন জীবন ব্যবস্থার অনেক সাদৃশ্যমূলক বর্ণনা দেয়া আছে। আছে রূপক কথাবার্তা, রয়েছে জ্ঞানীর মনের জন্য চিন্তার অসীম অফুরন্ত খোরাক।

যে বস্তু আমাদের আশে পাশে নেই, যা কোন দিন মানুষ চোখে দেখেনি, যার স্বাদ, গন্ধ মানুষ কোন দিন পায়নি, যার সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান বা উপলব্ধি নেই তার রূপক ও সাদৃশ্যমূলক বর্ণনা মহান প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞারই পরিচয় বহন করে। তা না হলে সে আলোচনা হতো রসহীন, বোধহীন।

পাপ আর পুণ্য দুনিয়ায় থাকে না। তার রূপ, রঙ, কিছুই আমরা দেখতে পারি না। এগুলো হজম করে তার সুফল কিংবা কুফল ভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের রহস্য যার পক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার পক্ষে যেমন আগ্রার তাজমহল কিংবা ব্যবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের বর্ণনা দেওয়া কঠিন, তেমনি অন্যের বর্ণনা থেকে তার স্বাদ পাওয়াও দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এর যদি সাদৃশ্যমূলক বর্ণনা দেয়া হয় তাহলে এর পূর্ণ স্বাদ না পেলেও কিছুটা হলেও অনুমান করা সম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

তাই পরম দয়াবান আল্লাহ আল-কুরআনে পৃথিবীর সুদূর অন্তরালের জীবন ব্যবস্থা এবং তৎস্থানের বস্তুর রূপ, গুণ, নাম, পৃথিবীর লোকালয় পরিবেশের সাথে যে জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার গুণাগুণ দিয়ে সেখানকার আরাম, আয়েশ দুঃখ-কষ্ট, রূপ ও গঠনের বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা পরম স্রষ্টার প্রজ্ঞার স্বাক্ষর।

পরকালীন জীবনের কর্মফলের সত্তার জগতটি কেমন হবে তা তো এই ধরনের রূপক ও প্রজ্ঞাশীল ঐশী বাণীর তাৎপর্যের নিগূঢ় তথ্য অনুধাবন না করে বুঝাই কঠিন। আল-কুরআনের ভাষায় পাপের স্বরূপ ও স্বভাব আমাদেরকে 'কর্মফল' সম্পর্কে যে তথ্য দেবে তা তো আমাদেরকে নিয়ে যাবে বিশাল অনন্তের দিকে, বস্তুর (Matter) দ্বৈতরূপ প্রতিবস্তুর (Antimatter) জগতের সন্ধানে, অথবা Negative dimension-এর জগতের দিকে কিংবা প্রতিক্রিয়ার স্বপ্নের দেশে।

মন যদি চোখ বুঝে সেই স্বপ্নের দেশ ঘুরে আসতে পারত তাহলে সে দেখতে পেত দুনিয়ার এ বাড়ির অর্জিত ফসল ওপার বাড়ির গুদামে কিভাবে ঠাঁই নেয়। সেখানের পুণ্য সত্তার কর্মফলের বাগানে এই জমিনের মাটির মানুষের কাজের থাকবে ছাপ। তাই আমরা আমাদের কর্মফলের অধীনেই ফিরে যাব একদিন। সেই দেশ সোনালী স্বপ্নের দেশ। দুনিয়ার কর্মজীবন যেন রাতের স্বপ্নের দৃশ্যের মতো একদিন ফুরিয়ে যায়। ঘুম ভেঙ্গে গেলে অর্থাৎ দুনিয়ার স্বপ্ন-স্বাদের ইতি ঘটলেই যেন সব বাস্তবে ফিরে পাব। এখানে স্বপ্নের জিনিস বাস্তবে ফিরে না পেলেও দুনিয়ার ক্রিয়া বা কর্মের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফল সেখানে ফিরে পাব।

আসলেই এ দুনিয়া কর্মক্ষেত্র। অপরদিকে ওপার জগৎ প্রতিফলের স্বাদ ভোগ করার জায়গা। সেখানে পাপীর বাড়িতে কোন বাতি থাকবে না, আলো থাকবে না। তাদের গায়ের রঙ হবে আলকাতরার ন্যায় কুৎসিত কালো। নিজের গচ্ছিত কর্মফলের সত্তা থেকে তারা পাবে যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা কোন দিন শেষ হবে না। মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে চাইলেও মৃত্যু তাকে বরণ করবে না। অর্থাৎ মৃত্যুর বিধানেরই মৃত্যু ঘটবে।

মহান আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাময় বাণী উল্লিখিত দৃষ্টান্তের বাস্তব নমুনা। তাই নিম্নে আল-কুরআনের কিছু সংখ্যক তথ্যপূর্ণ বাণী তুলে ধরা হলো।

"(তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও) যেদিন যমীন আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ করে দেওয়া হবে। তারপর সকলেই মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাতে পায়ে শিকল পরা এবং আরামহীন অবস্থায় হাজির হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা পাপীদেরকে দেখবে আলকাতরার পোশাক পরিধান করে আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমণ্ডলের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটা এজন্য হবে যে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। আল্লাহর হিসাব নিতে বিলম্ব হয় না।" (সূরা-১৪ : ৪৮-৫১)

"প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে, তার বোঝা তারই ওপর ন্যস্ত; কেউ কারো বোঝা বহন করে না।" (সূরা-৬ : ১৬৪)

"সেদিন যাবতীয় কৃতকর্মের (আমলের) পরিমাপ এক ধ্রুবসত্য। যাদের আমলের পাল্লা ভারী হবে, কেবল তারাই কল্যাণ লাভ করবে, আর যাদের আমলের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী; কেননা তারা আমাদের আয়াতের প্রতি যুলুম করছিলো।" (আল-কুরআন)

"সেদিন প্রত্যেকেই তার কৃত নেকী এবং তার কৃত বদীকে উপস্থিত পাবে।" (আল-কুরআন)

'প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।" (আল-কুরআন)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত আমলের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না।" (সূরা-৩ : ২০)

"তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করেছ।" (সূরা-৪৬ : রুকূ-২)

"আমি তোমাদের আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব। তারা যে সকল অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল তা তাদের ঐসব কৃতকর্মের ফল।"

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করেছে তা নিজের জন্যই করেছে।" (সূরা-৪১ : রুকূ-৬)

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে।" (সূরা-৩ : ৩২)

"এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ঐসব লোক যারা দুনিয়ার জীবনে ছিল সুখি ও সচ্ছল। তাদের সুখি ও সচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে। সেসব পাপ কাজ তারা করতো জিদ ও হঠকারিতা করে। তারা বলতো, মৃত্যুর পর তো আমরা কঙ্কালে পরিণত হবো। মিশে যাবো মাটির সাথে। তারপর আবার কী করে আমরা জীবিত হবো? আমাদের বাপ-দাদাকেও কি এভাবে জীবিত করা হবে?"

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ বলেন– "হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্যে সময়কালও নির্ধারিত আছে।"

অতঃপর আল্লাহ বলেন, "হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীর দল! তোমরা জাহান্নামের 'যাক্কুম' বৃক্ষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। তার দ্বারাই তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তৃষ্ণার্ত উটের মতো তারা পেট ভরে পান করবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি।" (সূরা-৫৬ : ৪২-৫৫)

"যারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, তাদের সৎকাজগুলো হবে ভস্মস্তূপের ন্যায়। ঝড় ঝঞ্ঝার দিনে প্রচণ্ড বায়ুর বেগে সে ভস্মস্তূপ যেমন শূন্যে উড়ে যাবে; ঠিক সেই সৎকাজগুলোর কোন অংশেরই বিনিময় তারা লাভ করবে না। কারণ খোদার দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল।"

তাদেরকে বলো! আপন কৃতকর্মের দৃষ্টিতে কোন ধরনের লোক সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, আমরা কী তোমাদেরকে বলবো? এ হচ্ছে তারাই, যাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে অযথা নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা ভেবেছিলো আমরা খুব ভাল কাজ করছি। এসব লোকেরাই আপন প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং তাদেরকে যে তাঁর দরবারে হাযির হতে হবে, এ সত্যটুকু পর্যন্ত স্বীকার করেনি। এর ফলে তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমরা তাদের আমলের কোনই মূল্য দেব না এবং তারা দোযখে প্রবেশ করবে। তারা যে কুফরী করেছে এবং নিদর্শনাবলী ও আমার রাসূলগণকে উপহাস করেছে। এ হচ্ছে তারই প্রতিফল। (সূরা-৫ : রুকূ-১)

"তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে যেসব নেকী পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তা-ই পাবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সবই দেখেন।" (সূরা-২ : ১১০)

"তোমরা যেরূপ আমল করেছিলে আজ সেরূপেই তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা-৪৫ : ২৮)

"কর্মলিপি পেশ করা হলে তাতে যা কিছু লেখা থাকবে; তুমি দেখবে যে অপরাধী তাতে ভয় পেয়ে যাবে। বলবে : হায়! এ কিতাবের কী অবস্থা। ছোট কিংবা বড়ো কোন জিনিসই এতে বাদ দেয়া হয়নি। সবই এতে বর্তমান রয়েছে। বস্তুত তারা যা কিছু আমল করেছিলো তা সবই তারা উপস্থিত পাবে।" (সূরা-১৮ : ৪৯)

www.nagorikpathagar.org

"যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের আমল নিষ্ফল, তারা যা করে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে।" (সূরা-৪৬ : ৪৭)

"সেখানে অধিক শীতও থাকবে না অধিক গ্রীষ্মও থাকবে না।" (৭৬ : ১৩)

"কিয়ামতের দিন মানুষ তার সৎ কর্মের ফল প্রস্তুত দেখতে পাবে।" (আল-কুরআন)

"আমরা কিয়ামতের দিন নির্ভুল পরিমাপকারী তুলাদণ্ড রেখে দেব। কারো ওপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না, যদি একটি শর্ষে পরিমাণও আমল হয়, তবু আমরা তা উপস্থিত করবো, আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।" (সূরা-২১ : ৪৭)

"তোমরা যেরূপ আমল করেছিলে আজ সেরূপই তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা-৪৫ : ২৮)

"সেদিন তাদের স্বীয় জিহ্বা এবং তাদের হাত-পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।" (সূরা-২৪ : ২৪)

"সেদিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্য পৃথক পৃথকভাবে বেরুবে। অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও সৎকাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে, আর যে বিন্দু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে; তাও সে দেখতে পাবে।" (সূরা-৯৯ : ৬-৮)

"আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব, তারা যে সকল অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল, তা তাদের ঐসব কৃতকার্যের ফল।" (সূরা-৪১ : রুকূ-৬)

"কাফেরগণ আপনার (রাসূলে করীম) নিকট শাস্তির বিষয়ে তাড়াহুড়া করছে। অথচ শাস্তি তাদের চারদিকে ঘিরে রেখেছে।" (আল-কুরআন)

আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি যেমন সাবলীল তেমনি রহস্যময়। একে হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। যার হৃদয়ের আরশি স্বচ্ছ, তাদের বেলায় কুরআনের আয়াতের মর্মকথা বুঝা সহজ। স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষের কাছে এ দুনিয়া প্রকৃতপক্ষেই কর্মক্ষেত্র, চেষ্টা ও সাধনার জায়গা। তাই তারা অযথা কথা বলাকেও পাপ মনে করেন। তাদের বিশ্বাস, এ দুনিয়ার একটি কথাও পরকালের কর্মের হিসাব থেকে বাদ যাবে না। পাপ-পুণ্য কৃতকর্মের ফল। এই কর্মফলের গায়ে দুনিয়ার প্রতিটি ভালো-মন্দ আচার আচরণের প্রভাব পড়ে। ভালো-মন্দ আচরণের কর্মের অদৃশ্য সত্তার সাথে সুকৃতি ও দুষ্কৃতির গন্ধ লেগে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ার ভাল কর্মের সত্তার নাম নেকী এবং মন্দকর্মের (দুষ্কৃতির) সত্তার নাম গুনাহ। মানুষ তার আমলের সুকৃতি দিয়ে শান্তি পাবে এবং কর্মের দুষ্কৃতি দিয়ে শাস্তি পাবে। পাপ সত্তার রূপ আলকাতরার ন্যায় কালো এবং এর উত্তাপের স্বভাব আগুনের লেলিহান শিখার মতো। রূপক অর্থে কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি বা ভস্মস্তূপ এর ন্যায়।

পক্ষান্তরে নেক হলো উত্তম মানের সত্তা। যার সুকৃতি আছে। এর রূপ উজ্জ্বল এবং স্বভাব এমন আরামদায়ক, না শীত না গরম। গভীর দৃষ্টিতে মানব জীবনের আমলের (পাপ-পুণ্যের) সত্তার সাথে বিকীর্ণ সত্তার রূপ ও গুণের অনেকাংশে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

দুনিয়ার বিচার ব্যবস্থায় কষ্টের সীমা অতিক্রম করলে মানুষ জীবিত থাকে না। কিন্তু পরজীবনের আইন হবে ভিন্ন। সেখানে কর্মের সত্তার সাজানো গুছানো সংসারে মানুষ কঠিনতম যন্ত্রণা ভোগ করলেও জীবন বায়ু বের হবে না। অসীম যন্ত্রণার মাঝেও তারা জীবিত থাকবে। অন্যদিকে জান্নাতিগণ সাথীদের নিয়ে পরম সুখে দিন কাটাবে। সেই জগৎ পৃথিবীর কর্মের অদৃশ্য সত্তার সাজানো সংসার। সেই সত্তার রূপ-রঙ-স্বভাব সম্পর্কে দুনিয়ায় অজ্ঞতাই আমাদেরকে করে তুলে লাগামহীন ও সীমালঙ্ঘনকারী। কিন্তু প্রকৃতির বিধান ভেঙ্গে যদি এ দুনিয়া থেকে সেই কর্মফলের জগতে একদিনের জন্যও অতিথি হিসেবে বসবাস করে এখানে আবার ফিরে আসা যেত, তাহলে এরূপ লাগামহীন হওয়ার প্রশ্নই আসতো না। এ যাবৎ যাদের পক্ষে সে জগৎ ঘুরে ফিরে দেখে আসা সম্ভব হয়েছে আসলেই তারা কোন দিন সীমালঙ্ঘন করেননি।

আমাদের প্রিয় নবীজির পক্ষে সে জগৎ দেখে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। মে'রাজ রজনীতে তিনি সশরীরেই স্বচক্ষে সকল কিছু দেখে এসেছেন। তিনি ছিলেন মহান আদর্শবান, উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন মানব জাতির মুক্তির দূত, পরম হিতৈষী। তিনি ছিলেন আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের পক্ষে যে জিনিস দেখা সম্ভব হয়নি, তিনি তা আমাদের হয়েই সব দেখে এসেছেন। আমাদের মুক্তির জন্য তিনি নিজের ভাষায় দেখে আসা সকল ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে মানব জাতির 'রাহবার'। আমাদের তাঁর কথা শুনে সেই পরম সুখের সন্ধানে পথ চলা অবশ্য কর্তব্য। যিনি বাল্যকাল থেকে আল-আমীন নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর বেলায়ই উত্তম 'রাহবার' হওয়া সাজে।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুত এতেই মানব জাতির কল্যাণ অবধারিত। কারণ তিনি তো ছিলেন পাপ মুক্ত। আমাদের কর্মের অদৃশ্য সত্তার জগতের রূপ কেমন, সে বিষয়টি মানুষ হিসেবে নবীজির মুখের কথা আমাদের বুঝতে সহজ হতে পারে। আমরা আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় নবীজির কথাগুলো পরম ধ্যানে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে পাপ-পুণ্যের আসল কারখানা নিজের মাঝেই খুঁজে পাব বলে আশা করা যায়। বস্তুসত্তার বন্ধন থেকে আমাদের আমলের যে সত্তা ইন্দ্রিয় চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে বেড়ায়, সেই গুপ্ত ও সূক্ষ্ম সত্তার কারখানা খুঁজে পেলে নেক আমল করার আরও বিশ্বাস ও প্রত্যয় জাগবে, এটিই স্বভাবের প্রকৃতিগত নিয়ম।

বিশ্বনবীর দৃষ্টিতে কর্মফল

নবী মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির উত্তম রাহবার। তিনি ওপার জগতের সুখ-দুঃখ, রূপ-শোভা সবই আমাদের হয়ে দেখে এসেছেন। বরের আগে রাহবার যেমন কনেকে দেখে, জানে, তেমনি তিনিও সে বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত। সে তুলনায় আমরা হলাম পরপারের জগতের জন্য বরের মতো। তাই পরকালীন জীবন মানব জাতির নিকট নব-কুমারী কনের বাসর ঘরের ন্যায়। সেই চির অম্লান পরমাসুন্দরীর গায়ের রঙ, রূপ, শোভা, গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি কেমন তা কোন বরের পক্ষে (রাসূল সা. ব্যতীত) দেখে আসা সম্ভব হয়নি।

পক্ষান্তরে এপার দুনিয়া বসন্তের ভরা যৌবনের মতো আমাদেরকে আকৃষ্ট করে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কারণ দুনিয়ার জীবনেও স্বাদ আছে, গন্ধ আছে, আছে ভালোবাসার মতো কৃত্রিম বধূ। আমাদের আত্মার প্রবৃত্তির শিকড় কোন কোন সময় এই কৃত্রিম বধূকে (পৃথিবী) এমনভাবে ভালোবাসে যার ফলে এর স্বাদ আর গন্ধে আমরা আত্মভোলা হয়ে যাই। এতে করে পথভোলা নাবিকের মতো একদিন সেই চিরকুমারী কনের কথা ভুলে গিয়ে তার অলঙ্কার, তার সাজ-সজ্জার কথাও যাই ভুলে। এতে সেই কনের দেহ অন্তসার শূন্য হয়ে আবরণমুক্ত পড়ে থাকে।

কিন্তু যেদিন কৃত্রিম বধূর সাথে সম্পর্কের বার্ধক্য অবস্থা দেখা দিবে তখন আর এখানে থাকা যায় না। একদিন চলেই যেতে হয় আসল বধূর কাছে। এমন অবস্থায় সেই কুমারী বধূর কাছে ফিরে গিয়ে দেখা যাবে তার হাত, পা, নাক, কান অলঙ্কারহীন, সারা দেহ জুড়ে নেই কোন বস্ত্র, বাসর রাতের শোভা বর্ধনকারী নয়ন জুড়ানো বাতিগুলো আছে আলোহীন, মনোরম সাজ-সজ্জার নেই কোন তোরণ। আছে অন্ধকার; নিশি দ্বীপের মতো অলঙ্কারহীন এক আজব বধূ। গায়ে তার আলকাতরা বর্ণের পোশাক। অসংখ্য ভাইরাস আর রোগ জীবাণু

www.nagorikpathagar.org

করছে তর্জন-গর্জন। আছে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার মতো ধ্বংসাত্মক জ্বালাময় অগ্নি শিখার উদর জুড়ে কান্নার দাউ দাউ রব। ফণা তুলে বসে আছে নিজ দেহের কোষস্থ পরমাণুর গর্ভের অসংখ্য বিকলাঙ্গ সন্তানের দল। আলোর অভাবে বাড়িময় অন্ধকারের আযাব। খাদ্যের অভাবে ছটফট করছে তার বিকলাঙ্গ সন্তানেরা। পানির অভাবে মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে তার বাড়ির আঙ্গিনা। সারাটা আকাশ ছেয়ে আছে কালো ধোঁয়ায়। আগুনের লেলিহান শিখা বাউকুড়ানির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। কোথাও শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার মতো নেই একটুখানি শীতল বায়ু। অসহ্য গরমের মাঝে এতটুকুন ঠাঁই নেয়ার মতো নেই কোন শীতল ছায়া। কোথাও কোন ঠাণ্ডার লেশ নেই, আছে শুধু মরুভূমি সদৃশ মরীচিকা।

পক্ষান্তরে যে দুনিয়ার জীবনকে মুসাফিরখানা ভেবে এখানে এই কৃত্রিম বধূর (পৃথিবীকে) রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধ, যতটুকু ভোগ করার বৈধ অধিকার আছে ততটুকু ভোগ করে এ জীবনের বার্ধক্যের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ক্ষণিকেই তার মায়া, মমতা, ভালোবাসার জাল ছিন্ন করে আপন ঠিকানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে দেয়, তবে সে সেখানে গিয়ে দেখবে তার বাসর ঘর রঙ বেরংয়ের সোডিয়াম লাইট দিয়ে আছে সাজানো। মণিমুক্তা আর স্বর্ণ ও ইয়াকুতের বালাখানাগুলো রয়েছে অপূর্ব শোভায় সাজানো। নিজ দেহের কোষস্থ পরমাণুর সন্তানেরা আছে তার প্রতীক্ষায়। তাদের গায়ের সুকৃতিতে রয়েছে অপরূপ আনন্দ আর ভালোবাসা জাগানোর মতো পারফিউমের গন্ধ। এতে নেই কোন অন্ধকার, ক্ষুধার জ্বালা, মৃত্যু, জরা কিংবা রোগ-বালাইর কোন উপাদান। আছে সূর্যহীন সর্বদাই প্রজ্জ্বলিত ঝকঝকে আলোর অপূর্ব কিরণ। আছে উত্তম রূপ-রসের প্রয়োজনীয় সুস্বাদু খাবার। আছে রকমারি সুগন্ধি পানীয়। সেখানে গরম অনুভব করার মতো নেই কোন উপাদান। নেই কোন ঠাণ্ডা লাগার দানা। আছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অপূর্ব আরাম আর আরামদায়ক ব্যবস্থা। আছে লজ্জায় অবনত পরমাসুন্দরী হুর। তাদের রয়েছে সুরক্ষিত মণি মাণিক্যের মতো অপরূপ সৌন্দর্যময় দেহ। আছে সেবার জন্য অগণিত দাসদাসী।

লক্ষণীয়, দু'ধরনের মানসিক ভিন্নতার জন্য কতই না ভিন্ন পরিবেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে। কিন্তু মাথা উঁচু করে দিয়ে সে দৃশ্য এখন দেখতে না পরলেও এর সত্তা, এর প্রকৃত উপাদান আমরা তিলে তিলে পৃথিবীর কৃত্রিম বধূর সাথে ঘর সংসার করেই পাচার করে যাচ্ছি। এগুলো আমাদের নিজ দেহের পরমাণুর গর্ভের বিকীর্ণ সন্তান এবং দিল ও আত্মার অভিব্যক্তির ফসল। বিশ্ব প্রভুর প্রজ্ঞাময়

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতির কৌশলেই সেগুলো জন্ম নেয়। এই সত্তাগুলো দিয়ে আমাদের বাসর বাড়িগুলো সুকৃতির নতুন অঙ্কুরের সমাহারে পল্লবিত হয়ে মনোরম সাজে ফুটে ওঠে। অথবা দুষ্কৃতিতে দুঃখের সাগর সৃষ্টি হয়ে তর্জন গর্জন শুরু করতে থাকে।

হযরত আদম (আ)-এর মনের অভিব্যক্তির প্রেরণার ফসল থেকে খোদার নির্দেশে যেমন তার দেহের সত্তা দিয়ে স্ত্রীজাত (বিবি হাওয়া) সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি এই দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থায় সেই দুই যুগল সৃষ্টির পরিপূর্ণ সংসারে নিজেদের অভিব্যক্তির প্রেরণার ফসল থেকে আবার খোদার ইচ্ছায় তাদের দেহের সত্তা দিয়ে নতুন এক কর্মফলের জগৎ সৃষ্টি হবে। সেটিই পরজগৎ। সেই বিচারে একে Negative dimension-এর জগৎও বলা যায়। তাই আমি পরকালীন জীবনকে নব-যৌবনা চিরকুমারী কনের সাথে তুলনা করেছি। এই পৃথিবীর বাসিন্দারাই হবে সেখানকার বর। বর যেমন কনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আগে নিজে তৈরী হয়ে কনের সাজগোজের জিনিসপত্র নিজের কায়িক উপার্জন দিয়ে কিনে নিয়ে কনের বাড়িতে যায়, তেমনি পৃথিবীর বরগণের জন্যও নব-যৌবনা চিরকুমারী কনের বসত বাড়িতে যাওয়ার আগেই নিজের আমলের সুকৃতির প্রভাব দিয়ে ভালো অলঙ্কারাদির উপাদান পাঠিয়ে দিতে হয়। মানব জাতির আমলের সত্তার তৈরী জগতের নাম কর্মফলের জগৎ।

এই পৃথিবীর আলো, বাতাস ছেড়ে যেহেতু একদিনের জন্যও সেই কনের রূপ-যৌবন দেখে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই অনেকের বিশ্বাসের শিকড় নড়তে থাকে। দুনিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় আমরা 'রাহবারে'র কথা বিশ্বাস করে কনের দুলা হয়ে তার সাজগোজের জিনিস পত্র নিয়ে যদি যেতে পারি তাহলে ওপার দেশের নব-যৌবনা কুমারী কনেকে কেন বরণ করার জন্য রাহবারের কথা অনুসরণ করতে পারব না। প্রিয় নবীজি সকল মানুষের পক্ষে থেকে রাহবার হয়ে সবকিছু সশরীরে দেখে এসেছেন। মানব জাতির পরম কল্যাণের জন্য তিনি পাপ-পুণ্যের যে তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

"পাপ ও পুণ্য দু'টো সৃষ্ট বস্তু"। এগুলো শেষ বিচারের দিন লোকের সামনে দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর পুণ্য পুণ্যবানদের সুসংবাদ দেবে এবং পাপ পাপীদের ভর্ৎসনা করবে– দূরে হট, দূরে হট। কিন্তু তারা তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। (আল-হাদীস/ইসলামী দর্শন : ৩৫২)

"তা আর কিছুই নয় তোমাদের কৃতকার্যসমূহই ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।"

"পৃথিবীতে যে যা কিছু করবে তার অধিক তাকে দেয়া হবে না।"

www.nagorikpathagar.org

"যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে শরীরের রক্ত গোশত বানাবে তার ঐ রক্ত গোশত দোযখের ইন্ধন হবে।"

"তোমাদের কৃতকার্য তোমাদের সামনেই হাজির করা হবে।" (আল-হাদীস)

মহানবীর ইন্দ্রিয় দূরবীণের কাছে আমাদের দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থার কর্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতিই হলো পরকালের সম্পদ। সেদিন এই নেকী ও গুনাহ ব্যতীত মানুষের কাছে আর কিছুই থাকবে না। সেজন্য দুনিয়াতে যদি কেউ কারও প্রতি অন্যায় করে থাকে, তাহলে মজলুমের দাবী তার নেকী দিয়েই পূরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে বোখারী শরীফে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যা হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইয়ের (মানব সন্তানের) প্রতি কোন প্রকার অন্যায় অবিচার করে, তাহলে তার উচিত এখানেই (দুনিয়াতেই) তা মিটিয়ে ফেলা। কারণ আখেরাতে কারো কাছে কোন কপর্দকই থাকবে না। অতএব সেখানে তার নেকীর কিয়দাংশ ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে। অথবা তার কাছে যথেষ্ট নেকী না থাকলে, মজলুমের গুনাহের কিয়দাংশই তাকে দেয়া হবে।

মূলত পাপ-পুণ্যের যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে এরূপ বিনিময় কি করে সম্ভব। তাছাড়া পাপ-পুণ্য তো আর পরপারের জীবনে উৎপাদনের কোন কিছু নয়। এরূপ ব্যবস্থা তো সেখানে থাকবেই না। জীবন ঘনিষ্ঠ সকল আচার আচরণ কথাবার্তা সবই আমাদের কর্ম। আমাদের মনের অভিব্যক্তি বা নিয়ত সকল কর্মের চাবিকাঠি। চাবি ব্যতীত তালা যেমন খোলা যায় না তেমনি মনের অভিব্যক্তির সংকেত ছাড়া দেহ কাজ করে না। এই চাবি বৈধ-অবৈধ উভয় পথেই ব্যবহার করা যায়। চাবি দিয়ে তালা বন্ধ করে যেমন নিজের মালামাল নিরাপদে রাখা যায় তেমনি বিকল্প চাবি ব্যবহার করে অন্যের সম্পদ লুটও করা যায়।

দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থার বৈধ পথ কোনটি তা ঐশী কিতাবে উল্লেখ আছে। ভালোমন্দ উভয় পথেই কর্মের নিগূঢ় সত্তা নিঃসৃত হয়। এই নিগূঢ় সত্তা খোদার অতিপ্রাকৃতিক প্রযুক্তির অসীম ডিস্ক এন্টিনায় ধরা পড়ে অথবা নাও পড়তে পারে। ধরা পড়া মানে কবুল হওয়া। কবুল না হলে সেগুলো ঝুলে থাকে। কি বিচিত্র সেই ব্যবস্থা, যেগুলো ধরা পড়ে না সেটির জন্য রয়েছে খোদার অসীম প্রজ্ঞার লীলা খেলা। এর জন্যও রয়েছে ভিন্ন ধরনের গ্রাহক-যন্ত্র।

পক্ষান্তরে আমাদের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা তরঙ্গের মতো ডানা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে, কিংবা আকাশ তারের সূক্ষ্ম পথ ধরে তা বেয়ে চলে অনন্তের ওপার

www.nagorikpathagar.org

দেশের গ্রাহক যন্ত্রের দিকে। সেই গ্রাহক যন্ত্রের প্রযুক্তিতে এই নতুন সত্তা দিয়ে নতুন অঙ্কুরের সমাহারে পল্লবিত হয়ে ভরে ওঠে ব্যক্তির কর্মের প্রতিফলের জগৎ। এই সত্তা তড়িৎ চুম্বক শক্তির ন্যায়, সাগরের জল তরঙ্গের মতো সীমাহীন বোম সাগরে ঢেউ খেলে ক্ষণিকেই চলে যায় তার নিজ ঠিকানায়। অপরদিকে আলোক রশ্মি আমাদের কর্মের প্রতিবিম্বগুলোকে গায়ে মেখে আঁধারের প্রাচীর ভেদ করে ছুটে চলে অসীমের দিকে। এই প্রতিবিম্বগুলো ক্রমে ক্রমে ছবির নেগেটিভের মতো সেলাই হয়ে কর্মলিপি তৈরী হয়। সেটিই আমলনামার খাতা। এটি আমাদের সারা জীবনের কর্মের গাঁথা আলোকবর্তিকা। এই খাতায় কোন চুলচেরা ভুল থাকে না। সেখানে জীবনের রঙ্গিন দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকবে। খুনীর অপকর্ম কিংবা ধর্ষণের চিত্র কোনটিও বাদ পড়বে না। কেউ যদি পরকালে দুনিয়ার কর্মের কথা অস্বীকার করে তখন ঐ কর্মলিপিই তার সামনে প্রকাশ করা হবে। তখন সে নিজের কর্মের হুবহু চিত্র দেখে লজ্জায় হেট হয়ে যাবে। পরিণামে বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসবে তার।

পৃথিবীতে নবী, রাসূলগণ (সা) স্রষ্টার মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নমুনা বা ফর্মূলা নিয়ে এসেছিলেন। তাদের দেয়া ফর্মূলা বা নমুনায় জীবন যাপন করার মাঝে উত্তম কর্মফল তৈরীর অন্তরনিহিত রহস্য বিরাজমান। আমরা ওপার জীবনে নিজেদের কৃতকার্যসমূহে ফিরে যাবো এতে কোন সন্দেহ নেই। একদিন তার প্রতিক্রিয়ার স্বাদ-গন্ধ ভোগ করতেই হবে। তাই জীবন নামের পাখিটি মহানিদ্রায় যাওয়ার আগে এখনি তন্দ্রা ভেঙ্গে নিজ স্বার্থেই জেগে ওঠা প্রয়োজন। যাঁরা চেষ্টায়, সাধনায় তন্দ্রা ভেঙ্গে জেগে উঠেছিলেন তাঁরাও অতি প্রাকৃতিক বিধানের রহস্যের কথা স্বীকার করেছেন। তারা আমাদের কর্মের সত্তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই মুসলিম মনীষীগণ নবী প্রদত্ত ফর্মূলায় জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন। তাই তাদের দর্শনের মূল্য আছে। সে কারণে সেসব মনীষী কর্মের সত্তা সম্পর্কে যে তত্ত্ব তুলে ধরেছেন তা থেকে জ্ঞানের বীজ নিয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারলে জীবনের সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছা সহজ হবে।

মুসলিম দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য

পরম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা সকল যুগেই কিছু ব্যক্তিকে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত মহামানব। এঁরাই আমাদের নবী রাসূল। তাঁরা সহজ সরল পথের দিশারী। এসব নবী, রাসূলগণের প্রর্দশিত পথে যাঁরা জীবন যাপন করে মহৎ চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন, তাঁরাও আল্লাহর নিকট সম্মানের পাত্র, গুণী ব্যক্তি। তাঁরা ওহীর জ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

লাভ করতে না পারলেও খোদার অপার মহিমায় আত্মিক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। তাঁদের মনের প্রশস্ততায় এক সময় অন্ধকার হৃদয় থেকে পালিয়ে যায়। তখন তাঁরা এলহাম বা ধ্যানে বিশ্ব-জগতের অনেক রহস্যের সন্ধান পেতেন। তাঁরা বলতে পারতেন অতি প্রাকৃতিক নিয়মের নিগূঢ় রহস্য। এতে করে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের সম্মোহনী শক্তির প্রকাশ ঘটে। তাঁদের এই অলৌকিক সম্মোহনী শক্তিকে বলা হয় কেরামতি। আর নবী রাসূলগণের বেলায় বলা হয় মোজেযা। সাধারণ মানুষের নিকট এসব মোজেযা বা কেরামতি অলৌকিক মনে হলেও সেগুলোর লৌকিকতাপূর্ণ কার্যকারণ নীতির বাইরে ঘটেনি। এই লৌকিকতা সাধারণ লোকের চোখে ধরা পড়ে না। বস্তুত আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টির অসারতার জন্য আমরা যে জিনিসের ব্যাখ্যা করতে পারি না, সেটিকেই অলৌকিক মনে করি। বিশ্বজগতের প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে অতি প্রাকৃতিক যে বিধান (নিয়ম) চালু আছে সেই স্তরটি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু অলি-দরবেশগণের চোখে তা ধরা পড়ে। তাই তাঁরা দুনিয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে যতটুকু না ভাবেন তার চেয়ে বেশি ভাবেন অতি প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে। সেজন্য তাদের কথায়, কাজে, আচার-আচরণে পরকালীন জীবন ব্যবস্থার মূল্য বেশি থাকে। তাঁদের কথা বিজ্ঞানের গণ্ডির কাছাকাছি না হলেও গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞানের অতি প্রাকৃতিক নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। যেমন অনেক ক্ষেত্রে পাগলা হাতিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা না গেলেও তাঁদের দৃষ্টির সম্মোহনী শক্তির নজরেই তা বশ মানতে বাধ্য হয়।

কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা দিয়ে হয়ত তাকে বশ মানানো যায় না। আত্মিক শক্তিও (Power) এক প্রকার শক্তি। এই শক্তির কাজ অতি প্রাকৃতিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। যেমন মুরগী ২১ দিন তাপ দিলে ডিম ফোটে। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু অতি প্রাকৃতিক নিয়মের বেলায় এর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। অনেক অলী-দরবেশগণের জীবনীতে এরূপ বাধ্য বাধকতাহীন অনেক অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস জানা যায়। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়ম শিথিল হয়ে পড়ে। এঁদের আত্মিক চোখে, সৃষ্টি জগতের অতি প্রাকৃতিক নিয়মের রহস্য প্রাকৃতিক বিধানের মতো ধরা পড়ে। ফলে মানব জাতির আত্মা বা দিল ও দেহের বিকীর্ণ সত্তার রূপ, গুণ, স্বভাব তাঁরা আঁচ করতে পারেন। কারণ তাঁদের অন্তরদৃষ্টি তখন প্রাকৃতিক নিয়মের সীমানার মধ্যে বসবাস করে না। তাঁরা তখন অতি প্রাকৃতিক নিয়মের দৃশ্য বৃষ্টির মতো উপলব্ধি করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

এসব মহামানবের কথাবার্তা বিজ্ঞানের সূত্রের ধার ধারে না। তবু তাদের কথাগুলো তত্ত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে তাঁদের সেসব জ্ঞানগর্ভ বর্ণনার সারমর্ম থেকে তাত্ত্বিক জ্ঞান নিয়ে যেন দিনে দিনে সেই অতি প্রাকৃতিক নিয়মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। মনে হয় যেন বিজ্ঞানের সাথে এখন আর অতি প্রাকৃতিক নিয়মের কোন হানাহানি নেই। দিনে দিনে সব যেন এক হয়ে আসছে।

যখন বিজ্ঞানের প্রভাত ফেরী শুরু হয়েছিল তখন বিজ্ঞানীগণ মনে করতেন বস্তুর আদি মৌল ও তার গতি চিরন্তন। তাই তারা সে সময়ে বস্তুকেই বিশ্বের 'আদি সত্তা' মনে করতো। এরপর যখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার হলো তখন বস্তুকে আর স্থান-কালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা গেল না। বস্তু এখন রূপ নিল কাল্পনিক ছায়ায়। তারপর বিকীর্ণ শক্তির বেলায়ও একই কথা আসল। কিন্তু এই বিকীর্ণ শক্তি যত মিহি বা সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতোই হউক না কেন তার মাঝেই তার গুণাগুণ ও রূপ বিদ্যমান থাকে। আমাদের বিকীর্ণ কর্মশক্তি কৃষ্ণবর্ণের অথবা আলোক উজ্জ্বল বর্ণের যাই হউক না কেন এদের কোন সংমিশ্রণ হয় না বা কোন কালেও সেগুলোর গুণের পরিবর্তন হয় না। আমাদের আত্মা ও দেহের মাঝে প্রতি মুহূর্তে যে পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তনের কোন ছোঁয়া আমরা লক্ষ্য করতে পারি না। আবার ভৌতিক কোন কারণে যদি সেই পরিবর্তন সবকিছুকে ওলট পালট করে দেয় তখন ঐ ঘটনাটি আমাদের মনে থাকে কিংবা দৃষ্টিতে পড়ে। এর কারণ হলো সে সময়ের ঘটনাটি আমাদের মনে আঁচড় কাটার মতো উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকে।

জীবন খাতার প্রতিটি লাইনে লাইনে অহরহ যে অদৃশ্য পরিবর্তন হয় বা ঘটনার দৃশ্যপট আঁকা হয় তা কি কোন দিন শেষ হয়ে যায়? একটি লোককে কেউ যদি হত্যা করে ফেলে, এতে তার দুনিয়ার জীবন থেকে সে ঘটনাটি অদৃশ্য হয়ে গেলেও মৃত্যুক্ষণের ঘটনাটি কি কখনো প্রকৃতি থেকে বিলীন হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ আমরা দুনিয়াতেই যদি মৃত্যুর দৃশ্যটি ফটো করে রাখি, তাহলে এটি ইচ্ছা থাকলে আজীবন আমরা ধরে রাখতে পারব। কোন দৃশ্যের আলোক প্রতিবিম্বের যে ছবি আমরা ধরে রাখি এতো শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায় না, সেগুলো প্রকৃতির বাতাসের গায়ে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেলেও আজীবন অটুট থাকে।

আমাদের জীবন-চাকা অবিরত ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের সময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের দৃশ্য ও প্রতিচ্ছবি আমাদের স্মৃতিপটে বিরাজ করে না। যে সকল ঘটনা চরম সুখ ও চরম দু:খ দেয় সেগুলোই শুধু মনে থাকে। একটি শিশুর বয়স বৃদ্ধির

www.nagorikpathagar.org

সাথে সাথে তার আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আজকে যে শিশু, ৬০ বৎসর পর সে-ই আবার বৃদ্ধ।

সময় স্রোতের উর্ধ্বগতির ফলে দেহে যে পরিবর্তন আসে, এই পরিবর্তন ধরে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি সেই পরিবর্তনশীল কাঠামোকে জীবন্ত অবস্থায় আলাদা আলাদা করে ধরে রাখা সম্ভব হতো, তবে একটি মানুষ ৬০ বৎসরে বহু রূপে দেখা দিতে পারত। কিংবা একটি মানুষের সারা জীবনের কর্মগুলোকে যদি পর্যায়ক্রমে মালা বানিয়ে গেঁথে রাখা যেত তবে কত বিচিত্র দৃশ্যই না দেখা যেত। অথচ আমাদের দৃষ্টি কোন কিছুকেই স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে পারে না। কালের স্রোতের সাথে সেগুলোও অদৃশ্য হয়ে যায় শূন্যে।

এসব পরিবর্তনগুলো বিরাজ করে অতি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে। সেখান থেকে বিকীর্ণ কর্মশক্তির একটি কণাও হারিয়ে যায় না, বিনাশ হয় না। সাগরের জলরাশি থেকে যেরূপে তার সত্তা বাষ্প হয়ে মেঘ মুল্লুকে ঘুরে বেড়ায় তেমনি আমাদের দেহের অদৃশ্য বিকীর্ণ কর্মশক্তি, যা কোষ প্রাচীরের সূক্ষ্ম ফাঁক ভেদ করে শূন্যে বের হয়ে পড়ে, সেগুলোও ঘুরে বেড়ায় স্রষ্টার অতি প্রাকৃতিক 'বোম' সাগরে। এতে মানব দেহের কর্মের আঁচড় লেগে থাকে। এই সত্তা বিনাশ না হলেও আমাদের দৃষ্টি তার কাছে অসহায়। আমরা এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ আকাশ ছোঁয়া প্রাচীরের ওপরে উঠে উঁকি মেরেও তার খোঁজ খবর নিতে পারি না কিংবা রকেট যাত্রায় বের হলেও তার সন্ধান পাব না। কোথায় সেই অদৃশ্য সত্তার জগৎ, কেউ কি তার ঠিকানা বলতে পারবে?

নিশ্চয়ই যাঁদের অন্তর দৃষ্টিতে অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলী প্রাকৃতিক নিয়মের মতো ধরা পড়ে তাঁরা তার কথা বলতে পারেন। পৃথিবীতে অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিগণ মানুষের কর্মের অদৃশ্য সত্তার কথা তুলে ধরেছেন। সেই স্বনামধন্য মনীষীগণের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী (রহ) একজন অনন্য প্রতিভার লোক। তাঁর ভাষায়, মানব জীবনের ভালো মন্দের সত্তা হলো আলো-আঁধারের মতো। তিনি বলেছেন– "যে সমস্ত কার্য হতে অসৎ বা মন্দ স্বভাবের উৎপত্তি হয়ে থাকে তাদেরকে পাপকার্য বলে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কার্য হতে মহৎ গুণাবলী বা সৎ স্বভাবের উৎপত্তি হয় তাদেরকে পুণ্য কর্ম বলে।"

মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ বা গতিবিধি পাপ ও পুণ্য এই দুই অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন তৃতীয় অবস্থায় থাকতে পারে না। মানুষের দিল বা আত্মা স্বচ্ছ আর্শির ন্যায় উজ্জ্বল আর মন্দ স্বভাব বা পাপকার্যগুলো ধুম্র ও অন্ধকারের ন্যায় মলিন। এটি ক্রমশ আত্মার ভেতর প্রবেশ করে তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর মানুষের মন্দ স্বভাব ও পাপ কার্য স্বচ্ছ আত্মার সামনে একখানি কালো বর্ণের পর্দা ঝুলিয়ে দেয় এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার পরমোন্নত দরবার দর্শন হতে বঞ্চিত করে। সেই পরমোন্নত স্থান তার নিকট আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে সদগুণ ও মহৎ স্বভাবগুলো আলোকতুল্য। সেটি আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সমস্ত মলিনতা ও পাপ বিদূরিত করে আত্মার সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা বাড়িয়ে দেয়। এ জন্যই নবী করিম (সা) বলেছেন : "প্রত্যেকটি পাপ কার্যের পশ্চাতে এক একটি সৎ কার্য করবে। ফলে সৎ কার্যটি মন্দ কার্যটিকে বিলোপ করে দিবে। 'কিয়ামত দিবসে মানবাত্মাই উজ্জ্বল সৌন্দর্য বিশিষ্ট বা অন্ধকারাবৃত মলিন হয়ে বিচার ক্ষেত্রে উত্থিত হবে।" (কিমিয়ায়ে সা'আদাত : ৪৮)

ইমাম বুখারী (রহ) মানুষের সকল কর্মকে মাখলুক বলেছেন এবং ভাষার উচ্চারণ ও কর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলরামী কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে– "হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, তোমরা যে 'খায়ের' ব্যয় করেছ তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে।" (আল-কুরআন)

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জ্ঞানের পরিধি খুব খাটো। সেজন্য আমরা উপরোল্লিখিত মনীষীগণের মতো সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি না। তাদের অন্তর দৃষ্টি নক্ষত্রের আলোর মতো স্বচ্ছ। তাই গুনাহ বা নেককণা এঁদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

মন্দ যে করে সেসব সময়ই ভালোজনকে ফাঁকি দেয়। আলো আঁধার মিলে দুনিয়া, আর ভালো-মন্দ মিলে এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর কর্মশক্তি আলো আঁধারের মতো। সমুদ্রের কল্-কল্ ধ্বনিকে যেমন পানির দরিয়া গিলে ফেলে তেমনি এই দিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন আকাশ নামের 'বোম' সাগর মানুষের কর্মশক্তিগুলোকে গিলে ফেলে? এর পেট ছিঁড়ে সেগুলোকে কোন দিন বের করা যায় না। সবই যেন লোকালয়ের দৃষ্টির অন্তরালে নিমিষেই হারিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তার খবর রাখে না।

এই সত্তাগুলো অপ্রাকৃতিক বস্তু। ওরা অসাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। তাঁদের অন্তর চোখের কর্ণিয়ার পর্দায় স্বচ্ছভাবে সবই ধরা দিয়েছিল। এসবই তাদের অধ্যবসায়, সাধনা ও চেষ্টার ফল। মানুষের জন্মগত 'প্রকৃতি' তার চেষ্টার হাতিয়ার। প্রকৃতিগতভাবে জীবজন্তু জন্মের সময় তার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গেই থাকে। ঠাণ্ডা কিংবা গরম তাদেরকে পরাভূত করতে পারে না। খাদ্যের জন্য ভাবতে হয় না, বসবাসের জন্য চিন্তা করার দরকার হয় না। প্রকৃতির বিস্তর মাঠ, বন-জঙ্গল, পানির-দরিয়া আবাদী-অনাবাদী ভূ-মণ্ডল সবই তাদের বিচরণ ক্ষেত্র, খাদ্যের সীমানা।

কিন্তু মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই জন্মগ্রহণ করে অসহায় অবস্থায়। জন্মের পরই তাদের প্রয়োজন হয় পোশাকের। প্রকৃতির পোশাক তাদের শীত নিবারণ করতে পারে না। শরম ঢাকার জন্য তাদের থাকে না কোন প্রকৃতিগত ব্যবস্থা। তাই লজ্জাস্থান হেফাজতের জন্য দরকার হয় পোশাকের। দরকার হয় খাদ্য তৈরীর জন্য রন্ধনশালার। থাকার জন্য প্রয়োজন হয় নিরাপদ বসতবাড়ির। এ সবের আয়োজন করতে গিয়ে মানুষের করতে হয় চেষ্টা-সাধনা। এই সাধনার ফলে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ভাঁজগুলো চিন্তা বায়ুর দ্বারা আলোড়িত হয়, প্রসারিত হয়। যেসব মানুষ জ্ঞান পিপাসু হয়ে জেগে ওঠে, তাদের তখন ঘুম-তন্দ্রা হয়ে যায় হারাম। তারপর সাফল্য আসে। ক্রমে ক্রমে এই সাফল্যের দানাগুলো জমে জমে প্রকৃতি এক সময় কৃত্রিম শোভায় ভরে ওঠে। ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, কল-কারখানা, খাট-পালং, আসবাবপত্র, চলাচলের জন্য যানবাহন সবই সে তৈরী করতে সমর্থ হয়।

মানুষ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার করে অসহায়ত্ব উত্তরণের সকল পন্থা। এরপর জাগে তার চিরন্তন ভাবনা। তখন সে মরতে চায় না, দুঃখ চায় না, চায় অফুরন্ত জীবন। এই জীবনের জন্য ভাবতে ভাবতে তার অনেক কিছু জানা হয়, দেখা হয়। দেখতে দেখতে জানতে জানতে তার সম্মুখে একসময় প্রকৃতির দ্বার খুলে যায়। অতি ইন্দ্রিয়ের পর্দা হালকা হয়ে আসে। ফলে অপ্রাকৃতিক জগতের আলোকরশ্মি শিশিরের মতো তার অন্তরকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দেয়।

পক্ষান্তরে কিছু কিছু সাধারণ মানুষের মাঝে অপ্রাকৃতিক জগতের গন্ধ-সাধ আসতে থাকে। চোখের পর্দায় ক্ষীণ আলোর আভাও সব দেখা যায়। পৃথিবীতে এ ধরনের মনীষী প্রয়োজনে জ্ঞান পিপাসী হয়ে বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে অপ্রাকৃতিক জগতের অনেক নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন। তখন তারা বিস্ময়ে লুটে পড়েন স্রষ্টার অপার মহিমার সাগরে। সেই জগৎ বিখ্যাত কালজয়ী বিজ্ঞান সাধকগণের জ্ঞানগর্ভ কথা আমাদের চিন্তার খোরাক হয়। হয় ধ্রুব তারার মতো দিকভ্রান্ত নাবিকের পথ নির্দেশক।

www.nagorikpathagar.org

ফল কথা হলো, জানার জন্য জানা নয়। মানার জন্য জানাই উত্তম, যদি যুক্তির সাগরে তাদের কথাগুলো ঠাঁই দেয়, তবে জীবন তরীর নোঙ্গর ফেলার আগেই তো জেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে পাল ঘুরিয়ে, হাল ঘুরিয়ে দিক ঠিক করে পথ চলতে হবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই, রাত্রির তর্জন-গর্জনের কথা ভাবতে হবে। আঁকা-বাঁকা পথ ছেড়ে হাল ধরতে হবে সরল পথের দিকে। তবেই মুক্তির আশা করা যায়।

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বিকীর্ণ কর্মশক্তি

বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হচ্ছে মানুষ ততই অসীমের শিকড় তালাশ করতে শুরু করেছে। অসীমকে জানার সবচেয়ে বড় বাধা হলো মানুষের সীমাবদ্ধতা। মানুষ স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে সীমাবদ্ধতার প্রাচীরকে ফারাক করতে চায়, ভাঙ্গতে চায়। তাই মানুষ এখন আর পৃথিবীর লোহা লক্করের তৈরী যন্ত্রযানে চড়তে চায় না। এতে সময়ের যেমন অপচয় হয় তেমনি জীবনের ঝক্কি ঝামেলাও পোহাতে হয় অনেক। অপেক্ষার মৃত্যু বহর নিয়ে, তীর্থের কাকের ন্যায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বার বার সময় দেখতে হয়। কখন আসবে সেই যন্ত্রযান, সিডিউল টাইম তো চলেই গেল। আর কত অপেক্ষা করা যায়। সেজন্য লোহা লক্করের যন্ত্রযানের প্রতি মানুষের অনীহা। তাই মানুষ বিরক্তির অবসান চায়, পরিত্রাণ চায়। সেভাবে ফ্যাক্স, টেলেক্স-এর মতো যদি দেহটিকে শূন্যে তরঙ্গ করে পাঠিয়ে দেয়া যেতো, তাহলে তো এ ঝামেলাই থাকতো না। অবশেষে যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা সেখানে যদি আর একটি মেশিন দেহকোষের অদৃশ্য তরঙ্গ দানাগুলোকে জড়ো করে পূর্বের ন্যায় মানুষ বানিয়ে দিতে পারতো, তবে এক নিমিষেই পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ফিরে দেখে কাজ-কর্ম সেরে আবার নিজ গন্তব্যে ফিরে আসা কতই না সহজ হতো, সুখের হতো। প্রয়োজনে চাঁদের দেশ কিংবা মঙ্গল গ্রহ বিচরণ করা সম্ভব হতো। মানুষের কল্পনার দুয়ারে এভাবে কত যে স্বপ্ন এসে ভিড় করে তার ইয়ত্তা নেই। এই স্বপ্ন কোন দিন বাস্তবে রূপ নেবে কি না জানি না। তবু মানুষ চেষ্টায় রত, সাধনায় রত। মানুষ আজ সাধনার তরী নিয়ে সাফল্যের আশায় অসীম সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য যন্ত্র ছাড়াই তার পথ খুঁজছে। পাশ্চাত্য জগতের থিওসফী নামক আধ্যাত্মিক সাধনার পথ এর দাবী রাখে। থিওসফীর মতে মানুষের তিন প্রকার দেহ আছে। যেমন- জ্যোতির দেহ, মানস দেহ ও জড়দেহ।

আত্মা আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবান হলে জড়দেহকে রেখে মানুষের পক্ষে ইথারিক দেহ (জ্যোতির দেহ) ধারণ করে বিশ্ব ঘুরে আসা সম্ভব। কারণ আত্মা যদি আধ্যাত্মিক

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতায় বলীয়ান হয় তবে সব দেহই আত্মার বশ মানতে রাজি। এতে স্থূল দেহও কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারবে না। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে যদি জ্যোতির দেহ নিয়ে মানুষ উড়াল দেয় তখন তার স্থূলদেহ জ্যোতির গতিতে ওজনহীন হয়ে সেটিও উড়াল দিবে। গতিশীল জিনিসের বেলায় স্থূল জিনিস শূন্য দিয়ে ভ্রমণ করা কোন সমস্যার ব্যাপার নয়। তবে সেই গতি হতে হবে স্থূল আকারকে ওজনহীন করার মতো বেগবান। থিওসফীর সাধনা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার যুগে মানুষের জন্য এক যুগান্তরকারী অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। এককালে মুসলিম সুফী সাধকগণ আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে অনেক অলৌকিক ব্যাপার রপ্ত করেছিলেন। তারা পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন, আকাশ দিয়ে চলতে পারতেন। বর্তমানের থিওসফীর সাধনা যেন মানুষকে সেই ধর্মীয় মূল্যবোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাখিকে আকাশে উড়তে দেখে একদিন মানুষ পাখির মতো ডানা লাগিয়ে উড়তে গিয়ে সফলকাম হতে পারেনি। কিন্তু এতেও মানুষের চেষ্টা, সাধনা, তদবির কমেনি। সেই সাধনার ফলেই একদিন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ বানাতে পেরেছিলেন। আজ রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই উড়োজাহাজ উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছে। তাদের পথ ধরেই মানুষ এখন রকেট (Space ship) বানিয়ে চাঁদের মাটিতে বিচরণ করে সফলভাবেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরেছে। এবার শুরু হয়েছে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পালা। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, আজ যে জিনিস কল্পনার বিষয়, কাল তা সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই বলছি যন্ত্রযান ছাড়া ঘোরার যে সাধ মানুষের মনের বাসরে উঁকি দিয়ে আছে তা হয়তো একদিন সত্য হিসেবে ফলতেও পারে।

এক সময়ের পঁচা-গান্ধা বস্তুবাদী চিন্তাধারা মানুষকে বানিয়েছিল ইতর বানরের জাত। আজ সেই পঁচা-গান্ধা ডারউইনি মতবাদ বিজ্ঞানীগণ ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছেন। পক্ষান্তরে মার্ক্স-এর দর্শন জন্ম দিয়েছিল নাস্তিক্যবাদ। এই নাস্তিক্যবাদই এক শ্রেণীর জ্ঞান পাপীদেরকে বানিয়ে ছিল অন্ধ ও লোভাতুর জন্তু জানোয়ারের মতো। তারা হাশর-নশর, পাপ-পুণ্য, পুনরুত্থান, শেষ দিবসের বিচার-আচার কিছুই বিশ্বাস করতো না। "Eat, drink and be marry, because tomorrow we will die" এই প্রবাদটির বাংলা হচ্ছে– খাও দাও স্ফুর্তি করো, আগামীকাল ত মরেই যাবো, – এই দর্শন বিশ্বাস গলায় ঝুলিয়ে তারা জীবনকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এখন অবশ্য তারা তার স্বাদ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

এইডস-এর প্রতিক্রিয়া সেই মজা এখন লিভার বেরামের রোগীর মতো জিহ্বাকে করেছে তিক্ত এবং শরীরকে দিন দিন করছে নিস্তেজ। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারতায় এসব বস্তুবাদী ধারণা এখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বসেছে। কোন কোন দেশ থেকে সেসব নাস্তিক্যবাদী প্রভুদের পাথরের মূর্তি ক্রেন দিয়ে সরিয়ে সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। যখন এই নাস্তিক্যবাদী ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল তখন অসীম সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল একেবারে সীমাবদ্ধ। সেজন্য অনন্ত অসীমের প্রেমময় মধুর বাণী সে হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারেনি। তখন ধর্মের বাণী ছিল উপেক্ষিত। ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু যুগশ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আপেক্ষিক তত্ত্ব অসীমের ধারণাকে শিথিল ও সহজ করে দেয়। তারপর থেকে মানুষের মনে অংকুরিত হতে থাকে পরকালের ধ্যান ধারণা।

বর্তমান মানুষের সেই বিশ্বাসের শিকড় মেলতে মেলতে চলে গেছে অনন্তের দিকে, অসীমের দিকে। সেই অসীম থেকে সসীম নিতে থাকে আত্মিক খাদ্যরস। ফলে মানুষের মনে পুনরায় ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধ। জাগরণ শুরু হয়েছে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বিজ্ঞানের সেই সাধক পুরুষ একাধারে যেমন ছিলেন বিজ্ঞানী তেমনি ছিলেন পরকাল ও স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তিনি ভাবতেন মানুষের বিকীর্ণ কর্মশক্তির কথা, ভাবতেন অপ্রাকৃতিক জীবন ব্যবস্থার নিয়ম নীতির কথা। তার ভাবনার বিষয়বস্তুর রহস্যময় তত্ত্ব মানব জাতিকে দেখিয়েছে আলোর পথ, মুক্তির পথ।

বিজ্ঞানের এই সাধক পুরুষ পরকাল সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো– "সেই অপার্থিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ নিচের দিকে টেনে নামায় না, পদার্থ বলে সেখানে কিছু নেই, আলোক সেখানে অচল, পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব। কাজেই নতুন গণিত আমাদেরকে স্বর্গের প্রচলিত ধারণার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে।" (বিশ্ব নবী : পৃ. ৪৪২ দ্রষ্টব্য)

আস্তিক্যবাদী এই বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফল ধর্মেরই সারকথা। তিনি বিশ্বজগতের সম্প্রসারণ ও মানুষের বিকীর্ণ কর্মশক্তি সম্পর্কেও বিশ্বাসীদেরকে নতুন ধারণা দিয়েছেন। সে ধারণা আমাদেরকে কর্মফলের জগৎ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ করে দিয়েছে। তাঁর মতে– "বিশ্বের কোথাও পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে; বিশ্বে পদার্থের পরিবর্তন হচ্ছে একথা সত্য কিন্তু এই পরিবর্তন একই দিকে পদার্থের ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। প্রকৃতির দৃশ্য এবং অদৃশ্য

www.nagorikpathagar.org

সমস্ত ব্যাপারে সে পরমাণুর ভেতরেই হোক আর বহির্বিশ্বেই হোক একই বিষয় নির্দেশ করে যে, পদার্থ ও কর্মশক্তি বাষ্পের মতো অদৃশ্য শূন্যের ভেতর অবিরত ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্য ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। তারাপুঞ্জের অনেকেই এখন পোড়া কয়লা মাত্র, বিশ্বের সর্বত্র তাপের মাত্রা কমে আসছে। পদার্থ বিকীর্ণ হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং কর্মশক্তি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে বিশ্ব তাপ মৃত্যুর দিকে এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।" (------ বিজ্ঞান না কুরআন : ১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইসলাম ধর্মের পূর্বশর্ত গায়েবে বিশ্বাস স্থাপন। না দেখে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের মূল দাবী। ধর্মীয় রীতি নীতিতে আমল করা মানে ঈমানের স্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। কিন্তু বিজ্ঞানের পূর্বশর্ত এর তত্ত্ব ও সূত্র তাত্ত্বিক ও প্রয়োগ নির্ভর হতে হবে। বাস্তবে তা না হলে বিজ্ঞান কোন কিছুতে বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

আমাদের এই পৃথিবী রঙ বেরংয়ের বস্তু নিয়ে গঠিত। প্রাণহীন জড় পদার্থ এবং প্রাণধারী জীব সত্তার দেহাবরণ এই দুনিয়ার পদার্থের তৈরী। সকল পদার্থের আদি মৌল পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। আইনস্টাইন বলেছেন, বিশ্বের অন্য কোথাও পদার্থের মৌল উপাদান তৈরী হয়েছে। মূলত তাঁর এই কথার কোন তাত্ত্বিক ও প্রয়োগ নির্ভর যুক্তি বা ব্যাখ্যা না থাকলেও এতে রয়েছে বিজ্ঞানের পদযাত্রার প্রথম হাতিয়ার অনুমানভিত্তিক তথ্য কথা, ধরে নেয়া বা মনে করার মতো বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি। এই বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বিজ্ঞান প্রথম থেকেই এভাবে যাত্রা শুরু করে এ স্বপ্নের আসন থেকে বাস্তবে পদার্পণ করেছে। সেজন্য বিজ্ঞান অনুমানভিত্তিক সংখ্যা 'ধরে নেওয়া' কিংবা 'মনে করি' ইত্যাদি ব্যতীত এক ইঞ্চিও এগুতে পারেনি।

পৃথিবীর পদার্থ ও কর্মশক্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলেও তার যে ধ্বংস নেই সেটিও বিজ্ঞানের কথা। মানব জীবনের কর্মশক্তি শূন্যে ছড়িয়ে পড়লেও সে সত্তার যে ধ্বংস হবে না একথা বিজ্ঞান বিশ্বাস করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে এই সত্তা যে পরকালের জগৎ সৃষ্টির আদি মৌল হবে না তা কি করে বলা যায়। পৃথিবীর মৌল উপাদান যদি বিশ্বের অন্যত্র সৃষ্টি হয়ে এর প্রাকৃতিক শোভা-রূপ-যৌবন গড়ে তুলতে পারে তবে আমাদের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা দিয়ে নতুন আর এক বিচিত্রময় জগৎ সৃষ্টি হওয়া কাল্পনিক কিছু হতে পারে না। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ,

www.nagorikpathagar.org

তার বিকাশ, তার রূপায়ণ ইত্যাদি কি এর সাক্ষী হিসেবে ধরে নিতে পারি না? এ জগৎ যদি ঘনায়ন ও রূপায়ণের উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের সার্থক ফসল হতে পারে, তবে কি এখানের বীজ থেকে নতুন কোন বাগান কিংবা উদ্যান অঙ্কুরিত হয়ে পল্লবিত হবে না ? কেউ যদি বলে এটা সত্য নয়, তাহলে তাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, শক্তির যেখানে বিনাশ বা ধ্বংস নেই, আবার কর্মশক্তির যেহেতু একটির সাথে অন্যটির সংমিশ্রণ হয় না তবে ঐ শক্তি যাবে কোথায়?

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমান গ্রাহ্য হলে, ধর্মের ক্ষেত্রে গায়েবে বিশ্বাস অযৌক্তিক হওয়ার কারণ থাকতে পারে না। ধর্মীয় দৃষ্টিতে পরকাল কর্মশক্তির রূপান্তরিত জগৎ (কর্মফলের জগৎ) বৈ অন্য কিছু নয়। যেমন বলা হয়েছে, আদ্ দুনিয়া মাজরা'আতুল আখেরাহ অর্থাৎ দুনিয়া পরকালের কর্মক্ষেত্র। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক নিউটনের ভাষায় পৃথিবীকে বলা যায়– ক্রিয়ার জগৎ এবং পরকালকে বলা যায় প্রতিক্রিয়ার জগৎ। এই প্রতিক্রিয়ার জগৎ আমাদের থেকে অনেক দূরে। যার দেখা পাওয়া মানুষের শক্তির অধীনে নয়। একে যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে বিশ্বাস করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই।

যদি বিজ্ঞানের মতো পদযাত্রার প্রথম হাতিয়ার 'মনে করি' কিংবা 'ধরে নেয়ার' মতো বাহন নিয়ে অজানা পথে অনন্তের দিকে সূক্ষ্ম নজর দিয়ে চলতে থাকা যায়, তাহলে এ দৃষ্টি এতো দূর নিয়ে চলে যাবে যার কোন কূল কিনারা পাওয়া যাবে না। যার কিনারা নেই তার কোন সূত্র বা প্রয়োগশীল ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। সসীম যদি অসীমের পুরোপুরি ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয় তাহলে অসীম বলতে কিছু থাকে না। এটাই যুক্তি ও অসীমকে সীমাহীন অনন্ত বলার সূত্র।

এই পৃথিবী সূর্যের বিকীর্ণ শক্তি গিলে হজম করে বেঁচে আছে। যতক্ষণ সূর্যের আয়ু আছে ততদিন হয়তো বা এই পৃথিবী বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু সূর্যের আয়ু ফুরিয়ে গেলে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে একথা সত্য। অন্যদিকে এ পৃথিবীর পদার্থ ও মানব জীবনের কর্মশক্তি (অদৃশ্য বিকীর্ণ শক্তি) গিলে হজম করে যে জগৎ চির আয়ু লাভ করছে, সেটিই কর্মশক্তির রূপান্তরিত পরজগৎ বা কর্মফলের জগৎ। এই বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক থাকাটা রহস্যময়। কর্মফলকে যদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য বলা প্রমাণ করা যায় তাহলে সেই রহস্যের কথা যুক্তির মানদণ্ড দিয়ে ওজন করে তা বিশ্বাস করতে আমাদের বাধা কিসের?

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ

মানুষ মানুষের প্রয়োজনে– তথা সমাজ, জাতি বিশ্বের কল্যাণে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে, তৈরী করছে নতুন কলকব্জার মডেল। এসবই মানুষ মানুষের কল্যাণেই করে থাকে। কেউ তো কোন দিন বৃথা কিছু সৃষ্টি করতে দেখেনি। সেদিক থেকে এই পৃথিবীর মহান নির্মাতা কি এই আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবীর সাজ-সজ্জা, মানুষ, পশু-পাখি বৃথা সৃষ্টি করেছেন ?

মানুষ যখন বৃথা কিছু তৈরী করে না, পক্ষান্তরে খোদাও এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি। পৃথিবীর সব প্রাণী বিবেক বুদ্ধিশীল নয়। বিবেক বুদ্ধি আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই মানুষকে নিজ কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। এই জবাবদিহিতার মধ্যে মানব জাতির মহাকল্যাণের নিগূঢ় শর্ত বিদ্যমান। চিরজীবি হওয়ার মহান সুব্যবস্থা। কারণ যাদের জবাবদিহিতা নেই তারা অমর নয়। পক্ষান্তরে তাদের জন্য জান্নাত কিংবা জাহান্নাম তৈরী করা হয়নি। আমরাই শুধু স্রষ্টার প্রতিনিধি। তিনি আমাদের জন্য পৃথিবীকে বানিয়েছেন আখেরাতের কর্মক্ষেত্র। বাণিজ্যের জন্য দিয়েছেন অফুরন্ত সম্পদ। সুতরাং প্রতিনিধির কাছ থেকেই হিসাব নিকাশ নেওয়ার বিধান আইনত বৈধ। পৃথিবীর বাণিজ্য বহর থেকে কি মালামাল নিয়ে গিয়ে আমাদের হিসাব-নিকাশ বুঝাতে হবে সেটিই আমাদের জানার বিষয়।

স্রষ্টার মনোনীত জীবন পদ্ধতির মধ্যে পরকালের সুফল নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে শয়তানী জীবনাচারের মধ্যে কুফল বা অশান্তি নিহিত। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধশীল উন্নততর চরিত্র, মানবতার বিকাশ, সৃষ্টি ও স্রষ্টা প্রেম এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই ভালো সম্পদ রোজগার হতে থাকে। অন্যদিকে তার বিপরীত গুণাগুণ দ্বারা মন্দ জিনিস তৈরী হতে থাকে। এর জন্য বণিকের মতো জাহাজ বোঝাই মালামাল নিয়ে বের হতে হয় না। বরং বিবেক বুদ্ধির সত্তাকে জাগ্রত করে পশুত্ব প্রবণতা থেকে উঠে আসতে হয় মানুষের শ্রেণীতে। তবেই আখেরাতে সুকৃতির মূল্যমান সম্পদ তৈরী হবে। পরিণামে এই সত্তাগুলো ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আকাশ ভেদ করে তার প্রকৃত ঠিকানায় জমতে থাকবে। এর জন্য শর্ত হলো হালাল খাদ্য, ঈমান ও সৎ আমল।

রাসূল (সা) বলেছেন– "যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে শরীরে রক্ত মাংস বানাবে, তাদের রক্ত মাংস দোযখের ইন্ধন হবে।"

www.nagorikpathagar.org

খুঁটিবিহীন, বেড়াবিহীন পৃথিবী নামক সোনার তরীর পিঠে চড়ে, খেয়ে-দেয়ে, ঘুম, নিদ্রা আরাম-আয়েশের মাঝেও জীবন কাটিয়ে দিয়ে এমনকি সম্পদ আমরা পাচার করছি, যা কখনো কোন রাডার যন্ত্রে ধরা পড়েনি? আকাশ কিংবা বাতাসের গাঁয়ে ধাক্কা লাগেনি? এর কি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে ? বর্ণালী অণুবীক্ষণের যুগে কম্পিউটার নামক কৃত্রিম মাথা নিয়ে সে জিনিস তালাশ না করে বোকার মতো বসে থাকা বিবেক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় করিয়ে দেয়। যেহেতু জীবন-নদীর একূল সাগর পাড়ি দেয়ার মাঝে সে কূলের সুখ-শান্তি, উত্থান-পতন সবই গাঁথা, সেজন্য হলেও তার কথা ভাবা দরকার, তার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "এ দুনিয়া নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবনের প্রকৃত আরাম হচ্ছে পরকাল।" (সূরা-২৯ : ৬৪)

এ বিশ্বে সকল ক্ষেত্রেই বাহ্যিক কোন 'কারণ' ব্যতীত কোন ঘটনার উৎপত্তি হয় না। কার্য-কারণ নীতির ফলে এ বিশ্ব বিচিত্র রূপ লাভ করছে। যেমন বাতাস না বইলে গাছের পাতা নড়ে না তেমনি বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রাকৃতিক কারণ থাকতে হয়। সেরূপ সকল কারণেরও একজন কর্তা থাকতে হয়। তাছাড়া ক্রিয়া না ঘটলে কখনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। এ পৃথিবীতে সব জিনিস আমাদের সুখ দেয় না, শান্তি দেয় না। যে জিনিস সুখ দেয়, সে জিনিস আবার দুঃখ-কষ্ট দেয় না। সে কারণে পৃথিবীতে সুখের জন্য রয়েছে সুখের সত্তা বা বস্তু, আবার কষ্টের জন্য রয়েছে কষ্টের উপাদান।

পক্ষান্তরে প্রতিটি মানুষের সকল কাজ সব প্রাণীকে সুখ দেয় না, শান্তি দেয় না। যেসব কাজ দুঃখ দেয় এরও প্রতিক্রিয়া হয়। আবার যেসব কাজ সুখ দেয় তারও প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে কর্ম যেমন ধ্বংস হয় না তেমনি প্রতিক্রিয়ার বিনাশ বা ধ্বংস নেই। মানব আচরণের কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকেই যে প্রতিফলের সত্তা তৈরী হবে তার কিছু আগাম সংকেত পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত আমলের প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।" (সূরা-৩ : ২৫)

বিবেক যেসব কাজকে অসঙ্গত বা খারাপ মনে করে সেগুলো পাপ কাজ। দুনিয়াতে সকল পাপ কাজই দু:খ বয়ে আনে। পৃথিবীর মাটিতেও তার প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়। অনেকে এর জন্য চরম কষ্ট ভোগ করে। দুনিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাপনায় অনেকের বিবেক বুদ্ধি অবশ্য পাপ কাজে নিমজ্জিত থাকতে থাকতে

www.nagorikpathagar.org

তাদের চেতনা শক্তি হারিয়ে ফেলে। এর জন্য মূলত দায়ী রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি। কারণ অনেক রাষ্ট্র ও ধর্মনীতিতে রয়েছে অধর্মের বোঝা। এই বোঝা তিলে তিলে মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করে, যার জন্য এদের বিবেক এটিকেই (অধর্ম নীতিকে) সত্য মনে করে। পৃথিবীতে মানুষ চরম সমস্যায় না পড়লে তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে না। আর পৃথিবীতে ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে কোনটি সঠিক, কোনটি বেঠিক তা বিচার বিশ্লেষণ করার কোন বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি নেই। যদি আমাদের কর্মের সত্তা ধরা পড়ত, তাহলে আমরা সহজেই ভালো-মন্দ বিচার করতে পারতাম। যেহেতু আমরা ভালো-মন্দ নিখুঁতভাবে বিচার করতে পারি না সে কারণে পৃথিবীতে ধর্মীয় সমস্যার সার্থক কোন সুরাহা হচ্ছে না। পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থায় সকল মানুষ নিজের কর্মের প্রতিফল এখানে ভোগ করে না। যে ব্যক্তি অত্যাচারী সে রাজাই হোক সাধারণ গ্রাম্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই হোক, অথবা ছিনতাইকারী চোর, ডাকাত, ধর্ষণকারী বা খুনীই হোক। যেহেতু এ পৃথিবীতে এদের সবাই সুবিচার পায় না সে কারণে এই পৃথিবী পুরোপুরি কর্মফল ভোগ করার মতো স্থান নয়। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস-এর জন্য এক নিখুঁত স্থান নির্ধারিত আছে। তা না হলে সকল ক্রিয়ারই যে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, নিউটনের এ সূত্রটি ভুল প্রমাণিত হবে। যেহেতু এ সূত্রটি বিজ্ঞানসম্মত, সে কারণে ধর্মীয় বিধানে পরকাল বলে যে জগতের কথা বলা হয়েছে, তাকে প্রতিক্রিয়ার জগৎ বা প্রতিফলের কিংবা কর্মফলের জগৎ বলা যায়। আল্লাহ বলেছেন– "একটি সরিষা পরিমাণ আমল হলে তাও আমরা নিয়ে আসবো। আর হিসাব করার জন্য আমরাই যথেষ্ট।" (সূরা-২১ : ৪৭)

পাহাড় থেকে যখন ঝরনা বয়ে যায় তখন তার সাথে পাহাড়ের ধূলিকণা চলে যায়। ফুলে যখন বাতাস লাগে তখন সে সুগন্ধি বয়ে নেয়। নর্দমায় যখন আবর্জনা পঁচে গ্যাস হয় তখন বায়ু দূষিত হয়। ত্রুটিযুক্ত গাড়ি যখন রাস্তায় চলে তখন সেটি খুব কালো ধোঁয়া দেয়। ঝরনার সাথে মিশে আসা ধূলিকণা যেমন নদ-নদী আর সাগরে ঠাঁই নেয় তেমনি সুগন্ধির উপাদান ও দুর্গন্ধের উপাদান এবং গাড়ির কালো ধোঁয়া বাতাসের পরতে পরতে মিশে ভেসে বেড়ায়। পক্ষান্তরে মানব ইঞ্জিনের দৈনন্দিনের ক্যালরিগুলো সুকৃতি অথবা দুষ্কৃতির গন্ধ নিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। একটি রাস্তার শুরু থাকলে তার শেষ থাকতে হবে এটিই নিয়ম। তা না হলে সে জনপদ বিরান হয়ে যায়। সেদিক থেকে জীবন যাত্রার শুরু ও শেষ গন্তব্য আছে প্রমাণিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

এরূপ না থাকলে জীবন যাত্রা অনেক আগেই বিরান হয়ে যেত। প্রথমে রাস্তা যখন কোন্ প্রান্ত থেকে শুরু হয় তখন সেখানে অতীত খুঁজে না পেলেও, যেখানে গিয়ে শেষ হয় সেখানে থাকে প্রাপ্তির স্থান। যেমন শহর, বন্দর ইত্যাদিতে রয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে সকল রাস্তা শহর, বন্দরে এসেই ঠাঁই নেয়। সেরূপে জীবন যাত্রার যেখানে শেষ নিবাস সেখানেও আছে অনন্ত প্রাপ্তির ব্যবস্থা। এই প্রাপ্তি চরম সুখের হতে পারে অথবা চরম দুঃখের হতে পারে। কারণ খালি হাতে অথবা অচল মুদ্রা নিয়ে গেলে সেখানে যেমন সওদা মিলবে না, তেমনি অচল মুদ্রার কামড়ে অতিষ্ঠ হতে হবে। অন্যদিকে পরকালে প্রাপ্তির উপকরণ এই দুনিয়া ছাড়া পাওয়াও সম্ভব হবে না। তাই সেখানে অন্তর জ্বালাও হবে। সুতরাং প্রশ্ন জাগতে পারে, এই রহস্যময় উপকরণের নাম কী ? মানুষ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় তখন তো কারও কবরে কিছু রাখতে দেখা যায় না। এগুলো নেয় কেমন করে?

সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে মাটির বিছানায়, সাদা কাফনে ঢেকে দিয়ে সবাইকে তো প্রকৃতির পোশাকেই শুইয়ে রাখা হয়। তাদের সাথে তো কোন সিন্দুক, বাক্স কিংবা ব্যাগে ভরে কিছু দিতে দেখা যায় না। আল্লাহ বলেন– "তোমরা যেরূপ আমল করেছিলে আজ সেরূপই তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা-৪৫ : ২৮)

পৃথিবীর আহ্নিক গতি, কোষস্থ পরমাণুর জীবন সংগ্রাম, কর্মক্ষম মানুষের কাজ-কর্ম, চিন্তাধারা ইত্যাদি কারণে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় নিত্য নতুন শক্তি নেয়ার। একজন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক লোক বেঁচে থাকার জন্য সারাদিনে ২২০০/২৮০০ ক্যালরি শক্তি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। সময়মত এ শক্তি না পেলে আমাদের জীবন থেমে যেতে চায়। আবার এ শক্তি বেশিক্ষণ দেহে স্থায়ীভাবে মওজুদও থাকে না। এই শক্তি পাহাড়ের ঝরনার মতো অথবা বিকলাঙ্গ গাড়ির ইঞ্জিনের ধোঁয়ার মতো অথবা আলোকরশ্মির মতো অবিরত দেহ কোষের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে ছুটে চলে কোথায় ? যেখানে গিয়ে সেগুলো ঠাঁই নিচ্ছে সেখানেই বা কী গড়বে? সে জগৎ যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন সেটি আমাদের অভিব্যক্তির ফসল, কর্মের প্রতিফলের জগৎ। ঝরনার পানি ধূলিকণা বয়ে যায়, ফুল থেকে বাতাস যেমন সুগন্ধি নিয়ে চলে, নর্দমার পঁচা আবর্জনার গন্ধ যেমন বাতাসের পরতে পরতে লেগে থাকে তেমনি আমাদের মনের অভিব্যক্তির (নিয়তের) প্রেরণার ফসল কর্মশক্তির (বিকীর্ণ সত্তার) গায়ে প্রতিবিম্বস্বরূপ মেখে নিয়ে সেটিও লোকচুরি দিয়ে পালিয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ বলেন– "সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃতি-দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে।" (সূরা-৩ : ৩০)

মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাতের পুরো জীবনটাই ঢালাই করা একটি রেশমী চাদরের মতো। এক্ষেত্রে তাঁতীর টানা সূতা গাঁথা অবস্থাটা হলো মাতৃগর্ভকালীন অবুঝ শিশু জীবন। তারপর ধরাধামে আসার আগ পর্যন্ত সময়টিতে সে পূর্ণতা লাভ করে। এ সময় একই সাথে জীবনের দু'টি পিঠই তৈরী হয়ে যায়। যেরূপে তাঁতীর তানা-পুড়ানে একই সাথে দু'টি পিঠ পূর্ণ হয়, সেরূপেই জীবনের এপিঠ পূর্ণতা লাভ করলে ওপিঠও তৈরী হয়ে যায়। যখন পুরো চাদরটা তৈরী হয়ে যায় তখন দুনিয়ার জীবনেরও সময় ফুরিয়ে আসে। কিন্তু ওপরের পিঠে গণ্ডগোল দেখা দিলে নিচের পিঠেও তার প্রতিক্রিয়া পড়বে। তাঁতী যখন কাপড় বুঁনে তখন সে ওপরের পিঠ দেখে বটে, কিন্তু সে মুহূর্তে নিচের পিঠে কি হচ্ছে তা সে লক্ষ্য করতে পারে না। তেমনি আমরাও শুধু দুনিয়ার পিঠের খবরই রাখতে পারি। আমাদের পাপ কাজ কিংবা নেক আমল থেকে নিচের পিঠে কি হচ্ছে তাতো আমরা তাঁতীর মতোই দেখতে পারি না। সেজন্য ঈমানদার ব্যতীত অন্যেরা নিচের পিঠের বিষয় বিশ্বাস করে না। কিন্তু একদিন যখন ওপরের পিঠ উল্টিয়ে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে– "হে আমাদের প্রভু! আমরা দেখলাম এবং শুনলাম অতএব আমাদেরকে পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক কাজ করব; নিশ্চয়ই এখন আমরা বিশ্বাসী হয়েছি।" (সূরা-৩২ : রুকূ-২)

বর্তমান বস্তু জগতের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার যে আইনে পরকালীন জগতের জিনিসপত্র গোপন রয়েছে, জীবন যাত্রার দ্বিতীয় পিঠ উল্টিয়ে দিলে সেখানে সবই উদ্ভাসিত দেখা যাবে। সেখানে কোন সূক্ষ্ম সত্তাও গুপ্ত রবে না।

মানব জীবন ও তার প্রকৃতি কূলহীন মহাসাগরের মতো গতিময়। এ জীবন সাগরে কখনো জোয়ার আসে আবার কখনো ভাটা পড়ে। পরিশেষে একদিন তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন দুনিয়ার 'জীবন সাগরের' গতির চিরস্থায়ী মৃত্যু ঘটে। এখানে জীবন যতদিন চলে ততদিন দেহ কোষের জীবন্ত পরমাণু নামক প্রতিটি বাল্ব সতেজ থাকে।

আমাদের মনের অভিব্যক্তির চৈতন্যক্রিয়া যখন ঢেউ আকারে স্রোতের ন্যায় সেই পরমাণু নামক বাল্বে গিয়ে পতিত হয় তখন যদি পুরো ব্যবস্থাটি ত্রুটি মুক্ত থাকে, তাহলে ঐ বাল্ব দিয়ে এক উজ্জ্বল সত্তা বিকীর্ণ হবে। এ সত্তা বিকীর্ণ কর্মশক্তি।

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে ব্যবস্থাটি যদি ত্রুটিপূর্ণ থাকে, তবে ঐ বাল্ব দিয়ে পাচার হবে অনুজ্জ্বল সত্তা। সর্বোতভাবে সবকিছুই চালকের মর্জির উপর নির্ভর করে। চালক যদি রোগগ্রস্ত হয়, সীমালঙ্ঘনকারী হয় তাহলে পুরো সিস্টেমটিই হবে অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত।

আল্লাহ বলেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের সীমালঙ্ঘন করে, সে নিজের আত্মার ওপরই অত্যাচার করে।" (সূরা-৬৫ : রুকূ-১)

ধর্মীয় দৃষ্টিতে যারা পাপাচারে লিপ্ত থাকে তারা সীমালঙ্ঘনকারী, অবিশ্বাসী। তারা কোন নিয়মনীতি মানে না। পরকাল, বেহেশ্‌ত, দোযখ পাপ, পুণ্য কিছুই বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাসী (ঈমানদার) তারা নেককার ও নিয়মনীতিতে বিশ্বাসী। ওরা হাশর-নশর, বেহেশ্‌ত, দোযখ, পাপ-পুণ্য, সবই বিশ্বাস করে। মানব মন ও তার দৈহিক কাঠামোর পুরো ব্যবস্থাটি মিলে মিশে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সার্বিক ব্যবস্থাপনার মতো। সেজন্য একে সেই সিস্টেমের অনুরূপ নিয়মের মতোই বিধানে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। দেহ ইঞ্জিনে বিদ্যুৎ (ঢেউ) যত বেগেই প্রবাহিত হোক না কেন, পথে স্রাব স্টেশন ও মাঝে মাঝে ট্রান্সমিটার বসিয়ে এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। যতটুকু ভোল্টেজ-এ জীবন পরমাণু নামক বাতি থেকে আলো বিকীর্ণ হবে ততটুকুই সরবরাহ করতে হবে। তা না হলে জীবন বাতির আলো কোষস্থ পরমাণু নামক বাল্ব দিয়ে বের হতে পারবে না। অকারণেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। পরিশেষে সেগুলো দূষিত, বিকলাঙ্গ, দুর্যোগময় স্বভাব নিয়ে হারিয়ে যাবে শূন্য গহ্বরে। আল্লাহ বলেন– "তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে নষ্ট করে ফেলেছ।"

অবিশ্বাসী, পাপাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীর আচার-আচরণ থেকে হয় গুনাহ। এই গুনাহ জাহান্নাম সৃষ্টির মূল উপাদান।

জাহান্নামের রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেখানে থাকবে কষ্ট আর অশান্তি। যেহেতু গোনাহ নামক পাপ সত্তা দিয়েই সেটি তৈরী হবে সুতরাং গুনাহের রূপ স্বভাব তার অনুরূপ। অর্থাৎ গুনাহর রঙ কালো ও তার স্বভাবের উত্তাপ জ্বালাময় ইত্যাদি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তির রূপ অন্ধকার ও হুমকির সম্মুখীন থাকে। সেজন্য কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি ক্ষতিকারক। মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্মশক্তির যে অংশটি পাপাচারে মগ্ন থাকা অবস্থায় অদৃশ্য হয়, সেগুলো কি কৃষ্ণকায়া বর্ণ ধারণ করে? আমাদের চর্ম চোখ এদিক থেকে নিরেট মূর্খ। সে তার কোন জবাব দিতে পারে না। আল্লাহ বলেন– "হ্যাঁ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য

www.nagorikpathagar.org

করে এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে; বস্তুত এরূপ লোকরাই দোযখী হয়। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।" (সূরা-২ : ৮২)

নেক ও পাপ আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তির নাম কি-না আমরা সঠিক করে বলতে পারব না। এই সত্তা খুব পাতলা ও অদৃশ্য বলে একে চোখে দেখা যায় না। এমনও হতে পারে এগুলোর তরঙ্গ ঝাঁকের মতো কোন কিছু, কিংবা বিদ্যুতের ঢেউ এর ন্যায় কোন অদৃশ্য সত্তা। তবে সে সত্তা যাই হোক না কেন তার মাঝে তার রূপ ও গুণাগুণ ব্যক্তি বিশেষের ভিন্ন আচরণের (গতির) জন্য ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের হতে পারে। যেহেতু এ সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয় দূরবীনকে ফাঁকি দিয়ে দূরে চলে যায়, তাই এর কোন খবর আমরা রাখতে পারি না। অথচ এই দেখতে না পারার মধ্যেই যত সব সমস্যা। এর জন্য আমরা অন্যায় কাজ থেকে মুক্তি পেতে পারি না। আবার ভালো কাজ মনে প্রাণে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি না।

তবে একথা সত্য যে, পাপ সত্তাগুলো দেখা গেলে আমাদের পক্ষে মাটিতে পা ফেলে হাঁটতেই কষ্ট হতো! ভাবতাম কখন জানি কি হয়ে যায়। পাপসত্তাগুলো যেহেতু জাহান্নামের উপাদান এবং কষ্টের সত্তা সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য রূপ, গুণ যে পুণ্য কণার মতো নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় আমরা অনেক অজানাকেও জানতে পেরেছি। এ সাফল্য থেকেই বস্তু সম্পর্কে নিতে পেরেছি নতুন ধারণা। যে বস্তু এতোদিন ছিল আকারশীল, সেই বস্তুই এখন আমাদের কাছে আকারবিহীন, ঢেউ এর মতো সূক্ষ্ম। এখন আর বস্তুকে বস্তু বলে মনে হয় না। একে না ধরা যায়, না দেখা যায়। তাই আমরা যে সত্তা বিকিরণ করি সেগুলোও কাল্পনিক ছায়ার মতো হলেও এতে পাপের গন্ধ লেগে থাকে। এগুলো আমাদের গ্যালাক্সির প্রকৃতি ধরে রাখতে না পারলেও খোদার সৈনিকের রাডারে তা ধরা পড়ে। সেই সত্তাগুলোই প্রতিফলের জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান।

মহাবিশ্বের সুদূর আকাশের যে কোন একটি বিন্দুতে তাকালে সেখানে একটি করে নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলোর মাঝে এমনও অসংখ্য নক্ষত্র আছে, যেগুলো সূর্য থেকে অতি বিশাল ও অতিশয় উজ্জ্বল। এখন প্রশ্ন হলো : এতো উজ্জ্বল, এতো বিশাল নক্ষত্র থাকার পরও কেন এই আকাশ রাতের বেলায় অন্ধকার দেখায় ? দিনের বেলায় কেন হারিয়ে যায় সূর্যের আলোতে ? অথচ রাতের আকাশটি দুপুরের চাইতে কমপক্ষে ৩০ হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল হওয়ার কথা ছিল।

www.nagorikpathagar.org

এক সময় এ প্রশ্নটি আলবার্স বিপত্তি নামে বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত এ বিপত্তির সমাধান দেয়া হয় মহাবিশ্বের অসীমত্ব ও তার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণকে স্বীকার করে। প্রতি নিয়ত গ্যালাক্সিগুলোর দূরে সরে যাওয়ার গতিমাত্রা বছরের পর বছর ঘুরে ফিরে একই আকাশকে দেখা যায়। কি বিস্ময়! কি বিচিত্র এ সৃষ্টির লীলা খেলা! নক্ষত্র রাজির আলোর পরাজয়কে আমরা মহাবিশ্বের অসীমত্বকে স্বীকার করে মেনে নিলাম। কিন্তু আলোর অবর্তমানে যে অন্ধকার রাশি আলোর জায়গা দখল করে সেটি কি জিনিস ? তা তো কোন দিন আমরা তলিয়ে দেখিনি।

বাতির উজ্জ্বলতা ও তার দূরত্ব অসীম অন্ধকারকে জয় করতে পারে না। ঘরের এক কোণে একটি বাতি থাকলে সেটি ঘরের পুরো অংশটিকে সমানভাবে আলোকিত করতে পারে না। বাতির উজ্জ্বলতা যতই হোক অন্ধকার যদি অসীম হয়, তাহলে সেটি অন্ধকারের কাছে পরাজয় বরণ করে। একটা নির্দিষ্ট সীমার পর অন্ধকার আলোকে পাহারা দিয়ে রাখে। অপরদিকে আলো নিজ আয়ত্তের মধ্যে অন্ধকারকে হজম করে ফেলে।

পক্ষান্তরে আলোর অভাব হলে অন্ধকার তার স্থান দখল করে নেয়। আলোকের অস্তিত্ব আছে। সেটির অতি পাতলা দানা আছে। সে স্থান দখল করে। এর দ্বারা উত্তাপ অনুভব হয়। তার বর্তমানে আমরা গরম অনুভব করি। প্রকৃতির গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু যে অন্ধকার আলো চলে গেলেই তার ঘর দখল করে নেয়, সে কি জিনিস ? তার কি কোন দানা আছে ? আলোর অবর্তমানে এ জগতের প্রকৃতির গায়ের জ্বর কমতে থাকে। তখন অন্ধকার শীতের কফিন গায়ে জড়িয়ে প্রকৃতিকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু ওপার জগতে অন্ধকার শীতের কফিন পরতে পারবে না। গরম শেষ হওয়ার আগেই তার আইন রদ হয়ে যাবে। কিংবা হলেও সেটিতে আবার আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহ বলেন– "এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানির মধ্যে, তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি– যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ঐসব লোক যারা দুনিয়ার জীবনে ছিল সুখি ও স্বচ্ছল। তাদের সুখি ও স্বচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে।" (সূরা-৫৬ : ৪২-৪৫)

আলোর সামনে কোন প্রতিবন্ধক পড়লে তার বিপরীত স্থান অন্ধকার হয়ে যায়। রাতের যে আকাশ দুপুরের চাইতে ৪০ হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল থাকার কথা

www.nagorikpathagar.org

ছিল, তা কি শুধু মহাবিশ্বের অসীমত্ব ও তার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের ফলেই তার উজ্জ্বলতা হারিয়েছে ? তার সামনে কি কোন প্রতিবন্ধক নেই ? বিজ্ঞানের সুদূর প্রসারী পরিমাপক যন্ত্রে সেই প্রতিবন্ধকের অদৃশ্য জাল ধরা না পড়লেও আমার অনুমান এর সামনে এক ধরনের মিহিন প্রতিবন্ধক আছে। সেই প্রতিবন্ধক জালটি পৃথিবী ও মানুষের কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ কর্মশক্তি। এই কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ কর্মশক্তি মহাবিশ্বের অগণিত জ্যোতিষ্কের আলোকরশ্মিকে প্রতিবন্ধক প্রাচীর দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই অসীম অন্ধকার ছেদ করে নক্ষত্রের আলো পৃথিবীর কাছের আকাশকে উজ্জ্বল করতে পারে না। এই অন্ধকার পাপ রাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে। আল্লাহ বলেন– "দোযখ কাফিরদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে।" (সূরা আনকাবূত, রুকূ : ৬)

পারলৌকিক জীবন পদ্ধতির সাথে দুনিয়ার জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি আমলের এতো নিখুঁত সম্পর্ক যেমন পানির সাথে সাগর ও আকাশের সাথে মেঘমালার সম্পর্ক। পানি বাষ্প হয়ে আকাশে ঠাঁই নিলে তা আবার ঠাণ্ডা হয়ে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নেমে আসে। কিন্তু আমাদের আমলের বিকীর্ণ কর্মশক্তি শূন্যে অদৃশ্য হলেও তা আর পৃথিবীতে নেমে আসে না। সেগুলো যেখানে গচ্ছিত হওয়ার কথা সেখানেই জমা হয়। আমাদের আমলের অণু বিন্দুগুলোও একদিন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব।

আল্লাহ বলেন– "সেদিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্যে পৃথক পৃথকভাবে বেরোবে। অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও সৎকাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে আর যে বিন্দু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।"

পাপসত্তা বা গোনাহ নামক জিনিসটি যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানের পরিভাষায় কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ কর্মশক্তির সাথে এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এটি অতি পাতলা ও মিহিন। এতে নেই আলোক তড়িৎ চুম্বক শক্তির মতো প্রভাব। এর গতি অতিশয় ধীর। তার গায়ে আছে সংক্রামক জীবাণু। এর প্রতিটি সত্তা কুৎসিত কালো। পাপ কাজের অভিব্যক্তি থেকে মনের জাদুকরী স্পর্শে দেহের প্রতিটি রেণু কণা থেকেই জন্ম হয় পাপ সত্তা। পাপ সত্তার মতো পুণ্য সত্তাও মনের ইঙ্গিতে জন্ম হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুণ্য সত্তার সাথে আমাদের আমলের সম্পর্ক যে কোথায় তা না জানলে হৃদয় কুটিরে আর এক শূন্যতা বিরাজ করবে। মানব প্রকৃতি শূন্যতাকে মেনে নেয় না বলে আমরা হাত বাড়িয়ে রাখি সামনের দিকে। আর পাতা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সত্যের তালাশ করি।

www.nagorikpathagar.org

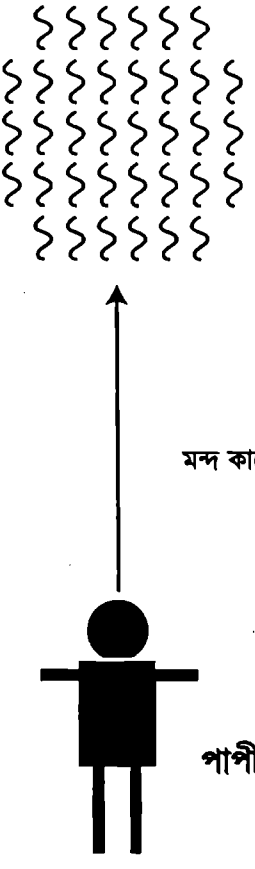

"তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করেছ।" (সূরা আহকাফ রুকূ : ২)

"আমি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় দেখালাম, যেদিন মানুষ ঐসব দেখবে যা তার দু'হাত আগে পাঠিয়েছে এবং কাফির চিৎকার করে বলে উঠবে! আমি যদি মাটি হতাম!" (সূরা আন নাবা : ৪০)

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুণ্য সত্তা

আমাদের পরিচয় আমরা সৃষ্টির সেরা জীব। তাই সকল জীবের চেয়ে আমরা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের পাপ-পুণ্য নিয়ে ভাবতে হয় না। কিন্তু আমরা যতই ভাবি না কেন আসলে পাপ-পুণ্য কি জিনিস, তার রঙ, রূপ কেমন এ সম্পর্কে আমরা একেবারে অজ্ঞ। আমরা শুধু জানি অসৎ পথে চললে পাপ হয়। মূলত এ পাপ-পুণ্য অতি প্রাকৃতিক নিয়মের জিনিস। তবে এগুলোর জন্ম হয় এই মাটির ভুবন থেকেই, মানুষের আচার-আচরণের মাধ্যমে। কিন্তু এগুলো অতি প্রাকৃতিক নিয়মের জিনিস বলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তার গুণাগুণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে এ জিনিস দেখার মতো কোন যন্ত্র আমাদের কাছে নেই। তবে মহামানবগণ তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। তাই দুনিয়াতে মহামানবের আগমন মানব কল্যাণের জন্যই হয়েছে। মাঝে মাঝে যখন মহামানবের শূন্যতা দেখা দিয়েছে তখনই মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কার রীতিনীতি মানতে ও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। শ্রেণীভেদে সৃষ্টি হয়েছে নাস্তিক গোষ্ঠী। তারা বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা আছে বলে বিশ্বাস করতো না। তারা মনে করতো এই বিশ্ব একটি দুর্ঘটনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এরপর থেকেই উদ্দেশ্যহীন ভাবেই সকল কিছু ঘটে যাচ্ছে। আবার একদিন আকস্মিকভাবে তার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

এসব বস্তুবাদীর বস্তুসর্বস্বতা নীতি মানুষকে বানিয়ে তুলেছিল ভোগবাদী। অন্য দিকে যারা কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তারা চন্দ্র, সূর্যসহ নানা কল্পিত দেব-দেবী ও মনগড়া কুলীন বংশ সৃষ্টি করে তাদেরকে পূজা অর্চনা করতে শুরু করে। এরূপ অন্ধকার অমানিশার যুগেই মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। এসব ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে এসে তাদের কওম, বা জাতিকে সহজ-সরল পথে স্রষ্টার দ্বীন (জীবন বিধান) মেনে চলার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। এ কাজ করতে গিয়ে তারা প্রয়োজনে দেহের রক্ত পর্যন্ত ঝরিয়েছেন। তবু সত্যের পথ থেকে, আলোর পথ থেকে, পিছিয়ে আসেননি। কোন ভয়-ভীতি, কোন প্রলোভন, কোন বাধা-বিপত্তি, তাদেরকে ক্লান্ত করতে পারেনি।

নমরূদের অগ্নিকুণ্ডলী, ফেরাউনের খোদার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা, তায়েফবাসীর অত্যাচার, কোরেশদের শতমুখী নির্যাতন ইত্যাদি পরীক্ষাও তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত করতে পারেনি।

এখন প্রশ্ন হলো : একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে স্রষ্টার দেওয়া জীবন বিধান মেনে চলার মাঝে কি এমন অন্তর্নিহিত রহস্য লুকিয়ে আছে, যার জন্য নবী, রাসূলগণও

www.nagorikpathagar.org

(সা) ছিলেন পেরেশান এবং স্রষ্টাও তাঁদেরকে দিয়েছিলেন জীবন বাজির তাগিদ? নিশ্চয়ই মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের বিরাট সাফল্য এর মাঝেই লুকিয়ে আছে। তা না হলে এতো গুরুত্ব থাকার কথা নয়, এতো তাগিদ আসার কথা নয়। এতো যুদ্ধ বিগ্রহেরও কোন প্রয়োজন পড়তো না।

বস্তুত মানুষ যখন পার্থিব জীবনে নিজেদের আচার-আচরণের মাধ্যমে সেই রহস্যময় সম্পদ নষ্ট করতে শুরু করে, তখনই মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পথভ্রষ্ট বান্দাদেরকে কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী, রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সেই নবী, রাসূলগণ দুনিয়াবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন, সত্যের পথে এনেছেন।

সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয় চোখে প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ এবং ওজন স্তরের ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে। তারা জানে, অবাধে গাছপালা কাটলে, কল-কারখানা ও গাড়ির নিয়ন্ত্রণহীন ধোঁয়া ইত্যাদি পরিবেশকে নষ্ট করে। পরিবেশ ও ওজন স্তর নষ্ট হলে জীবন হয় হুমকির সম্মুখীন। সেজন্য তারা পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য হলে পরিবেশ দূষণ আরও ত্বরান্বিত হয়।

বর্তমান বিশ্বকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞ বিশ্ব সম্প্রদায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক ভাবে সেমিনার, সভা, সমিতি গঠন করে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি সেই কর্মসূচীর অভিব্যক্তি। এই পদক্ষেপ দুনিয়ার আয়ু বৃদ্ধির কৌশলও বটে। এ প্রচেষ্টা, দুনিয়ার জীবনে শান্তিতে বসবাসের ভবিষ্যত কর্মপন্থা। সাধারণ মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পরিবেশ দূষণের উপাদানের আধিক্য আঁচ করতে পেরেছে বলেই তারা এসব পদক্ষেপ নিতে সংঘবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে জিনিস দেখে না সে জিনিসের মঙ্গল-অমঙ্গল দিক সম্পর্কে তারা থাকে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার জন্যই তারা এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভাবে না। তাই তারা এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় না। ফলে সে বিষয়টি তারা সবসময় অবহেলার চোখে দেখে।

কিন্তু নবী, রাসূলগণ অতি প্রাকৃতিক বিষয়ের সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন বিধায় তারা মানুষকে কল্যাণের পথে আসতে উদ্বুদ্ধ করতেন। জীবন বাজি রেখে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন। তাদের প্রদর্শিত কল্যাণের পথ হলো, একত্ববাদে বিশ্বাস ও আল্লাহর নির্দেশিত জীবন বিধান অনুসরণ। এই পথে চলা খুব কঠিন আবার সহজও। ভোগবাদী প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে এই পথে পা দেয়া প্রথম প্রথম একটু কঠিন মনে হয়। কিন্তু যারা প্রবৃত্তির জিহ্বাকে আগুনের জিঞ্জির দেখিয়ে খামুশ

www.nagorikpathagar.org

করতে পারেন তাদের পক্ষে এ পথে চলা কঠিন নয় বরং সহজ। এই পথ যত কঠিন আর যত সহজই হোক না কেন মানুষ যে যা করবে সে তার প্রতিফল ভোগ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ বলেন– "যে ব্যক্তি কুফরী করেছে তার কুফরীর বোঝা তারই উপর ন্যস্ত আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করলো, সে নিজেদের কল্যাণে পুণ্য রাস্তা পরিষ্কার করল।" (সূরা-৩০ : ৪৪)

পাপাচার অকল্যাণের পথ প্রসারিত করে বা তৈরী করে। এ থেকে পাপ বা গোনাহের মিহি দানা তৈরী হয়। এই সত্তার আধিক্য হলে কল্যাণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য হলে যেমন পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে দূষণ ক্রিয়া শুরু হয় তেমনি পাপ সত্তা মানুষের পরপারের জীবন ব্যবস্থার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ বা গোনাহ কি জিনিস সে বিষয়ে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কল্যাণের পথে চললে কি হয় সে বিষয়ে আলোচনা করার পালা। তাই এ বিষয়টির উপর যথাযথ আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

রাতের নির্মল আকাশে তারাপুঞ্জের মেলা বসে। এই দৃশ্য দেখতে কি অপূর্বই না লাগে! কিন্তু যারা অন্ধ তাদের পক্ষে এই দৃশ্য দেখা সম্ভব হয় না। আমাদের ভালো মন্দ আমল থেকে কি হয়, তা যখন আমরা দেখতে পারি না, সে কারণে আমাদের চোখ থাকতেও আমরা অন্ধের মতো। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। তবে অন্ধের হাতে যদি লাঠি কিংবা শক্ত কিছু থাকে তাহলে সে আর এক অন্ধকে ধরে ধরে পথ চলতে পারবে। আমরা যদিও অন্ধ তবু আমাদের হাতে আছে কুরআন-সুন্নাহর মতো শক্ত লাঠি। তাই নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। রাসূল (সা) বলেছেন– "উত্তম চরিত্র ও আচার ব্যবহার দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল লুটে লয়।"

মন যখন সৎ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তখন দেহের যে অংশটি সে কাজ করবে তার মাঝে গতির সঞ্চার হয়, তখন দেহের ঐ অংশটি কাজের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। ফলে কাজটি করতে গিয়ে ঐ অংশের এক একটি সূক্ষ্ম তথ্যকণা বা ডি.এন.এ. কিছু তথ্য পাচার করে। এই তথ্যগুলো মৌলিকভাবে এক প্রকার শক্তি। এই শক্তির মাঝে মনের অভিব্যক্তি মিশে থাকে। ভালো আমলের মাধ্যমে যে জিনিস পাচার হয় সেই অদৃশ্য তথ্যকণায় থাকে আমলের সুকৃতি কিংবা মন্দ আমল হলে তাতে থাকে কর্মের দুষ্কৃতি। এগুলো বিনাশ হয় না, ধ্বংস হয় না।

www.nagorikpathagar.org

পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়, এক সময় এই বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে বৃষ্টির কণায় রূপ নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসছে। আমরা কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি। গাছপালা তা গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে। এভাবেই চলে প্রকৃতির নীতি চক্রের খেলা। কিন্তু আমাদের কর্মশক্তি কোনভাবেই পৃথিবীতে ফিরে আসে না, এই শক্তি যেন বিশাল শূন্য মণ্ডল গিলে ফেলে। কিন্তু এই শূন্য মণ্ডল-এর একটি কণাও হজম করতে পারে না। তাই এর বিনাশ নেই। ধ্বংস নেই।

আমাদের ভালো আচরণ থেকে সুকৃতির যে সত্তা পয়দা হয় এর নাম নেক বা সওয়াব। এই নাম ধর্মীয় পরিভাষার। এর রঙ উজ্জ্বল ও আলোকময়। তার গুণ চুম্বকপূর্ণ ও প্রশান্তিময়, তার মান উৎকৃষ্ট। একই জিনিসের ভাষাগত তারতম্য ও স্থান কালের ব্যবধানের জন্য ভিন্ন নাম হতে পারে। সেদিক থেকে নেক বা সওয়াবের সত্তাগুলোর নাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিভাষাগতভাবে ভিন্ন পরিচয় থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমরা নেক বা গোনাহর দ্বারা সরাসরি উপকার কিংবা অপকার কিছুই পাই না বলে পরিভাষাগত বৈষম্য থাকলেও আলাদা করতে পারি না। কাল হাশরে আমাদের আমলের সুকৃতি ও দুষ্কৃতিগুলোই নিজেদের সামনে হাজির করা হবে। আজ আমাদের থেকে যে তথ্য কণাগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো এই মৌলিক শক্তি কি না তাই বা কে জানে? তাছাড়া এগুলোর আর যাওয়ার জায়গাই বা কোথায়?

আল্লাহ বলেন– "যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক তবে শর্ত এই যে সে মুমিন হবে– তাহলে দুনিয়াতে তাকে পূত পবিত্র জীবন যাপন করায় এবং (আখেরাতে) এমন লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব।" (সূরা-১৬ : ৯৭)

"সেদিন তাদের স্বীয় জিহ্বা এবং তাদের হাত, পা, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে।" (আল-কুরআন)

মানুষের সকল কর্মের কর্মফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এ দুনিয়াতে দ্বীন ইসলামে অবিশ্বাসী অনেক লোকও সৎকাজ করে। তাদের এই সৎকাজ হয়তো তারা আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির লালসায় অথবা কুসংস্কার পূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে করে থাকে। তাদের এসব নেক আমল (সৎকাজ) কার্যত পরকালে নিজেদের কোন উপকারে আসবে না। তারা এর প্রতিদান আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। অথবা এর কোন বিনিময়ই তারা পাবে না। কিন্তু পাপ সত্তাগুলো জিয়ে থাকবে, তার ফলাফল তারা ভোগ করবে। সেজন্য নিয়ত ও ঈমান হলো নেক আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। নিয়ত বা ইচ্ছা যেখানে উদয় হয় সেটি এক

www.nagorikpathagar.org

জটিল জিনিস। একে না ধরা যায়, না স্পর্শ করা যায়। দুনিয়াতে এতো ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে মনের ভিন্ন প্রেরণা বা অভিব্যক্তি থেকে। মনের ভিন্ন গতিই কর্মকে এক করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, "যারা খোদার দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে তাদের সৎকাজগুলো হবে ভস্মস্তূপের ন্যায়। ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে প্রচণ্ড বায়ু বেগে সে ভস্মস্তূপ যেমন শূন্যে উড়ে যাবে ঠিক সে সৎকাজগুলোর কোন অংশেরই বিনিময় তারা লাভ করবে না। কারণ খোদার দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল।" (সূরা-১৪ : ৮)

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন– "হে ঈমানদারগণ তোমাদেরকে কি এখন একটা ব্যবসার কথা বলে দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে মাল ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম কর। যদি জানতে চাও তাহলে শুনে রাখ এই হচ্ছে তোমাদের জন্যে মঙ্গলদায়ক।" (সূরা-৬১ : ১০-১১)

যারা নবী, রাসূলগণের প্রদর্শিত পথে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান না মেনে দিক ভ্রান্ত নাবিকের মতো দুনিয়ার জীবন পাড়ি দিয়ে পরপারে চলে যাবে, আল্লাহ তাদের আমল সম্পর্কে আগাম খবর দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করেছ।" (সূরা-৪৬ : রুকূ-২)

মানব জীবনের আচার আচরণ থেকে যে দু'ধরনের সত্তা তৈরীর আভাষ পাওয়া যায় তার মধ্যে উত্তম আমলের সত্তা হলো সুকৃতিময়, উৎকৃষ্ট ও মঙ্গলদায়ক এবং পাপকর্মের সত্তা হলো দুষ্কৃতিময়, উত্তপ্ত ও কৃষ্ণবর্ণের ধূম্ররাশির মতো। এগুলো শীতল ও আরামদায়ক নয়। যা কিছু মঙ্গলদায়ক তা উজ্জ্বল ও প্রশান্তিময়। একেই নেক বা সওয়াব বলা হয়েছে। মানব জীবনের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা পরমাণুর গর্ভের সুস্থ আলোক উজ্জ্বল প্রসবিত সন্তান, যা তরঙ্গ ঝাঁক বা ঢেউয়ের আকারে অদৃশ্য হয়, একে যদি নেক বলা যায় তবে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের একটা সম্পর্ক পাওয়া যাবে। এই সম্পর্ক যুগান্তকারী এক মহামূল্যবান ইতিহাস সৃষ্টি করবে, যা চিন্তাশীল মানুষকে ভাবনার খোরাক যোগাবে। এ থেকেই বের হয়ে আসবে ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক তত্ত্ব।

আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তিতে সুকৃতি অথবা দুষ্কৃতি যাই থাকুক না কেন সেগুলো আমাদের অলক্ষ্যেই তরঙ্গ ঝাঁক বা ঢেউ এর ন্যায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বার বার সাগরের জলরাশির মতো জীবন নদীতে যে ঢেউ উঠে তার তর্জন-গর্জন

www.nagorikpathagar.org

কিনারায় ধাক্কা লেগে মিলিয়ে যায়। এই ঢেউগুলো দেহের অসংখ্য শিরা-উপশিরার আবরণ ছেদ করে তার সুকৃতি অথবা দুষ্কৃতির গন্ধ নিয়ে হারিয়ে যায় শূন্য সাগরের অতল তলে। অথচ আমরা এর কোন খবর রাখি না।

আল্লাহ বলেন– "অথবা (তাদের) ঐ আমলসমূহ এরূপ যেমন গভীর সমুদ্র তলে অন্ধকারপুঞ্জ এক প্রচণ্ড তরঙ্গ তাকে ঢেকে ফেলেছে, তার উপর আর এক তরঙ্গ, তার উপরে মেঘমালা (ফলে তথায় আলো পৌঁছতে পারে না) উপরে নিচে বহু অন্ধকার রাশি বিদ্যমান; যদি কেহ নিজের হাত বের করে তবে দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই আর আল্লাহ যাকে নূর দান না করেন তার জন্য নূর নেই।" (সূরা-২৪ : ৪০)

স্রষ্টার এই মহাবিশ্ব ব্যবস্থা একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতোই ধরা যায়। মানুষের অতীত বর্তমানসহ সকল ঘটনার তথ্য (আমলের সত্তা) ঐ কম্পিউটারের স্মৃতিফলকে (মেমোরীতে) সঞ্চিত হয়। কম্পিউটারের মেমোরীতে যেমন তথ্য কণার ঢেউ (তরঙ্গ) পুরে দেয়া হয়, তেমনি মানুষের ভালো-মন্দ আচার-আচরণের সত্তাগুলো মহাবিশ্ব ব্যবস্থার অতি প্রাকৃতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামের মেমোরীতে তরঙ্গের মতো নেচে দোলে, খেলে খেলে তাতে বন্দি হয়। একই মানুষের জন্য এই বিশ্ব কম্পিউটার প্রোগ্রামে দুইটি মেমোরী প্লেট থাকা বিচিত্র কিছু নয়। তার একটিতে থাকবে ভালো কাজের বিকীর্ণ সত্তার তথ্যকণা। আর অপরটিতে মন্দ কাজের তথ্যকণা। এই ব্যবস্থা এতো নিখুঁত যে, সেখান থেকে কোন তথ্যই হারানোর ব্যবস্থা নেই। আমাদের সারা জীবনের পাচার করা তথ্য কণাগুলো এই সকল মেমোরী প্লেট থেকে এক সময় সরবরাহ করা হবে।

আল্লাহ বলেন– দু'জন নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা প্রত্যেকের ডানে ও বামে বসে নিয়ন্ত্রণ করছে; মুখ থেকে এমন কোন কথাই বেরোয় না যে, কোন তত্ত্বাবধানকারী তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৈরী থাকে না।" (সূরা-৫০ : ১৭-১৮)

আলোক তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের ভিন্নতায় তার রূপ ও গুণের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে একই দ্রব্য সামগ্রীর উপাদান বিভিন্ন ডাইছে বা ফরমায় ঢুকিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতির দ্রব্য তৈরী করা যায়। মানব দেহ ইঞ্জিনের প্রতিটি কোষ পরমাণুর ফরমা দিয়ে যে শক্তি প্রসব হয় সেই সন্তান ভিন্ন আকার আকৃতির ও গুণের হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশ্বব্যবস্থা আলো আর অন্ধকারময় দুই বিপরীত ধর্মীয় সত্তায় গড়া। অন্ধকারপুঞ্জ এবং অন্ধকারের সত্তা সবসময়ই নিকৃষ্ট ও অকল্যাণকর। সেদিক থেকে আলোক ও আলোক সাদৃশ্য

www.nagorikpathagar.org

সত্তা উৎকৃষ্ট ও মঙ্গলদায়ক। ধর্মীয় পরিভাষায় এরূপ সত্তার নামই নেক। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোকতড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি মানব জীবনের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি। এই বিকীর্ণ কর্মশক্তির সাথে ধর্মীয় পরিভাষার নেক সত্তার সাদৃশ্যমূলক যুক্তির কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ-পুণ্যের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক যদি খুঁজে না পাই তাহলে সে কথা বলা হবে বাহুল্য মাত্র। সে জন্য বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক আছে কিনা, তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। অন্যথায় এ কথা, এ চিন্তা হবে মূল্যহীন ও অসার।

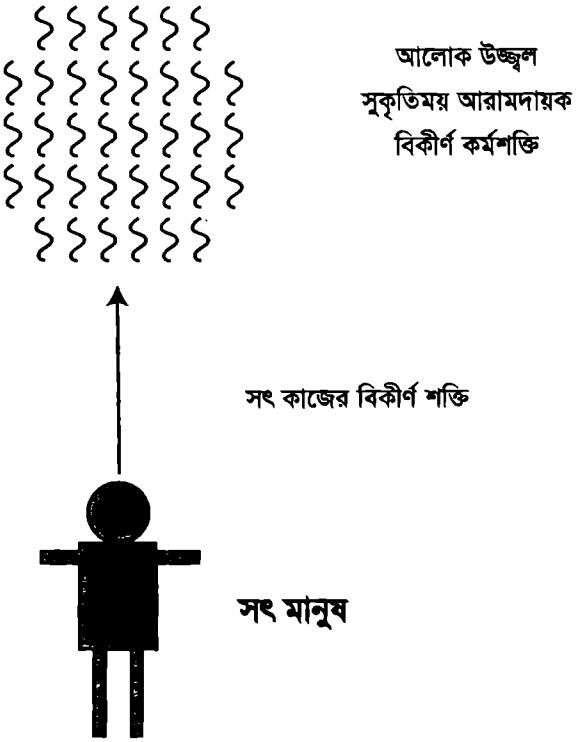

"সেদিন নিশ্চিতরূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অত:পর যার আমলের ওজন ভারি হবে, সেই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতি বরণকারী।" (সূরা আল-আরাফ : ৮-৯)

www.nagorikpathagar.org

বিকীর্ণ শক্তির সাথে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক

মানবদেহ যন্ত্রটি অসংখ্য জীবকোষের সমষ্টি। আত্মার বর্তমানে দেহযন্ত্রটির প্রতিটি জীবকোষের সূক্ষ্ম কণা ভৃত্যের মতো তার নির্দেশ পালন করে চলে। মনের ভালো-মন্দ সকল নির্দেশই সে মাথা পেতে নেয়। বিদ্যুৎ গতিতে দেহযন্ত্র তার চাহিদা পূরণ করতে সক্রিয় থাকে। ঘুম আসলেও আত্মার জন্য সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তবে দেহযন্ত্রটি খাদ্য ব্যতীত সক্রিয় থাকতে পারে না। খাদ্যের অভাব হলেই সে দুর্বল হয়ে যায়। সেজন্য খাদ্য তার জীবন রক্ষার বাহন। যখন সে আত্মার নির্দেশ পালনে ব্যতিব্যস্ত থাকে তখন তার উদরের শক্তি হজম হয়ে যায়। তার কোষ গহ্বরের ফাঁক দিয়ে সেই শক্তি ক্রমে ক্রমে প্রসব হয়। জন্ম নিয়েই সেগুলো মিলিয়ে যায় প্রকৃতিতে। আমাদের দেহ যন্ত্রের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে যে জিনিস প্রসব হয় সে সত্তা এক প্রকার জীবনী শক্তি। এই জীবনি শক্তিই কর্মের বিকীর্ণ সন্তান। মাতৃ গর্ভ থেকে জন্ম নেয় দুই বিপরীত ধর্মী সন্তান। এরা স্ত্রী ও পুরুষ জাত। এই দুই জাতের মধ্যে সাদা, কালো, সুন্দর, অসুন্দর, বিকলাঙ্গ কিংবা কুৎসিত ইত্যাদি রকমের হতে দেখা যায়। সেরূপে জীবকোষের গর্ভের প্রসব করা সন্তান দু'জাতেই হতে পারে। এরা স্ত্রী, পুরুষ জাত না হলেও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এ দুই প্রকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো ভালো মন্দ কর্মের বিকীর্ণ সত্তা। আর ধর্মীয় পরিভাষায় পাপ-পুণ্য দু'টি সৃষ্ট সত্তা।

নবী (সা) বলেছেন – "পাপ-পুণ্য দু'টি সৃষ্ট বস্তু।"

আল্লাহ বলেছেন– "তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে যেসব নেকী পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তা-ই পাবে। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন।" (সূরা-২ : ১১০)

মানুষের মন্দ আচার আচরণ থেকে পাপের সত্তা উৎপত্তি হয় এবং উত্তম স্বভাব, ঈমান ও সৎকর্ম থেকে পুণ্য সত্তা সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মানুষ কোটি কোটি মণ খাদ্য খেয়ে গোলা শূন্য করে ফেলে। এই খাদ্য ফলানো থেকে নিয়ে তা গুদামজাত করতে হাজার হাজার শ্রমিক প্রয়োজন পড়ে। বছরের পর বছর কত কোটি মণ খাদ্য যে এভাবে পয়দা হয় তার হিসাব রাখা কঠিন। কিন্তু আমাদের দেহযন্ত্রটি ঠিক রাখতে যে খাদ্য লাগে বা যে জ্বালানী প্রয়োজন হয়, সে তো ধীরে ধীরে কোষ গহ্বরের সাইলেন্সার পাইপ দিয়েই উধাও হয়ে যায়। এই নির্গত শক্তিকে কেউ মাথায় বোঝা বয়ে নিতে হয় না। একে যেন 'হা' করে গিলে ফেলে এই নির্বাক মহাশূন্য। এর জিহ্বা থেকে একটি সরিষা পরিমাণ কণাও হারিয়ে যায় না। কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ বলেন– "মাটি (মৃতদেহের) যা কিছুই খেয়ে ফেলে তা সব আমাদের জানা থাকে, আর প্রতিটি অণু-পরমাণু কোথায় আছে তা আমাদের গ্রন্থেও সুরক্ষিত রয়েছে।" (সূরা-৫০ : ৪)

সাদৃশ্যের বিচারের পাপ-পুণ্য যেমন অদৃশ্য তেমনি মানব জীবনের বিকীর্ণ সত্তাও অদৃশ্য। পক্ষান্তরে ধর্মের বিধানে যে জিনিসকে পাপ-পুণ্য, বলা হয়েছে এগুলোকেও আমরা দেখি না আবার আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তিও দেখা যায় না। এখানে দেখা যায় উভয় সত্তার মধ্যে পরিভাষাগত তারতম্য থাকলেও অদৃশ্যতাও দেখা না যাওয়ার সম্বন্ধ উভয়ের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। প্রসঙ্গত দেখা যায় আমরা দু'টি সত্তাকে যতই কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছি ততই যেন ব্যবধানের পর্দা ক্ষীণ হয়ে আসছে।

আমাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি এবং পৃথিবীর জড় পদার্থের বিকীর্ণ শক্তি কেউ ফিরিয়ে নেয় না। না সূর্য, না প্রকৃতি। শক্তির নিত্যতা সূত্রের বিধানে এদেরও ধ্বংস নেই। আবার পাপ-পুণ্য যে যা করে নিজের জন্যই করে। কারও বোঝা কেউ বহন করবে না। তুলনামূলকভাবে পাপ-পুণ্য ও বিকীর্ণ শক্তির ধ্বংসহীনতার নিয়ম একই পর্যায়ের। এখানেও তাদের অভিন্নার্থক সম্পর্ক। কোনটিরও ধ্বংস বা শেষ নেই। আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে, তার বোঝা তারই উপর ন্যস্ত; কেউ কারো বোঝা বহন করে না।" (সূরা-৬ : ১৬৪)

আল্লাহ অন্যত্র ঘোষণা করেছেন– "কিয়ামতের দিন আমরা নির্ভুল পরিমাপকারী দাঁড়িপাল্লা রাখবো। সুতরাং কোনো ব্যক্তির প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না। বরং একটি সরিষা পরিমাণ আমল হলে তাও আমরা নিয়ে আসবো। আর হিসাব করার জন্যে আমরাই যথেষ্ট।" (সূরা-২১ : ৪৭)

মানুষ ও পৃথিবীর অন্যান্য উপাদানের বিকীর্ণ সত্তার রঙ প্রধানত দু'ধরনের। যেমন একটি হলো কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং অন্যটি আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। অপরদিকে জাহান্নাম ও পাপের জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও যন্ত্রণাময় এবং জান্নাত বা পুণ্যের জগৎ আলোক উজ্জ্বল ও শান্তিময়। এখানে উভয় পরিভাষার সত্তার নামের ভিন্নতা থাকলেও রংয়ের বেলায় রয়েছে পরম দুস্তি। এসব সম্বন্ধ থেকে মন নামক রহস্য কুটিরে প্রশ্ন জাগে তাহলে বিকীর্ণ সত্তাই কি (?) পাপ-পুণ্য? এ সম্পর্কে পুরোপুরি উত্তর না দেওয়া গেলেও আমরা উভয়টির স্বভাব চরিত্র থেকে একটি সত্যকে আবিষ্কারের কিছু রসদ পাব, সে বিশ্বাস নেওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

আগুনের চরিত্র পোড়ানো, পানির চরিত্র ভিজিয়ে দেওয়া, জীবাণুর চরিত্র যন্ত্রণা দেওয়া। কিন্তু রহস্যের ব্যাপার হলো, আগুন আগুনকে পোড়াতে পারে না। পানি পানিকে ভিজাতে পারে না, জীবাণু জীবাণুকে যন্ত্রণা দিতে পারে না।

জীবন ও দেহের বৈষম্যমূলক সত্তা দিয়ে একে অপরের দ্বারা কষ্ট পায়, এটিই প্রকৃতির বিধান। অথচ কষ্ট দেয়া ঐ জিনিসের মৌলিক ধর্ম নয়। প্রকৃতির প্রচলিত নিয়মে একটি অপরটির চেয়ে বৈষম্যের হলেই একের দ্বারা অন্যজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আক্রান্ত হয়। মানুষ আর পশু এক শ্রেণীর জীব নয়। পশুরা নীতি কথা, ধর্মের কথা, স্রষ্টার কথা ভাবে না। কিন্তু মানুষ নিজের থেকেই এসব ভাবে কিংবা ভাবতে না চাইলেও ভাবনার উপাদানগুলো বিস্ময় সৃষ্টি করে তাকে ভাবিয়ে তোলে। এই মানুষই ভোগবাদী কু-প্রবৃত্তির শিকার হয়ে পশু-শ্রেণীর নিচে চলে যায়। মানুষের ঘরে মানুষ হলে মানব সমাজে বসবাস করার অধিকার রাখে। কিন্তু মানুষের ঘরে ভিন্ন প্রজাতির (পশুর শ্রেণীর) প্রাণীর জন্ম হলে তার সে অধিকার থাকে না। বরং এ থেকে সে যন্ত্রণাই পাবে, তাই মানব আত্মা কু-প্রবৃত্তির ব্যাধির শিকার হলে তার মুক্তির উপায় নেই। কারণ ভোগবাদী ব্যাধি তিলে তিলে তার আমলের সত্তাগুলো খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত আত্মার জন্ম দেয়া কোষ পরমাণুর সন্তান নিকৃষ্ট প্রজাতিই হবে। সেজন্য নীরোগ আত্মা ব্যতীত পরকালে মুক্তির উপায় নেই।

আল্লাহ বলেন– "যারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিষ্পাপ ও নিরোগ আত্মা নিয়ে যেতে পারবে তারা ব্যতীত আর কেউই মুক্তি পাবে না।" (সূরা-২৬ : রুকূ-৫)

পৃথিবীতে আমাদের আচার-আচরণ থেকে অন্য প্রজাতি বা সমগোত্রীয়রাও কষ্ট পেয়ে থাকে। এখানে কষ্ট দেওয়া তার মৌলিক ধর্ম না হলেও ভোগবাদী প্রবৃত্তি তার মৌলিক ধর্ম নষ্ট করে ফেলে। তাই চরিত্র হলো প্রবৃত্তির পরিমাপের মাপাকাঠি। প্রবৃত্তি সীমালঙ্ঘন করলে কিংবা ভোগবাদী হলে সে শ্রেণীর মানুষের কোন চরিত্র থাকে না। তারা পশুর শ্রেণীতে চলে যায়। এমনকি প্রবৃত্তির চরম দাসত্ব বরণ করলে মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অবদমিত প্রবৃত্তি মানুষকে বিবেক বুদ্ধিশীল বানায়।

বিপরীতে যারা ভোগবাদী প্রবৃত্তির দাসত্ব বরণ করে, তারা আল্লাহ, খোদায় বিশ্বাস করে না, পাপ-পুণ্য পুনরুত্থান, শেষ দিবসের বিচার আচারও বিশ্বাস করে না। ফ্রয়েড অবশ্য বলেছেন, অবদমিত যৌন কামনা বিভিন্নভাবে মানসিক বিশৃংঙ্খলা ঘটিয়ে উন্মাদ রোগের সূচনা করতে পারে। তার কথা হলো অতৃপ্ত

www.nagorikpathagar.org

যৌন কামনাই মানসিক অসঙ্গতির কারণ। কিন্তু তার এই যুক্তিহীন কথার মূল বিষয় হলো ভিন্ন। যেমন মানুষের কামনা ও আশার শেষ নেই। যার শেষ নেই, সীমা নেই, সেটি অসীম ও অফুরন্ত। কিন্তু মানুষ তো সসীম। সে হিসেবে তার প্রবৃত্তিকে অবদমিত রাখাই শ্রেয়।

কিন্তু যারা ফ্রয়েডের মতো ভোগবাগী মানসিকতায় ভোগে, তারা শেষ পর্যন্ত সীমাকে জয় করতে না পেরে প্রবৃত্তির উন্মদনায় পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়ে যায়। পরিণামে এসব ভোগবাদী প্রবৃত্তির নিকৃষ্ট মানুষের অন্তর ও দেহের প্রসবিত বিকীর্ণ কর্মশক্তি এমন এক নিকৃষ্ট সত্তায় পরিণত হয় যাকে তুলনা করা যায় মানুষের গর্ভ থেকে যেন সাপ বিচ্ছু জন্ম হওয়া। অর্থাৎ তাদের রোগাক্রান্ত আত্মার স্পর্শে বিকীর্ণ সন্তান হবে বিকলাঙ্গ, ধূম্ররাশির মতো কৃষ্ণবর্ণের। তাদের গায়ে থাকবে যন্ত্রণার কাঁটা।

দুনিয়ার জীবনে যারা ভোগবাদী, যারা সমকামী, যারা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত থাকে তারা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন, সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস ইত্যাদি। এসব ব্যাধিতে ভোগবাদীরা কষ্ট করে, যন্ত্রণায় কাতরায়। অথচ মুমিন বান্দারা এর ছোঁয়াই পায় না। দুনিয়ার জীবনে যেখানে ভোগবাদীরা নিজেদের আচার-আচরণের জন্য কষ্ট পায়, সেখানে তাদের উপার্জিত নিকৃষ্ট সন্তানগুলো কেন তাদেরকে যন্ত্রণা দিতে পারবে না? মানুষের আত্মা ও দেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান হলো প্রবৃত্তির অপূর্ণতা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি। কিন্তু এরা নিজের জন্য নিজেরা ক্ষতিকর নয়। তবে কেন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা? এর মূল কারণ হলো, মানুষের দেহকোষের সাথে রোগ জীবাণুর কোষের সাদৃশ্যহীনতা বা অমিল। তাই এদের দিয়ে মানব দেহ আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে রোগের ভিন্নতা সৃষ্টি হয় ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের গঠন ও তার চরিত্রের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

তেজস্ক্রিয়তা এক প্রকার বিকীর্ণ শক্তি। এই শক্তি জ্বালাময়। এবং সেটি সৃষ্টি সৃজনশীলতা ধ্বংস করে। বিদ্যুৎ পানি থেকে তৈরী হয়। এই শক্তি মানব জীবনের অনেক উপকারে আসে। সে অন্ধকার দূর করে। কিন্তু অন্ধকার কোন উপকার করতে পারে না। যেমন অন্ধকারে কেউ সজাগ অবস্থায় আরামে থাকে না। অপরদিকে অন্ধকার সুখের হলেও অসীম অন্ধকার কষ্ট দেয়। আবার অন্ধকারের উপাদানও মানুষকে কষ্ট দেয়। প্রত্যেক জিনিসের গতির ভিন্নতার জন্য তার কাঠামো, রূপ, গুণ, স্বভাবের পরিবর্তন হয়। পৃথিবীতেও এর প্রমাণ মিলে যেমন রিক্সা, জীপ, প্লেন ইত্যাদির গতির ভিন্নতার জন্য তাদের গঠন রূপ,

www.nagorikpathagar.org

গুণ ও স্বভাবের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মানুষের আচরণ স্বভাবের ভিন্নতার জন্য তা থেকে নিকৃষ্ট সত্তা প্রসব হতে পারে।

পক্ষান্তরে এই নিকৃষ্ট সত্তার কাছে যখন মানুষ ফিরে যাবে, তখন তার ঐ বৈরী সত্তা দিয়েই সে কষ্ট পাবে। একটি ভালো জিনিসের ভেতরে যখন খারাপ জিনিস (বৈরী সত্তা) ঢুকে তখন তার মূল স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। এর জন্য ভালোর কিছু কষ্ট হয়। যেমন কলেরা জীবাণু যখন সুস্থ মানুষের পেটে প্রবেশ করে তখন তার স্বাভাবিক আচরণের মাঝে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। অর্থাৎ তার বমি ও তরল পায়খানা আরম্ভ হয়। এতে শরীর ক্রমে ক্রমে পানি শূন্যতায় শুকিয়ে যায়। পরিণামে তার খিচুনী হয়, কষ্ট বাড়ে। একটি ভালো জিনিসের ভেতরে তার গঠন প্রকৃতির সাদৃশ্যহীন কোন খারাপ জিনিস ঢুকলে ভালো জিনিসের যেমন স্বভাবের পরিবর্তন হয় তেমনি একটি ভালো জিনিস খারাপ পথে চললে তার মাধ্যমেও মন্দ (নিকৃষ্ট) জিনিস সৃষ্টি হতে পারে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই সেরা জীব যখন পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়, তখন তার আচরণ থেকে তার মূল সত্তার বৈরী উপাদান জন্ম হয়। কিন্তু পরজীবনে সেই মানুষটি যখন সৃষ্টি সেরা জীব হিসেবে পুনরুত্থান হবে তখন তার দুনিয়ার জীবনের পাঠানো ঐ নিকৃষ্ট সত্তার গড়া নিবাসে তাকে জীবন যাপন করতে দেয়া হবে। এগুলো তার উপার্জিত সম্পদ হেতু সে এর বাইরে যেতে পারবে না। তখন ঐ বৈরী সত্তার সাথে জীবন বাসে সে কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে। আর মনে উদয় হবে অনুশোচনার তীব্র জ্বালা। যা মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক। এর মাধ্যমে কষ্ট পাওয়ার মূল কারণ হলো– ঐ নিকৃষ্ট সত্তাগুলোর জীবন ও দেহের প্রকৃতি, মানব জীবন ও তার দেহ প্রকৃতির সাথে বৈরী সম্পর্ক থাকা। সে কারণে ভোগবাদী মানুষের কষ্টের সীমা থাকে না। যে জীবন-বিধান মেনে চললে ভালো মানের সত্তা তৈরী হবে তার কথা পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল-কুরআনে তিনি ঘোষণা করেছেন– "আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র প্রকৃত ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা যা চিন্তাও কর্মের প্রণালী।" (আল-কুরআন)

আলো থেকে মানুষ যেমন কষ্ট পায় না, তেমনি আলোর সদৃশ কোন সুস্থ উপাদান থেকেও মানুষ কষ্ট অনুভব করে না। জান্নাত বা পুণ্যের জগৎ আলোক উজ্জ্বল ও কষ্টহীন। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্মশক্তিকে (ভালো মানের) ধরা যায়, আলোর তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। পৃথিবীতে যত ধরনের আলোকরশ্মি দেখা যায় সে সকল আলোকরশ্মির বর্ণ, গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর

www.nagorikpathagar.org

করে, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের উপর। মূলত গতির ভিন্নতার জন্যই রূপ, গুণ ও স্বভাবের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আসলে এই বিশ্ব জগৎ আলোর লীলা খেলা ও তরঙ্গ গতির নিপুণ চলাচলের ধাঁ ধাঁ।

সার্বিক অর্থে এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পাপ, পুণ্যের দানার সাথে মানব জীবনের বিকীর্ণ কর্মশক্তির কোথায় যেন একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আমরা বলি পানি বা জল, আবার কেউ বলে 'আব', কেউ বলে water। ভাষাগত ভিন্নতায় নাম ভিন্ন হলেও জিনিস কিন্তু এক ও অভিন্ন। সেরূপে সৃষ্টিকর্তা যে জিনিসকে গোনাহ (নিকৃষ্ট সত্তা) এবং পুণ্য (উৎকৃষ্ট সত্তা) বলেছেন, কে জানে বিজ্ঞানের ভাষায় সেই জিনিসের নাম, কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং আলোর তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি হয়েছে কি না? প্রকৃতপক্ষে বিকীর্ণ সত্তার সূক্ষ্ম দানাগুলো হলো অদৃশ্য ঢেউ বা তরঙ্গ কিংবা ইনফরমেশান বিট। সে যাই হোক জান্নাতের সাথে পুণ্য কণার যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি যদি আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তির সাথে জান্নাতের সম্পর্ক খুঁজে বের করা সম্ভব হয়, তাহলে বিকীর্ণ সত্তার সাথে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক পানি আর আবের মতোই মনে হবে।

জান্নাত ও পুণ্য সত্তার সম্পর্ক

দুনিয়ার যাবতীয় প্রাকৃতিক উপাদানের মূল মৌলিক কণাগুলোর কোনটিই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলেছেন, সুদূর অনন্ত অসীম ঠিকানায় কোন এক নির্জন পরিবেশে এই কণার জন্ম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চারটি মূল মৌলিক কণা ও চারটি মূল মৌলিক বল থেকে এই বিশ্বের বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। তারপর গতির ফলে সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয়ে যৌগিক কণার রূপ নিয়েছে। এভাবে এই সুন্দর বিচিত্রময় পৃথিবীর মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত অসংখ্য মাখলুক জন্ম হলো। এর কোথাও কোন তিল পরিমাণ অসংলগ্নতা নেই। বরং এর রয়েছে বিবেক বুদ্ধিশীল এক মহাপরিকল্পকের মহান পরিকল্পনার ছোঁয়া ও নিদর্শন।

এই পৃথিবী যতই সুন্দর হউক, তবু এর কোন কিছু চিরস্থায়ী নয়। এই আছে, এই নেই, সবকিছু জন্ম হয়ে হারিয়ে যাওয়ার তালে থাকে। মৃত্যুর স্বপ্ন অনেক কিছুকে করে দেয় ক্ষণস্থায়ী। হাজার হাজার বছরের পুরোনো অনেক কিছু এখন আর পৃথিবীতে নেই। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে সে যদি সবকিছু হজম করে ধরে রাখতে পারত, তাহলে এই পৃথিবীর বর্তমান আয়তন ফুলে ফেঁপে কোটি কোটি পৃথিবীর সমান হয়ে যেত। যেহেতু তার আকার আয়তন আগের মতোই আছে, তখন বলা যায় এই পৃথিবী কোন কিছু হজম করে রাখতে পারে না। তার মাতৃকোল থেকে অসংখ্যক রঙ বেরংয়ের সন্তান প্রসব হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়

www.nagorikpathagar.org

অসীম অরণ্যের শূন্য ভুবনে। এগুলো পৃথিবীর বস্তু কণার গর্ভ থেকে এবং তার পৃষ্ঠের যাত্রীদের মনন জগতের সীমাহীন বাসনার জরায়ু থেকে ও অঙ্গের কোষ বেষ্টনীর প্রসব রাস্তা দিয়েই জন্ম নেয়। এদের মধ্যে সুকৃতিময়, উজ্জ্বল, উৎকৃষ্টমানের মঙ্গলদায়ক যেসব সন্তানের জন্ম হয়, তারা মিলে মিশে যে উদ্যান বা বাগান সৃষ্টি করে, তার নাম জান্নাত। সেই বাগান বাড়ির মনোরম শোভা, পারফিউমের গন্ধ, আবে-কাউসারের সিগ্ধ পানির নহর, হুর, গেলমানের আতিথিয়তা সব মিলে পরম শান্তি সুখের সেই দেশে আলোর বন্যায় নিকৃষ্ট উপাদান বলতে সেখানে কিছুই থাকবে না।

তাই প্রেমক্রিয়ার পর ফরয গোসলের প্রয়োজন হবে না। রোগ বালাই ঝরা মৃত্যুর গন্ধ সেখানে থাকবে না।

প্রেম-ভালবাসা আনন্দ আর শান্তির সুগন্ধিময় বাতাসে সে বাগানবাড়ি থাকবে পরিপূর্ণ। এসব মনোরম জিনিসের উপাদান পৃথিবী থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়। সংগ্রহ করতে হয়, সৎকর্মের মাধ্যমে।

তাই জান্নাতের সাথে পৃথিবীবাসীর কর্মের বিকীর্ণ শক্তি ও তার আচার আচরণের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি মুছে ফেলে দেয়া যায় না।

মায়ের গর্ভ থেকে যেমন পৃথিবীর আলো বাতাসের গন্ধ পাওয়া যায় না তেমনি এই পৃথিবীর মৌলিক কণা যে কোথায় তৈরী হয়েছে তার খবর বলা যায় না। পক্ষান্তরে এই পৃথিবীর বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে সুদূর অনন্তে কোথাও কিছু সৃষ্টি হচ্ছে কি না তা বলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর আড়াল থেকে মৌলিক কণা সৃষ্টি হয়ে যেহেতু এই সুন্দর ভূতল সৃষ্টি হতে পেরেছে সুতরাং পৃথিবী থেকে কর্মের বিকীর্ণ সত্তা দিয়েও নতুন জগৎ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

আমাদের আত্মার অবর্তমানে জীবদেহ পচে গলে দুর্গন্ধের আখড়া হয়ে যায়। খোলা আকাশের নিচে তা পড়ে থাকলে বায়ু ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষিত হয়। পচনশীল জীবদেহে বাসা বাধে বেরাম জীব গোষ্ঠী। এই জীব গোষ্ঠী সেটিতে ডিম পেড়ে বংশ বিস্তার করে। সেগুলো ফুটে বাচ্চা বের হয়। এভাবে ঐ দেহটি তিলে তিলে তাদের খাদ্যের আখড়াতে পরিণত হয়।

জীবিত অবস্থায় কিছু মানুষ অচেতন পশুমনের স্তরের নিচে চলে যায়। এদের সচতেন মন তখন থাকে মৃত। এই চেতন মনের মৃত্যুতে তাদের মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে যায়। তখন এরা বিবেক শূন্য নিকৃষ্ট জীবাণুর শ্রেণীতে চলে যায়। এই সব নিকৃষ্ট মানুষ ভোগবাদী প্রবৃত্তির গোলাম বনে যায়। তখন তাদের আচার-আচরণ নিকৃষ্ট বেরাম গোষ্ঠীর চরিত্র ধারণ করে। এই শ্রেণীর মানুষের

www.nagorikpathagar.org

মনন চরিত্রের উপর শয়তানের আঁচড় লাগার ফলে এর সম্মিলিত প্রভাবে দেহ কোষ থেকে প্রসব হয় নিকৃষ্ট মানের এক উপাদান।

রাসূল (সা) বলেছেন– "কাফির বেঈমান হলো মুরদা আর ঈমানদার মুমিনগণ হলো যিন্দা।" রাসূল (সা) যা বলেছেন, এতে দেখা যায় কাফিরদের বিবেকশীল চেতন মনের মৃত্যুর কথাই ফুটে উঠেছে। কারণ ওরা প্রকৃতপক্ষে মৃত না হলেও তাদের চেতন মনের কোন সাড়া শব্দ থাকে না। পক্ষান্তরে বিবেকশীল চেতন মন যাঁদের সক্রিয় থাকে তাঁদেরকেই বলা হয়েছে যিন্দা। এই যিন্দা বা জীবিত রূহানী শক্তিধর মানুষের মন ও দেহে আশ্রয় নেয় খোদার গুণাবলীর অনুপম প্রেম-ভালবাসা, মানবতা আর খোদাভীরুতা। এই শ্রেণীর মানুষের থাকে মনুষ্যত্ববোধ। তাদের চেতন মন ও দেহের বিকীর্ণ কর্মশক্তি থেকে জন্ম নেয় উৎকৃষ্ট মানের উপাদান। এই উপাদান জ্ঞান, বিশ্বাস, নিয়ত ও কর্মের সমন্বিত অভিব্যক্তির ফসল।

আল্লাহ বলেন– "আল্লাহর কাছে তারাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম পশু, যারা কিছুই বুঝে না।" (সূরা-৮ : ২২)

আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন– "তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে যেসব নেকী পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তা-ই পাবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সবই দেখেন। (সূরা-২ : ১১০)

আমরা পৃথিবী নামের যে গোলক বৃত্তটিতে বাস করি, এখানে সূর্য উঠে, ভোর হয়। আবার সূর্য ডুবে, রাত হয়, নদ-নদীর স্রোতের মতো সময় বহে। এখানে জন্ম হলে মৃত্যু তার দরজার কাছেই বসে থাকে। তাই যৌবন জোয়ারে ভাটা পড়ে। আবার উষ্ণতায় নিজের মূর্তি ছেড়ে বাতাসের মুল্লুকে গা হেলে দিয়ে শীতল বায়ুর পরশ নেয়। কিন্তু যেখানে সূর্য উঠবে না, অস্ত যাবে না, সময় উঠা নামার যেখানে বালাই নেই, পূর্ণিমার রজনীর মতো ঘরময় আলোর ছুটোছুটি, যার উঠোন আর আকাশ আলোর বন্যায় স্নান করে সর্বদা থাকবে পূত-পবিত্র; যেখানে মৃত্যু নেই, ক্ষুধা নেই, রোগ যন্ত্রণার কোন উপাদান নেই; যেখানে দাস-দাসী আর মণি-মানিক্য খচিত বালাখানা শোভাবর্ধন করে আছে, সেখানে নেই কোন রন্ধনশালা, সেখানে প্রয়োজনবোধ হওয়ার সাথে সাথে সব প্রস্তুত পাওয়া যাবে। যেখানে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের প্রয়োজন হবে না, সেরূপ এক রহস্যময় জগতের কথা, তার সুখ-শান্তি আরামের মর্ম এই জরা-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের রঙ্গমঞ্চে বসবাস করে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা এমনি কঠিন যেমনটি হয় ধনীর বেলায় দরিদ্রের কষ্ট অনুভব করা।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক। এই জ্ঞান স্থান-কালের অধীন। সহজ কথায়, আমরা স্থান-কালকে হজম করতে পারি না। যেখানে যতদিন থাকি, যার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে, যে জিনিসের স্বাদ নিতে পেরেছি, সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটা ক্ষণিক ধারণা থাকে। তবে কষ্ট একবার পার হয়ে গেলে তা আস্তে আস্তে যেমন ভুলে যাই, তেমনি সুখের বিষয়ও ভুলতে শুরু করি। আবার একবার কষ্টে পড়ে গেলে পূর্বের আরাম আয়েশের খবর থাকে না। তবু পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট সুখ-দুঃখের উপাদান সম্পর্কে আমাদের একটা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি জ্ঞান আছে কিন্তু পরকালীন জীবন ব্যবস্থার সুখ-দুঃখের উপাদান পৃথিবীর আনাচে কানাচে না থাকায় সে সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া কষ্টকর। তবু বিশ্বাস করতে হবে।

মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম হয়ে যেরূপে এই পৃথিবীকে পেয়েছি, সেভাবেই একদিন মৃত্যুর দরজা পেরিয়ে আর এক নতুন জগৎ পাব। আজ যেমন পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, আরাম আয়েশ ভোগ করছি, সেদিনও এর কোন কমতি থাকবে না। পরকালীন সুখ ভোগের বাসর ঘর যে উপাদান দিয়ে তৈরী হবে তার নাম নেকী বা পুণ্য কণা। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে অনেকাংশে আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তির সাথে সাদৃশ্যমূলক ভাবা হয়েছে। এই উপাদান এই প্রকৃতির গর্ভ থেকেই সংগ্রহ করে পাঠাতে হয়।

আল্লাহ বলেন– "সেদিন প্রত্যেকেই তার কৃত নেকী এবং তার কৃত বদীকে উপস্থিত পাবে।" (আল-কুরআন)

নেকী আর বদী যে যাই করুক না কেন এই পৃথিবীই হলো তার কর্মক্ষেত্র। আবাদী ভূমি, চাষাবাসের স্থান। এখানে যা ফলানো হবে তা ওপার-জগতে গিয়ে মওজুদ পাওয়া যাবে। সেগুলোর ওজন হবে। প্রত্যক্ষ করা যাবে। নিজের কিনা তাও যাচাই বাচাই করা যাবে। তখন হয়তো অবাক হয়ে বলব জীবনে যা কিছু করেছি, সেখান থেকে কিছুই তো বাদ পড়েনি, খসে যায়নি। গোপনও রয়নি। অথচ আজ আমরা অনেকেই জীবনের সেই অতি মূল্যবান সময়, খেলার ছলে, তামাশার আড্ডায় বসে, নারী আর মদের গন্ধে ভুলে গিয়ে নষ্ট করে চলেছি। কোন দিন এ কথা ভেবেও দেখিনা কি করে নেকী অথবা বদ কণাগুলো এখান থেকে উড়ে যায়?

আল্লাহ বলেন– "তোমরা নেক কাজ করলে নিজেদের জন্যেই করবে আর দুষ্কার্য করলে তাও নিজেদের জন্যে করবে।" (সূরা-১৭ : ৭)

মাটি আর আকাশ আমাদের অনেক কিছুই গিলে ফেলে। প্রাথমিক অবস্থায় মাটি কিছু হজম করলেও সে আবার অন্য সময় ঐগুলোই বমি করে দেয়। কিন্তু আকাশ কিছুই হজম করতে পারে না। আমাদের নেকী আর বদ কণাগুলো

www.nagorikpathagar.org

এমনভাবেই পালায় যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এর বাতাস কিংবা ঝাঁঝও আমরা টের পাই না। এগুলো বেতার তরঙ্গের সুপ্ত ঢেউ কিংবা টিভির বিদর্শন বিন্দুর ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে তরঙ্গের স্রোতের মতো উড়ে যায়। এক ঝাঁক সাদা বক যেভাবে গোধূলীর আকাশ পাড়ি দিয়ে তার আশ্রয় ঠিকানার দিকে উড়ে চলে, সেভাবেই আমাদের কর্মের বিকীর্ণ সত্তাগুলো ডানাওয়ালা পাখির মতো অনন্ত আকাশের দিকে নিজের ঠিকানা পাওয়ার আশায় স্পন্দিত গতির তালে তালে অথবা ঢেউ খেলে খেলে অদৃশ্য তথ্য মূর্তি ধরে উড়ে যায়।

জান্নাতের বাগান যে কী দিয়ে তৈরী হবে তা তো এখান থেকেই যোগাড় করে বাতাসের প্রাচীর, ওজন স্তরের বেষ্টনী আর সীমাহীন শূন্যভূমি পাড়ি দেয়ার মতো গতি দিয়ে, ঐশী আকর্ষণের মতো চুম্বকত্ব গুণের সুবাস মেখে, বেতার তরঙ্গের মতো ডানা পরিয়ে, ফ্রিকোয়েন্সী নামক উচ্চ ক্ষমতার তড়িৎ ঝাঁকুনি দিয়ে পাঠাতে হবে। এরূপভাবে পাঠাতে পারলে স্রষ্টার মহা ডিশ এ্যান্টেনায় ধরা পড়বে।

আল্লাহ বলেন– "তোমাদেরকে কি তোমাদের আমল ছাড়া অন্য কোন জিনিসের দৃষ্টিতে প্রতিফল দেওয়া হবে?" (সূরা-২৭ : ৯০)

জান্নাতের সাজ-সজ্জা, শোভা, রূপ-সৌন্দর্য, পানীয়, ভোগ বিলাসের সর্বময় উপকরণ সবই তৈরী করা হবে প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার জীবনের পাঠানো নেকী দিয়ে। যে যেমন নেকী সংগ্রহ করবে তার চির বাসস্থান সে মতোই সাজানো হবে। যাদের কোন নেকী থাকবে না তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন "তাদের জন্য আমার নিকট হতে নেকী নির্ধারিত ছিল, তারা জাহান্নামের আযাব হতে দূরে থাকবে। যারা দোযখের আযাবে গ্রেফতার থাকবে তাদের চিৎকার ও ক্রন্দন এরা শুনতে পাবে না। অধিকন্তু তাদের মন যা চাইবে বেহেশতের মধ্যে তারা তাই পাবে।

তাদের সুখ অনন্তকাল স্থায়ী হবে। কোনরূপ ভয় আতঙ্ক তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ফেরেশতাগণ এসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবে আল্লাহ তোমাদের নিকট যে দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন তা হলো এ দিন।" (২১০ : ১০১-১০৩)

বাতাস না বইলে যেমন পানিতে ঢেউ বা তরঙ্গ উঠে না তেমনি সৎকাজের নিয়ত ও সৎকর্ম না করলে নেকী হবে না। পক্ষান্তরে নেকী না পাঠালে জান্নাতে বাড়ি উঠবে না, সুস্বাদু পানীয়ের নহর সৃষ্টি হবে না। হুর-গেলমানের আতিথিয়তা পাওয়া যাবে না, সর্বোপরি ভোগ বিলাস, আনন্দ ভালোবাসার সাগরে ঢেউ উঠবে না; সুখ আসবে না, বাড়িতে জ্যোৎস্নার আলো ফুটবে না। তাই জান্নাতের পরতে পরতে তার শিরায় শিরায় রয়েছে পুণ্যবান বা নেকীর সুকৃতি, আছে তার নিগূঢ় সম্পর্ক।

www.nagorikpathagar.org

জান্নাত আর জাহান্নাম মানুষের কর্মের প্রতিফলের জগৎ। পুণ্য কণার সাথে যেরূপ রয়েছে জান্নাতের সম্পর্ক তেমনি পাপ কণার সাথে রয়েছে জাহান্নামের মিল। এই পাপ কণাগুলোও পৃথিবীর পেট থেকে জন্ম হয়। কিন্তু এগুলো প্রসব করে মানুষ নামের ভোগবাদী প্রবৃত্তির নিকৃষ্ট জীবগণ। এরা নামে আর গঠনে মানুষ হলেও তাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে গঠিত হবে জাহান্নাম। অতএব জেনে বুঝে সে পথ পরিহার করাই উত্তম।

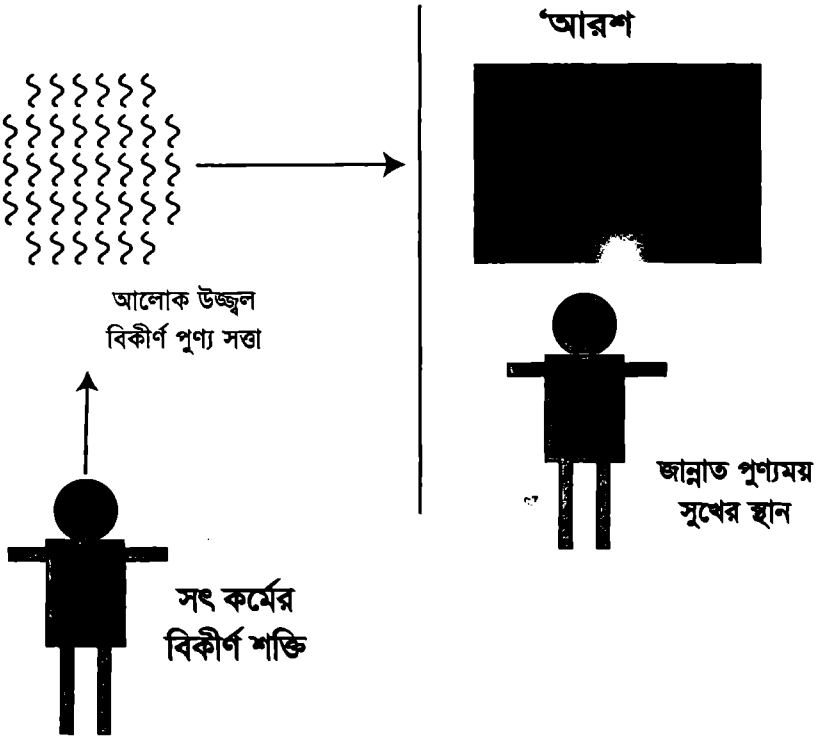

"কিয়ামতের দিন মানুষ সৎ কর্মের ফল প্রস্তুত দেখতে পাবে।" (আল-কুরআন)

"তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে যেসব নেকী পাঠাবে আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তাই পাবে।" (আল-বাকারা : ১১০)

"নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে বড়ই আনন্দে। উঁচু আসনে বসে দেখতে থাকবে। তাদের চেহারায় তোমরা সচ্ছলতার দীপ্তি অনুভব করবে।" (সূরা আল-মুতাফফিফীন)

www.nagorikpathagar.org

জাহান্নাম ও পাপ কণার সম্পর্ক

জাহান্নাম পাপিষ্ঠ ইবলিস, জ্বীন ও মানব গোষ্ঠীর চিরস্থায়ী বাসস্থান। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার আইনের শৃঙ্খলার পতন হলে, প্রকৃতি যখন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে সব ধ্বংস করে মহাপ্রলয়ের মহাআক্রোশে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে শান্ত হয়ে যাবে, তখন আবার এক বিশাল মাঠ (হাশরের মাঠ) গজে উঠবে। যেভাবে বীজতলায় চারা গাছ গজায় সেভাবেই মানুষ নামের জীবকুল সেখানে গজাবে। যারা দুনিয়ার মাটিতে জীবন নিয়ে একদিনের জন্যেও পা রেখেছিলো তাদের কেউ সেদিন উঠার বাকি থাকবে না। সবাই বিবস্ত্র বিস্ময় চিত্তে হা-হুতাশ করতে থাকবে। বিচারের ঘণ্টা ধ্বনি বেজে উঠলে, সারিবদ্ধভাবে মিজানের পাল্লায় সবার নেকী, বদ আমল ওজন করা হবে। সেদিন যাদের পাপের বোঝা ভারি হবে, তাদেরকে জাহান্নাম নামের এক জেলখানায় বাস করতে হবে।

জাহান্নাম পাপীর কর্মের প্রতিফলের জগৎ। এ জগৎ জ্বলন্ত অগ্নি ও বিষধর সাপ বিচ্ছু ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। সেখানে আযাব দেয়ার মতো, কষ্ট দেয়ার মতো, অগণিত রঙ-বেরংয়ের যন্ত্রণার দানা থাকবে, থাকবে দুনিয়ার জীবনের ভ্রান্ত দর্শনে পথ চলার মানসিক অনুশোচনা যা শারীরিক আযাব বা কষ্টের চেয়েও অপরিসীম কষ্টদায়ক। তৎস্থানের সাপ বিচ্ছুগুলো প্রতি মুহূর্তে জাহান্নামবাসীকে দংশন করবে। তাদের দংশনের যন্ত্রণা এতো ভীষণ হবে, যা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ বা কঠিন। বলা হয় এসব সাপ বিচ্ছু একবার দংশন করলে শত শত বছর পর্যন্ত তার যন্ত্রণার যাতনা কাটবে না। সেখানে আযাবের যে সকল ফেরেশতা রয়েছে তারাও প্রতি মুহূর্তে দোযখীদের যন্ত্রণা দিতে থাকবে। এসব যন্ত্রণার মাঝে কারও মৃত্যু হবে না কিংবা আযাবের পরিমাণও কমতে দেয়া হবে না। যদি কমতেও থাকে তাহলে তার আযাব আবার বাড়িয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহ বলেন– "দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে একবার তাদের শরীরের চর্ম শেষ হয়ে গেলে পুনরায় সেখানে নতুন চর্ম উৎপন্ন করে দেয়া হবে।"

আল্লাহ অন্যত্র ঘোষণা করেছেন– "কাফেরগণ অনন্তকাল দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে, তা কখনো শেষ হবে না এবং বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। সুখ-শান্তির লেশমাত্রও সেখানে অবশিষ্ট থাকবে না।" (সূরা বাকারা : ৮৬)

মহাযন্ত্রণার সাগরে পাপীরা অনন্তকাল সাঁতার কাটতে থাকবে। অসহ্য যন্ত্রণার

www.nagorikpathagar.org

মাঝে সাঁতার কাটতে কাটতে মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ জানাবে, তবু মৃত্যু হবে না, জীবন বায়ুও বের হবে না।

এই পৃথিবীতে একই সূর্যের তাপ, বাতাসের শীতলতা, কদর, নেক্‌কারগণ যেমন ভোগ করেন, বদকাররাও তেমনি তার থেকে স্বাদ, গন্ধ, আলো-বাতাস ভোগ করে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নেক্‌কার ও বদ উভয়েই থাকতে পারে, তারা এখানে একত্রেই বসবাস করছে। পরম সঙ্গতার সময় নেকী বদির সোহাগ আদর নিচ্ছে, কামনার সাগরে দু'জন অনেক সময় এক হয়ে যেতেও আকুতি প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু পরজীবনের বিশ্বব্যবস্থার আইন হবে ভিন্ন ধাঁচের। সেখানে পাপীর জাগায় পাপীরা থাকবে আর নেকীর জায়গায় থাকবে শুধু নেক্‌কারগণ।

এ মাটির রাজ্যেও বিচার ব্যবস্থার নীতিমালা আছে, আছে জেলখানা, আছে হাজতখানা। এখানের বিচার ব্যবস্থার নীতিমালার দানাগুলো দোষী ব্যক্তির নিজের হাতে গাঁথা থাকে না। এর কোনটিও সে তৈরী করে না। কিন্তু পরজীবনের শাস্তির দানাগুলো পাপীর নিজের তৈরী। তার কর্মের সত্তা। তাই সেখানের বিচার ব্যবস্থার জন্য সালিশ দরবার বসাতে হবে না। তার আমলই তাকে তার উদরে টেনে নিবে। সেজন্য সে বিচার ব্যবস্থা অতি নিখুঁত ও সূক্ষ্ম। দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে থেকে মানুষ যা কিছু পয়দা করে পাঠাবে, সেখানে সে তারই প্রতিফল ভোগ করবে। সে কারণেই কেউ তার কর্মের বেশি ভোগ করবে না আবার কাউকে কমও দেয়া হবে না। কাল হাশরে মানুষ নিজের কর্মলিপি চিনে নিবে। তাই প্রতিবাদ করার কোন ভাষা তাদের থাকবে না।

আল্লাহ ইরশাদ করেন– "যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে তার ফল পাবে এবং যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ বদকাজ করবে, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে।" (আল-কুরআন)

আল্লাহ অন্যত্র ঘোষণা করেছেন– "সেদিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্যে পৃথক পৃথকভাবে বেরোবে। অতঃপর যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।" (সূরা-৯৯ : ৬-৮)

"সেদিন নিশ্চিতরূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতঃপর যার আমলের ওজন ভারি হবে, সে-ই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতি বরণকারী।" (সূরা-৭ : ৮-৯)

www.nagorikpathagar.org

মানব জাতির মন্দ স্বভাবের কর্মের প্রতিফলের জগতের নাম জাহান্নাম। জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট জগৎ বলে তাদের মন্দ আচার আচরণের সত্তাগুলোও নিকৃষ্ট। এই নিকৃষ্ট সত্তার নাম পাপ কণা বা গুনাহ। এগুলো জাহান্নাম তৈরীর মৌলিক উপাদান।

দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর সূক্ষ্ম কণার মাঝে যেমন তার গুণাগুণ মওজুদ থাকে তেমনি জাহান্নামের মৌলিক উপাদানের মাঝে মানব মনের অভিব্যক্তির দোষ-গুণ হাড়ে হাড়ে মওজুদ থাকবে। মেলালিন স্টিমোলেটিং হরমোনের প্রভাবে মানুষের গায়ের রঙ কালো হয়। বংশগতির ধারায় মাতা-পিতা থেকে তার প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। সেজন্য কালো মাতা-পিতার সন্তান প্রকৃতির নিয়মেই কালো হয়। আমাদের নিকৃষ্ট আচার-আচরণের সত্তাগুলোতে চরিত্র ও গতির যে ছাপ বা প্রতিক্রিয়া পড়বে তাতে তার গুণাগুণ নিকৃষ্ট ও দুষ্কৃতি পূর্ণ হবে। জীবন নদীর মাঝে উত্তাল তরঙ্গ উঠলে তা যদি নিয়ন্ত্রণহীন হয়, তবে এর বৈরী প্রভাবে দেহকুলের শিরা উপশিরার সূক্ষ্ম সত্তা ধূম্ররাশির মতো ঘোলাটে হয়েই বিকীর্ণ হবে। মনের অভিব্যক্তির কণাগুলো কালো কুৎসিত পাখির মতো উড়ে যাবে। এ সত্তা দিয়েই তৈরী হবে জাহান্নাম। তাই পাপ কণার সাথে জাহান্নামের যেমন সম্পর্ক তেমনি দুনিয়ার অসৎ জীবন ব্যবস্থারও রয়েছে নিগূঢ় সম্পর্ক। এ কারণে জীবনকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা ঠিক নয়।

ভেবে চিন্তে সঠিক পথ বা রাস্তা চিনে শক্তভাবে হাল ধরে জীবন সাগর পাড়ি দিতে হবে। ঝড়-ঝঞ্ঝার মতো শত প্রতিকূলতার মাঝেও হাল ঘুরানো উচিত নয়। জীবন নদীতে যতই জোয়ার আসুক না কেন বাঁধ ভাঙ্গতে দেয়া উচিত হবে না। কোনভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রান্ত পথে হাল ধরে বসে থাকলে জীবনী শক্তি বা কর্মশক্তি যাই বলি না কেন তা হারিয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, উথলিয়ে উপচিয়ে পড়বে গিয়ে অশান্ত সাগরে, অন্ধকার কূপে, জীবাণুর নর্দমায়, বিষাক্ত গ্যাসময় দরিয়ায় বা দুর্গন্ধময় বায়ুর অতল গহ্বরে। সে সাগর, সে দরিয়া, চির অন্ধকার নিশি দ্বীপের মতো গহিন ও যন্ত্রণাময়। এ সাগরের জলরাশি বা উপাদান ঘোলা, দূষিত জীবাণুতে পরিপূর্ণ ও কৃষ্ণ বর্ণ। এই জলরাশি বাঁধ ভাঙ্গা জীবন নদীর তলিয়ে যাওয়া এলোমেলো ঢেউ বা তরঙ্গ মিশ্রিত ফেনার মতো। এর আবরণ বা গায়ের রঙ আলকাতরা বা গায়ের কালো বোরকার মতো।

www.nagorikpathagar.org

অক্সিজেন হাইড্রোজেন মিলে যেমন পানির দানা তৈরী হয়েছে তেমনি জাহান্নাম হলো কর্মের উৎপাদিত বিভিন্ন যৌগিক উপাদানের জগৎ। সে জগতে যে উপাদান আছে সেগুলো হলো বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের এবং মনের পাঠানো সূক্ষ্ম ঢেউ থেকে তৈরী। এগুলো পৃথিবীর টেলেক্স ও ফ্যাক্স-এর সাংকেতিক তরঙ্গ বার্তার মতো পাঠানো হয়ে থাকে। একে বলা যায় জীবন যাত্রার জ্বালানী ধোঁয়া বা কিরণ। ধোঁয়ার রঙ কৃষ্ণ বর্ণের বা আলকাতরার মতো। এগুলো জাহান্নাম নামের দ্বীপচরের প্রতিটি পরতে পরতে মিশে থাকবে। মহামহিয়ান স্রষ্টা তাঁর বান্দাদেরকে সে দিনকার মহাবিপদ সংকেত পাক কুরআনের অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন– "যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহ হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই, তাদের মুখমণ্ডল যেন রাতের অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত, তারা জাহান্নামের অধিবাসী, যেখানে তারা স্থায়ী হবে।" (সূরা-১০ : ২৭)

পৃথিবীতে জেলখানার চারদিক উঁচু দেয়াল দ্বারা ঘেরা থাকে, এর ভেতরে হাজতীরা বাস করে। তাদের খানাপিনা বাইরে থেকে সাপ্লাই হয়। এগুলো অন্যেরা ফলায়। তাদের শাস্তির মাঝে বড় কষ্ট হলো পরিবার পরিজনহীন নিঃসঙ্গতা। তাছাড়া সেখানে অনেক সুখেই তারা থাকে। তাদের জীবন একদিকে ভাবনাহীন। তাদেরকে জেলরক্ষিরা সকল সময় মারধর করে না। স্বাস্থ্যের অনুপযোগী খাদ্যও খেতে দেয় না। তারা রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পেলে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করানো হয়। এসব কোন কিছুই তাদের নিজের তৈরী নয়। কিন্তু পরকালের জেলখানার খানাপিনা মানুষের কর্মফলের সত্তা দিয়েই তৈরী হবে। যন্ত্রণার দানাগুলোও তার উপার্জিত। খাবারের বিস্বাদময় দানাগুলো এবং রোগ বালাইয়ের জীবাণুগুলোও তার কামাই। এগুলো সে এ পৃথিবী হতেই ওয়াগন বোঝাই করে পাঠিয়ে দেয়।

সুতরাং অসৎ আচরণের সাথে পাপ কণার যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি তার সাথে রয়েছে জাহান্নামের গভীর প্রেম। প্রত্যেক জিনিসের কলেবর বৃদ্ধি করলে একই কথা বার বার এসে যায়। তাই এর সমাপ্তির শেষে আমাদের জানা উচিত পাপ-পুণ্য হয় কোন পথে।

www.nagorikpathagar.org

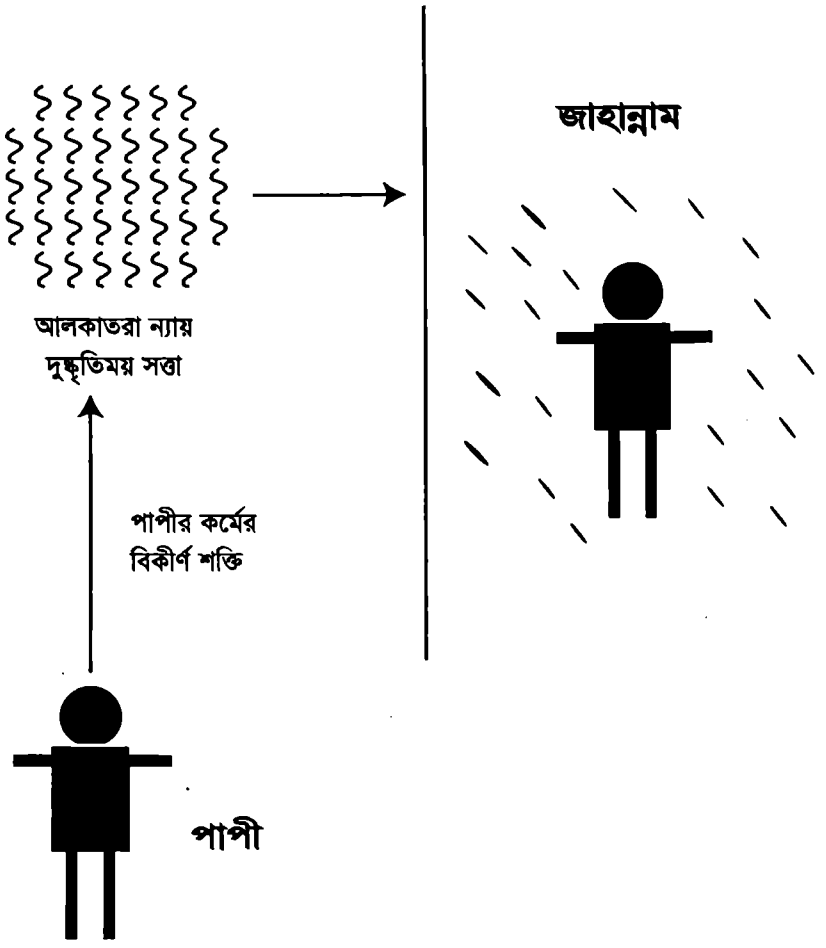

"(তাদেরকে সে দিনের ভয় দেখাও) যেদিন যমীন ও আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ করে দেয়া হবে। তারপর সকলেই মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাতে পায়ে শিকল পরা এবং আরামহীন অবস্থায় হাজির হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা পাপীদেরকে দেখবে আলকাতরার পোশাক পরিধান করে আছে। আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমণ্ডলের ওপর ছড়িয়ে থাকবে। এটা এজন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। আল্লাহর হিসাব নিতে বিলম্ব হয় না।" (সূরা ইবরাহীম : ৪৮-৫১)।

www.nagorikpathagar.org

পাপ-পুণ্য হয় কোন পথে

পথ বা রাস্তা যদি সরল সোজা ও মসৃণ হয় তাহলে চলতে কোন বাধা বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। চলার জন্য রাস্তা যেমন সরল সোজা ও মসৃণ থাকা চাই তেমনি গতি থাকা চাই ধীর স্থির ও পরিমাপ মতো। আঁকা বাঁকা পথ, সীমালঙ্ঘনশীল বা পরিমাপহীন গতি, উদ্দেশ্যহীন যাত্রা, এসব আলামতের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোন মেশিনারীজ যন্ত্রযানের গতি সীমার একটা নির্দিষ্ট কেপাসিটি থাকে। এ কেপাসিটি নির্মাতা বেঁধে দেন। কেটালগ বা গাইড বুকে সেই নিয়ম-নীতির কথা লেখা থাকে। এতে থাকে যন্ত্রের যান্ত্রিক নিয়মাবলীর যাবতীয় দিক নির্দেশনা। চালকের জন্য সে নির্দেশ মেনে চলা ফরয।

আমরা পৃথিবী নামক যে ভূতলটি চষে ভোগ করছি, সেই রাজ্যে কোন জিনিসই স্থির নয়। পৃথিবী ঘুরছে, চন্দ্র, সূর্যসহ অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করছে। আপন অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য এবং নিজ নিজ কর্ম প্রেরণার দায়ভার মিটানোর জন্য কেউ এখানে বসে থাকে না। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী যদি না ঘোরে, না সন্তরণ করে, তাহলে সে আকাশের কোল থেকে ছিটকে পড়বে। এমন হলে তারা কোথায় যে হারিয়ে যাবে তার কোন ঠিকানা বলা যাবে না। আবার যাদের পেট আছে তারা যদি বসে থাকে– হাত, পা, মুখ না নাড়ে তাহলে যেমন তার খাদ্য যোগাড় হবে না, তেমনি খাদ্যও পেটে যাবে না। পরিণামে ক্ষুধার জ্বালায় শুকিয়ে মরতে হবে। তাই গতির জগতে কেউ গতিহীন বা কর্মহীন থাকতে পারে না। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি যে ঘুরছে, তাদের গতির একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বা সীমা আছে। কখনো তারা এই পরিমাপ বা সীমা অতিক্রম করতে পারে না, সীমালঙ্ঘনকারী হয় না। প্রতিদিন তারা একই নিয়মে সন্তরণ করে। ব্যতিক্রম বা বন্ধনহীনতার কোন রোগ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। জড়পিণ্ডের ভেতর কিংবা বাইরের গতিতে তাদের কোন স্বাধীনতা নেই। তারা যদি নিজেদের খেয়াল খুশি মতো থাকতে চেষ্টা করতো কিংবা তাদের যদি স্বাধীনতা থাকত, তাহলে এই সুন্দর আকাশের পতন অনিবার্য ছিল। এতে তাদের বিপর্যয়ের পরিণতিতে ঘূর্ণিঝড়ের মতো সকল কিছুর শান্তি বিনাশ করে দিত। ফলে সৃষ্টির স্থায়ীত্বের মাঝে করুণ পরিণতি দেখা দিলে, এই সুন্দর আকাশ, গ্রহ নক্ষত্রের সন্তরণ কিছুই টিকে থাকত না।

তাই মহাবিশ্ব ব্যবস্থায় জড়পিণ্ডের গতি তাদের মর্জির উপর বেধে দেয়া হয়নি। এদের গতি প্রকৃতির স্রষ্টা নীতিগতভাবে যেভাবে বেঁধে দিয়েছেন তারা এর ব্যতিক্রম করে না। বিশ্বব্যবস্থার প্রকৃতির নীতি আপনা থেকে সৃষ্টি হয়নি। তার রয়েছে একজন স্রষ্টা। বিশ্বের মহামহিয়ান স্রষ্টাই প্রকৃতির মাঝে গতির ঘণ্টা বেঁধে

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন। এই ঘন্টা স্থির না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো একই নিয়মে সাঁতরাতে থাকবে। আল্লাহ বলেন– "তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে একটি বিশেষ আইনের অধীন করে দিয়েছেন। এসবই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে।" (সূরা-১৩ : ২)

মানুষ নামের বিবেক বুদ্ধিশীল প্রাণীর দেহযন্ত্র ও তার মন এক রহস্যময় গতির অধীন। এ রাজ্যে কেউ গতিহীন নয়। মানুষের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ গতিশীল হয়েই করতে হয়। সাধারণ অর্থে কোন কিছু করাকে বুঝায় কাজ। এই কাজ গতির পরিণত রূপ। বিজ্ঞানের ভাষায় বল প্রয়োগে স্থির বস্তু গতিশীল হওয়া অথবা গতিশীল বস্তুর স্থির হওয়াকে বুঝায় কাজ। মানুষের কাজ-কর্ম হলো তার আচার আচরণ বা স্বভাবের ক্রিয়া। বল হলো বাহ্যিক কারণ যা পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চেষ্টা করে। এই বলকে পরিমাপ করা যায় যেমন বল (F) = ভর (m) x ত্বরণ (f)। ত্বরণ হলো নির্দিষ্ট সময়ে গতি বৃদ্ধির হার। বলের পরিমাপ থেকে কাজেরও পরিমাপ করা যায়। যেমন কাজ (W) = বল (F) x সরণ (S)। সরণ হলো একক সময়ে দূরত্বের হার।

সুতরাং বলের পরিমাপ এবং বলের ক্রিয়া রেখা বরাবর প্রয়োগ বিন্দুর সরণের (দূরত্বের) মানের গুণফলই হলো কাজের পরিমাপ। এই উদাহরণের আলোকে বলা যায় মানব জাতির কাজ-কর্ম, আচার আচরণও পরিমাপহীন থাকতে পারে না। এগুলোরও ওজন করা হবে। মহাবিজ্ঞানী খোদার প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানের পাল্লায় মানব জাতির কর্মফল ওজন হবে। আল্লাহ বলেন– "সেদিন নিশ্চিতরূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতঃপর যার আমলের ওজন ভারি হবে সে-ই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতি বরণকারী।" (সূরা-৭ : ৮-৯)

"বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, এ নামায়ে আমলে ছোট বড়ো কোন গোনাহ অলিখিত নেই।" (সূরা-১৮ : ৪৯)

কাজ করতে হলে সবার বেলায়ই শক্তি প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। যেভাবে কাজ ও বলকে পরিমাপ করা যায় সেভাবে কাজের পরিমাপ থেকে শক্তির পরিমাপ ও তার হিসাব নিকাশ করা সম্ভব। পৃথিবীতে যার গায়ে শক্তি বেশি, সে ইচ্ছা করলে অন্যের তুলনায় বেশি কাজ করতে পারবে। যান্ত্রিক যান গতি ও শক্তি পায় পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদি থেকে, আর মানুষ শক্তি পায় খাদ্য থেকে। এই শক্তি স্থির অবস্থায় তার দেহে মওজুদ থাকে।

পৃথিবীর সকল কিছুর শক্তির উৎস হলো সূর্য। এ সৌর শক্তি বিভিন্নভাবে পদার্থের কঠিন আবরণ ভেদ করে তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে। যন্ত্রে যে শক্তি নেয়া হয়

www.nagorikpathagar.org

তাকে বলে যান্ত্রিক শক্তি। মানব দেহ যন্ত্রেও যান্ত্রিক শক্তি থাকে। স্থির অবস্থায় এই শক্তির পরিমাপ করা কঠিন। তাই যান্ত্রিক শক্তির প্রকাশ ঘটে গতি শক্তি ও স্থিতি শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে। কাজ হলো শক্তির মাপকাঠি। যন্ত্র যেমন কাজ করে, মানুষও তেমনি কাজ করে।

কাজ করার জন্য যন্ত্র বা দেহ যদি নিথর থাকে, তাহলে তার মাঝে শক্তি আছে কিনা বুঝা যায় না। শক্তির প্রকাশ হয় কাজের মাধ্যমে। কাজ যেমন শক্তির মাপকাঠি তেমনি গতি হলো কাজের উৎকর্ষতা বা কাজ সম্পাদনের বাহ্যিক কারণ। সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থানের উপর দেহ যখন কোন ঘটনার জন্ম দেয় বা অবস্থানের পরিবর্তন করে তখন দেহের নড়া-চড়া থেকেই কাজের উৎপত্তি হয়। সেজন্য দেহে যে শক্তি থাকে একে বলে গতি শক্তি। গতি শক্তির $(K.E)=^{1}/_{2}\ mv^2$ এর সমান।

শক্তির বেলায় ক্ষয়, অপচয়, রূপান্তর ইত্যাদি কর্মই ঘটে। পদার্থের রূপান্তরে যে শক্তি উৎপন্ন হয় এর পরিমাণ $E= mc^2$। যত ক্ষয় অপচয়ে রূপান্তরই হোক না কেন শক্তি চিরদিনই অবিনশ্বর। এর কোন ধ্বংস বা শেষ নেই।

গতির জগতে সবাই সরল সোজাভাবে চলে না। চন্দ্র, সূর্য ঘুরে ঘড়ির কাঁটার মতো। দেয়াল ঘড়ির দোলকটিই ঘুরে অন্যভাবে। এর গতি দোলন গতি। চলন্ত সাইকেলের চাকা ঘুরে ঘূর্ণন গতিতে। লাটিমের গতি চলন ঘূর্ণনগতি, মানুষের গতি চলন গতির মধ্যে পড়ে। এই চলন গতি এক রকম হয় না। বিজ্ঞানের ভাষায়ও চলন গতি দু'ধরনের যেমন সরল চলন গতি ও বক্র চলন গতি। সরল চলন গতি বিশিষ্ট দু'টি বিন্দুর যোগফল পরস্পর সমান্তরালে থাকে এবং পথ থাকে সরল সোজা। কিন্তু বক্র চলন গতির পথ হয় আঁকাবাঁকা।

মানুষ জীবন সাগরে নিজের প্রয়োজনে সংগ্রাম করছে। দু'পায়ে ভর করে তারা দিন রাত সাঁতার কাটছে। তার চলন গতিই নির্ভর করে তার জয়-পরাজয়।

সরল সোজা পথে নির্দিষ্ট গতিতে জীবন সাগর পাড়ি দেয়া সহজ। কিন্তু আঁকা বাঁকা পথে কঠিন। এর ফলে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। মানুষের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে। তাকে চন্দ্র, সূর্যের মতো গতির ঘণ্টায় বেঁধে দেয়া হয়নি। সে ইচ্ছা করলে যেভাবে খুশি সেভাবে জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু কোন পথে জীবন চালালে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে আমরা অজ্ঞ থাকায় আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই মহাদয়াবান আল্লাহ তা'আলা চলার জন্য একটি কেটালগ বা গাইড বুক দিয়ে দিয়েছেন। সেই কেটালগে সীমালঙ্ঘনকারীর বিপর্যয়ের কথা বলা আছে। দুনিয়ার জীবনে সীমালঙ্ঘনকারীরা শয়তানের সহচর। তাদের চলন গতি ভোগবাদী প্রবৃত্তির দংশনে আঁকাবাঁকা ও বক্রাকার হয়। এদের নির্দিষ্ট কোন

www.nagorikpathagar.org

গন্তব্য নেই। যেখানেই জীবনের একটু স্বাদ আছে, সেখানেই তারা মগ্ন হয়ে যায়। জীবনকে যথেচ্ছা ভোগ করার জন্য তারা জঘন্যতম কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। পরিশেষে এরা বক্র চলন গতির পথে শয়তানের বন্ধুত্ব বা শিষ্যত্ব বরণ করে। তাই এ পথ বিপর্যয়ের পথ বা পাপ সৃষ্টির পথ। এ পথের অনুসারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তারাও খোদার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। যারা তাঁর আনুগত্য করে না ওরা বিদ্রোহী, চরিত্রহীন ও সীমালঙ্ঘনকারী। সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানের আরো আছে খোদা প্রদত্ত বেঁকে দেওয়া স্বভাব। স্বভাবের গতিসীমা অতিক্রম করলে সীমালঙ্ঘন হয়। দুনিয়াতে সীমালঙ্ঘনকারীরা থাকে চরিত্রহীন।

মানুষের সৎ ও সুন্দর গুণাবলী তার স্বভাবের গতিসীমা অতিক্রম করে না। জীবনের প্রতিটি কাজ যাতে স্বভাবের গতিসীমার মধ্যে থাকে, তাই একে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধানের অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছে। এ বিধানের নাম দ্বীন ইসলাম। এ পথেই মঙ্গলময় পুণ্য সত্তা তৈরী হয়।

আল্লাহ বলেন– "তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের সকল সৎকাজগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" (সূরা-২ : ২১৭)

সুতরাং আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা হলো দ্বীন ইসলাম। এ পথ সরল চলন গতির পথ। এ পথে যারা চলে তারা চেতনশীল ঈমানদার ও মু'মিন। তাদের জীবন যাত্রা থেকে এক রহস্যময় সত্তা তৈরী হয়। এর নাম পুণ্য বা নেক।

আল্লাহ বলেন– "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমার ওপর আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) রূপে মনোনীত করলাম।" (সূরা-৫ : ৩)

"যে লোক গালাগাল করে ও অভিশাপ দেয়, চোগলখুরি করে বেড়ায়, ভাল কাজের প্রতিবন্ধক, যুলুম ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত– সে বড়ই অসৎ কর্মশীল, দুর্দম, চরিত্রহীন আর জারজও।" (সূরা-৬৮ : ১১-১৩)

প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক জিনিসের গতির পরিমাপ থাকা চাই এবং চলার পথ হওয়া চাই সরল, সোজা ও মসৃণ। আমরাও প্রকৃতির বাইরের কোন সম্পদ নই। তাই আমাদের জীবন গতির পথও হওয়া চাই সরল সোজা। আমাদেরও ভেবে চিন্তে ধীরস্থির গতি নিয়ে চলতে হবে। বস্তু আর জগৎ সৃষ্টির পেছনে গতি হলো সর্বেসর্বা। গতি থেকে সময় ও বস্তুর উৎপত্তি। আমাদের আচার-আচরণও গতির

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে কাটে। তাই এ থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হয়। সেগুলো বস্তু না হলেও বস্তুর বংশানুক্রমিক অন্য কোন জাত। বস্তুর সাথে গতির সম্পর্ক অনুধাবন করতে না পারলে জীবন গতির হাল ঘুরানো কঠিন। সেজন্য গতি ও বস্তুর উৎপত্তির কাহিনী জানতে হবে। জানতে হবে তার আগাগোড়া। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে সরল সোজা পথ ধরতে হবে।

গতি, বস্তু ও মানুষের বিকীর্ণ সত্তার সম্পর্ক

বিশ্ব মাতৃকোল যখন ছিল শূন্য, সে সময় পরমাণু কিংবা কোয়ার্ক নামের কোন সন্তান হয়নি। তখন বিশ্ব ভুবন ছিল গতিহীন একটা স্থির আসর। আমরা জানি না সে অবস্থাটা কেমন ছিল। তখন যে বিশ্বে কেউ ছিল না, এমন নয়। তখন ছিলেন প্রভু রাজাধিরাজ, তাঁর কুদরতী আসনে অধিষ্ঠিত। সে সময়ে বিশ্বে ছিল পরমস্থিতি অবস্থা বিরাজমান। কিন্তু এখন বিশ্বে যে অবস্থাটিকে স্থির মনে হয়, আসলে সেখানে স্থিরতার কোন বালাই নেই। একটি ইট কিংবা একটি গাড়ি আজীবন একস্থানে পড়ে থাকলেও সেগুলো প্রকৃতপক্ষে স্থির নয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সাথে সাথে সেগুলোও অবিরত ঘুরছে। তাদের ভেতরের পরমাণুর ইলেকট্রন কণিকাগুলো থাকে সদা ভ্রমণশীল। কখনো এরা থামে না, ঘুমায় না, স্থির হয় না। তবু সেটিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে স্থির মনে হয়, এটি হলো তার আপেক্ষিক স্থিতি। আসলে সেটি স্থির থাকে না।

গতির বেলায় একই কথা। সম্পূর্ণ স্থির অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হওয়ার নাম পরম গতি। বর্তমান বিশ্বে সম্পূর্ণ স্থির অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হওয়া অসম্ভব। তাই পরম স্থিতি ও পরম গতির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে না। তবু একটি গাড়ি যখন নির্ধারিত স্থান থেকে চলে যায় তখন আমরা মনে করি, গাড়িটি গতি নেয়ার আগে স্থির ছিল। গাড়ির এই স্থিরতাকে বলা হয় আপেক্ষিক স্থিতি। আপেক্ষিক স্থিতি অবস্থায় তার মাঝে যে গতি বিরাজ করে সেটিকে আপেক্ষিক গতি বলে। এমনিভাবে চলন্ত ট্রেনের দরজা জানালা এবং যাত্রীদের থাকে আপেক্ষিক গতি। সেদিক দিয়ে পৃথিবীর যাত্রীরা নিরব থাকলেও তাদের মাঝে গতির বাজনা বাজতে থাকে। তাই বিশ্বের আদি-গোড়া চিন্তা করলে তার রহস্যের অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বলেছেন– সমস্ত ঘটনা স্থান-কালের ন্যায় চৌমাত্রিকের উপর নির্ভরশীল এবং এর সকল কিছুই আপেক্ষিক। সাধারণ অর্থে বস্তু ও স্থান-কাল পরস্পর নির্ভরশীল। বস্তু ছাড়া সময় যেমন অচল তেমনি সময়হীন বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুর উৎপত্তির সাথে সাথে সময় ও কালের চাকা ঘুরতে থাকে। এই অবস্থায় বুঝা যায় পরমস্থিতি অবস্থায় সময় ও কালের চাকা ঘুরেনি। সেই সাথে বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণাও প্রসব হয়নি। সম্পূর্ণ স্থির অবস্থা থেকে যখন পরম গতির যাত্রা শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই সময় ও কালের চাকা ঘুরতে শুরু করে। সে সময় প্রসব হয় বস্তুর আদি সত্তা। পরমস্থিতির সাগরে বস্তুর শুক্রকণা স্রষ্টার কল্পনার রাজ্য থেকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো জেগে ওঠে। তখন শুরু হয় পরম গতির খেলা। এরপর থেকে চলতে থাকে বিশ্ব-দেয়াল-ঘড়ির দোলকটি। টিক টিক করে সময় ও কালের ধ্বনি শুরু হয় চতুর্দিকে। বাজতে থাকে ঢেউ এর কলকল রব। সে অবস্থায় ওজন ও আয়তন বিশিষ্ট কোন উপাদান জন্ম হয়নি। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় সেই ঢেউকেও বস্তুর আদি রূপ ধরা হয়ে থাকে।

আমরা ভাবতে পারি পরম গতির সাগরে ঢেউয়ের উত্তাল স্রোতের মাঝে কিনার ধরে জেগে ওঠে বস্তুর আদি ক্ষুদ্রতম কণা। এই ক্ষুদ্রতম কণা স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট অতি অল্প ওজনদার ও খুব মিহিন। এরূপ কোটি কোটি কণা একত্র হয়ে জেগে ওঠে বস্তু নামের দ্বীপচর। তার আগে স্রষ্টার পরিকল্পিত বিবর্তন ধারায় কত যে গুপ্ত খেলা কত যুগ ধরে চলে আসছিল তা আমরা অনুমান করতেও পারি না। তাই গতিহীন বস্তু আর বস্তুহীন গতি দু'টিই অচল। বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা শক্তির ঘনীভূত অবস্থাই পদার্থ, বা গতির মন্থরতাই বস্তু। বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে আরও একটু বাড়িয়ে বলা যায় গতি হলো বস্তু ও স্থান কাল সৃষ্টির বাহ্যিক কারণ, আর রূপান্তর হলো মহামনের (স্রষ্টার) অভিব্যক্তির ফল। তাই মহামনের অভিব্যক্তির স্পন্দনময় বিচ্ছুরিত ঢেউ হলো গতিশক্তি। এই গতিশক্তিই হলো বিশ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান। এতে আছে মহাপ্রজ্ঞাবান, বিশ্ব প্রকৌশলীর বিজ্ঞানময় নিপুণ প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি আমাদের চোখে ঝাঁঝ লাগিয়ে দেয়। সেজন্য এর কোন কূল-কিনার পাওয়া কঠিন। বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য জালে অনস্তিত্ব জগতে (পরমস্থিতির সাগরে) যখন কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না তখন গতি নামের এক ঢেউ পরমস্থিতির রাজ্যে যে অবস্থান্তর ঘটায় তার নাম পরম গতি। তাই ঢেউ হলো বস্তুর আদি সত্তা। যখন এই ঢেউ ছিল না তখন বস্তুরও কোন উপাদান ছিল না। সেজন্য স্রষ্টা একাধারে বস্তু ও তার উপাদানের স্রষ্টা। পরম স্রষ্টার মহাপ্রজ্ঞাময় প্রযুক্তিতে ক্রমে ক্রমে পরম গতি আপেক্ষিক গতির বাস্তবতার মধ্যে লুকিয়ে যায়। এমন অবস্থায় অনন্ত অসীম ভুবন জুড়ে বস্তুকণার মাঝে যখন পরম গতি লুকিয়ে পড়ে, তখন আপেক্ষিক গতি তার স্থান দখল করে নেয়। তাই পরম গতির সান্নিধ্য লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সার্বিক অর্থে এই বিশ্বের গতি-বস্তু ও স্থান-কালের উদয়ন মহামনের অভিব্যক্তির ফল।

www.nagorikpathagar.org

জাগতিক বিশ্বভুবনে আকাশের কোলে আজ যত গ্রহ, নক্ষত্র উদয় হয় এগুলো যে কোন একদিন ছিল না তা পরমস্থিতির উদাহরণ থেকেই পাওয়া যায়। স্রষ্টার সৃষ্টি প্রেমের পরম অনুভূতিতেই পরমস্থিতির রাজ্যটি অবস্থান্তর হয়ে পরম গতি লাভ করে।

এই বিশাল বিশ্বজগতে পৃথিবীর মাতৃকোলে রয়েছে মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে। এই দায়িত্ব পেয়ে পরম সৌভাগ্যবান আমরা। আমাদের আত্মা পরম কৌশলী আল্লাহ নিজের অনুরূপে, প্রেম, অনুভূতি শক্তি দিয়ে বিবেক বুদ্ধিশীল করেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করেছেন।" (আল-কুরআন)

পরম খোদার সৃষ্টি প্রেম, অনুভূতি আর অভিব্যক্তির ফল হলো এই বিশ্বভুবন। এখানের সকল সৃজনশীল প্রজাতি তিনি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যে মানুষকে আল্লাহ নিজের অনুরূপ প্রেম ও অনুভূতি শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার অভিব্যক্তির ফল তো আমাদের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বা পারিপার্শ্বিকতার কাছাকাছি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে কি তার গতি বা আচরণ থেকে কিছুই সৃষ্টি হবে না? সত্যিকার অর্থে প্রেম আছে, অনুভূতি, বিবেক বুদ্ধি আছে তার বেলায় নতুন কিছু না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন এটিই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তা না হলে তিনি মানুষকে নিজের মতো প্রেম, অনুভূতি ও বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করতেন না।

এ বিশ্ববসতিতে সকল কিছুর জোড়া আছে। কিন্তু এমন এক জিনিসের জোড়া নেই যার নাম হলো বস্তু। এখানে বস্তু আছে নিঃসঙ্গ। বস্তুর নিঃসঙ্গ সংসারে তার বিপরীত কোন জাত নেই। নেই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা হতে উৎপন্ন কোন দ্বৈত সত্তা। স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি আকলে আউয়াল বা আদমিয়াত। এটি হলো Positive সত্তা। অপরদিকে এই সত্তার আকুল আবেদন, নিবেদন ও কামনা বাসনা থেকে খোদার নির্দেশে তার অস্তিত্ব থেকে নতুন যে জাতের পয়দা হয়, তার নাম হাওয়া। এই হাওয়াই Negative ধর্মী জাত। বর্তমান পৃথিবীর বসতিতে মানব মানবীর আবির্ভাব সৃষ্টির পূর্ণতার ফসল। এ জগতেও আমাদের কামনা বাসনা ও আশার কোন কমতি নেই। তাই এ জগৎ স্রষ্টার অভিব্যক্তির চূড়ান্ত রূপান্তর। অতএব এ জগতকেও আমরা Positive জগৎ ধরতে পারি। তবে এ জগতে আমাদের ইচ্ছার রয়েছে স্বাধীনতা। আছে আমাদের অভিব্যক্তি প্রকাশের সকল উপকরণ। সৃষ্টির অভিব্যক্তি থেকে খোদার নির্দেশে তার নিজের অস্তিত্ব থেকে যে সত্তা রূপান্তরিত হয়ে বের হয়ে আসে তার পরিচয় Negative

www.nagorikpathagar.org

হিসেবেই বিচার করতে হয়। এরূপ যদি প্রমাণ হয়, তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীর সকল কিছুর গর্ভ থেকে তার দ্বৈত রূপ প্রতিবস্তুর কণা বের হয়। তাহলে প্রতিবস্তুর জগৎ আমাদের পরকালের ভাবনার গভীর সাগরে ঠাঁই দিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বস্তু ও প্রতিবস্তু এবং বিকীর্ণ শক্তির সম্পর্ক

বস্তু বা পদার্থ আমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বলতে গেলে বস্তুর পেট ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমাদেরকে চলতে হয়। আমাদের এ জড়দেহটিও বস্তু বা পদার্থের জীবন্ত কণা দিয়ে তৈরী। আত্মার অবর্তমান হলে মাটি তাকে গিলে ফেলে। কি বিচিত্র এই পৃথিবী! এ পৃথিবীতে যা কিছু ওজনশীল ও আয়তন বিশিষ্ট এবং জায়গা জুড়ে থাকে সেগুলোই বস্তু। বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণাও স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট স্থান নিয়ে বাস করে। কিন্তু আধুনিক বস্তু কাল্পনিক ছায়ার মতো শূন্যে ভেসে বেড়ায়। একে ধরে বন্দি রাখা যায় না, আবার নিক্তিতে দাঁড় করিয়ে ওজনও নেয়া যায় না। বস্তুর এখন স্থানের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় না। বরং একটি ঢেউকেও বলা চলে বস্তু। এই বস্তু এতো সূক্ষ্ম যে, একে এখন না ধরা যায়, না স্পর্শ করা যায়। কিন্তু বিশ্বের আদি অতীতের দিকে বস্তুর কোন অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সুদূর অতীতে এই বিশ্বে বস্তু বলতে কিছুই ছিল না। কখন এই বস্তু পয়দা হয়েছে তা আমরা ভাবতেও পারি না। তবে এই বস্তু ও মহাজগতকে সৃষ্টি করেছেন তার ইতিহাস পাওয়া যায়।

যিনি বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি সেই ইতিহাসের প্রবর্তক। কিন্তু মানুষ যেভাবে বস্তু পয়দা হওয়ার কথা চিন্তা করেছে, এ এক বিভ্রান্তিকর কল্পিত কাহিনী। পরমস্থিতি অবস্থায় জগৎ বলতে কিছু না থাকলেও পরম স্রষ্টা তার রহস্যময় আসনেই ছিলেন। বস্তুর সাথে গতির সম্পর্কের আলোক থেকে বলা যায় যখন কোথাও কিছু ছিল না তখন স্রষ্টার সৃষ্টি প্রেমের সাড়া পেয়ে পরমস্থিতির সাগরে তরঙ্গের যে ঝড় বা ঢেউ ওঠে, সেই অবস্থাটি ছিল পরমগতির জগৎ। তাই গতি ও তরঙ্গ হলো সৃষ্টির মূল উপাদান। গতির কল্পনা থেকে তার একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে এটিও বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরীক্ষিত। একটি স্থির গাড়ি যেমন চালক ব্যতীত কোন কালেও গতি প্রাপ্ত হতে পারবে না আবার এটি স্রষ্টা বা নির্মাতা ব্যতীতও সৃষ্টি হতে পারবে না। কিন্তু বস্তুর মূল মাল মসলা যদি গতি ও তরঙ্গ হয় তাহলে একে গড়তে নিশ্চয়ই বাস্তবে একজন স্থির নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে। তাই এই বিশ্বের পরম মালিকই বস্তু এবং এর উপাদানের স্রষ্টা।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন– "আল্লাহই সকল সৃষ্টির আরম্ভ করেছেন; তারপর তা পুন সৃষ্টি করছেন এবং সবশেষে সবাইকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (সূরা-১৭ : ৫০-৫৩)

"(আর তিনিই) সৃষ্টিকর্তা আসমানসমূহের এবং যমিনের যখন কোন কিছুর পূর্ণতা সাধন করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু তাকে (এতটুকুই) বলে দেন যে, 'হয়ে যা' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।" (সূরা-২: ১১৭)

আমরা মানুষ জাতি এই বস্তু জগৎ চষে চষে ভোগ করছি। আছে আমাদের কর্মের স্বাধীনতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা। এ ধরার মাটিতে আমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারি। চাঁদ, সূর্য, পৃথিবীর মতো আমাদের গতি বা চলাচলের সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। আমরা বিবেক-বুদ্ধি খাঁটিয়ে পথ চলতে পারি। অনেক সময় বিবেকের মৃত্যু হলেও জীবন যাত্রা থেমে থাকে না। তাই যেভাবে চলতে চাই না কেন, আমরা দুনিয়ার জীবনে স্বাধীন। এ স্বাধীনতা আছে বলেই আমরা মনের একান্ত গোপন বাসনাকে চরিতার্থ করতে পারি।

এমন অবস্থায় আমাদের অন্তরবাসে যখন কামনার ঝড় ওঠে তখন নিথর জড় মূর্তিটি কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। সহসাই যেন কামনার দানাগুলো এই জড়মূর্তিটির প্রতিটি স্নায়ুকোষে গতির স্পন্দন ঢেলে দেয়। এই স্পন্দন ঢেউ এর ন্যায় বিদ্যুৎ বেগে সকল কল-কব্জা পেরিয়ে চলে যায় কাজ সম্পাদনকারী অঙ্গের দিকে। এতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াশীল হয়, গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের অন্তরবাসে কামনার যে ঝড় ওঠে তার একটুও বিলুপ্ত বা ধ্বংস হয় না, কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো নাসিকার ছিদ্র দিয়ে বায়ুর মতো চলাচল করে না। এ গুলো মস্তিষ্ক হয়ে যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে গিয়েই অদৃশ্য হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই ঢেউ অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায়? এবং কি রূপে যায়?

বিশ্বের ইতিহাসে গতি থেকে সবক্ষেত্রে কিছু না কিছু সৃষ্টি হয়, এ ধারণা আমরা পূর্বেই পেয়েছি। খোদার সৃষ্টি প্রেমের কামনার ঝড় থেকে ঢেউ নামের যে তরঙ্গ গতির ঝড় শুরু হয় তা থেকেই তো এ বস্তু জগতের উৎপত্তি। অতএব যে খোদা এই মানব জাতিকে নিজের অনুরূপ প্রেম প্রবৃত্তি আর ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা এবং দুনিয়ার প্রতিনিধি করে সৃষ্টি করেছেন, সেই জাতের কামনার ঝড় বা ঢেউ থেকে কি কিছুই সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টির অসীম রহস্য তলিয়ে দেখলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, নিশ্চয়ই মানব প্রতিনিধির মাধ্যমে এ দুনিয়া থেকে কিছু না কিছু সৃষ্টি হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ বলেন– "তোমরা নেক কাজ করলে নিজেদের জন্যই করবে আর দুষ্কর্ম করলে তাও নিজেদের জন্য করবে।" (সূরা-১৭ : ৭)

"এমনকি যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তার কান, তার চোখ এবং তার চামড়া, তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। সে তার চামড়াকে বলবে, তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?

সে জবাব দিবে, যে খোদা প্রতিটি জিনিসকে বাক্‌শক্তি দেন, তিনিই আমাকে বাক্‌শক্তি দিয়েছেন। তোমরা লুকিয়ে কাজ করতে এবং এ কথা জানতে না যে, তোমাদের স্বীয় কান, চোখ এবং চামড়া তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। বরং তোমরা ভাবতে যে, তোমাদের বহু ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পর্যন্ত অনবহিত।" (সূরা-৪১ : ২০-২২)

দুনিয়া, আখেরাতে সকল কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি যেমন বস্তু ও বস্তুর উপাদানের স্রষ্টা তেমনি পরকালেরও মালিক। কিন্তু বস্তু ও পরকালের সত্তা কিংবা বস্তু ও প্রতিবস্তুর সত্তার সাথে মানব কর্ম ও তার জীবন ব্যবস্থার কোন বাস্তব সম্পর্ক আছে কিনা সেটিই বস্তু ও প্রতিবস্তুর সম্পর্ক তালাশ করার মূল বিষয়। তাই আমি বস্তু ও প্রতিবস্তুর সম্পর্ক বের করতে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি দর্শন ও ধর্মের নীতি কথা তুলে ধরেছি।

মানুষ, জীবজন্তুসহ উদ্ভিদ জগতের প্রতিটি স্তরের মাঝে রয়েছে জোড়া সম্পর্ক। আছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার ভেতরে একই ভর বিশিষ্ট বিপরীত চার্জ ইলেক্ট্রন ও পজিট্রন। পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যার জোড়া বা বিপরীতধর্মী কোন কিছু পাওয়া যাবে না। একমাত্র জোড়াহীন সত্তা হলো ফেরেশতা। এদের মধ্যে নারী-পুরুষের কোন সম্বন্ধ নেই। এরা নারীও নয়, পুরুষও নয়।

আল্লাহ বলেন– "তিনিই মহান যিনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, মাটির উদ্ভিদ হতে ও তাদের মানুষ হতেও এবং এরূপ জিনিস হতে যার সম্পর্কে তাদের নিজেদের কোন জ্ঞান নেই।" (সূরা-৩৬ : ৩৬)

"এবং আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরা-৫১ : ৪৯)

বাস্তবে আমরা সকল জিনিসে জোড়া পেলেও এমন এক জিনিসের জোড়া পাই না যার সাথে আঁড়ি দিয়ে এক সেকেণ্ডও চলা সম্ভব নয়। সেই জিনিসটি হলো বস্তু। পৃথিবীর কলিজা ছিঁড়ে বস্তুর অন্তর ঠিকানা খুঁজে পেলেও তার কোন জোড়া বা দ্বৈত জাতের সংসার খুঁজে পাওয়া যায় না।

www.nagorikpathagar.org

বস্তু এখানে বস্তুর মতোই সংসার করছে। কিন্তু এই সংসারে তার জোড়া বন্ধন খুঁজে পাওয়া না গেলেও বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ধারায় বস্তুর পেটে তার দ্বৈত রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর নাম প্রতিবস্তুর কণা। কিন্তু এ কণার কোন আবাস ভূমি আমাদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে নেই। এ কণাগুলো জড়বস্তু তথা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী দেহের কোষ পরমাণুর গা থেকে শিশিরের মতো শূন্য মাতৃগর্ভে ঝরে ক্ষণিকেই সেখান থেকে লুকিয়ে পড়ে। মূলত এ মাতৃথলী গর্ভধারিণী মায়ের মতোই সেগুলোকে উদরে পুরে রাখে। কখন, কোথায় যে সেগুলো গিয়ে প্রসব হয় সে খবর কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীর বেলায় এদের আয়ু খুবই ক্ষণস্থায়ী। এদের সাথে বস্তু কণার দেখা হলেই সংঘর্ষ হয়, যুদ্ধ চলে। কেন জানি তারা একে অপরকে ধ্বংস করার নেশায় মেতে ওঠে। ওদের ধাক্কাধাক্কি আর ঠেলাঠেলিতে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন আলোর তরঙ্গ বের হয়ে আসে। জোড়া সম্পর্কে তারা কেন জানি একজন আর একজনকে প্রেমের বন্ধনে ঘর বাধতে চায় না। এদের ঠেলাঠেলি দেখে মনে হয় গতিশীল কণিকার সাথে স্থিতি কণার যেন ধাক্কাধাক্কি। সে যাই হোক, প্রতিবস্তুর সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটুকু সেটিই দেখা যাক।

এ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ধারায় আদম (আ)-এর সুপ্ত মনের বাসনায় কামনার যে ঝড় উঠেছিল, এর পরিপ্রেক্ষিতেই খোদার নির্দেশে আদম (আ)-এর নিজ সত্তা হতে তাঁর বিপরীত জাত পয়দা হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন– "তিনি তোমাদের জীবজন (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমপ্রকৃতির সঙ্গিনী দিয়েছেন যেন এক সঙ্গে তারা বসবাস করতে পারে।" (৭-১৮৯, ৩৯-৬)

"সদা প্রভু ঈশ্বর আদম হতে গৃহীত পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করলেন ও তাঁকে আমাদের নিকটে আনলেন।" (বাইবেল-২ : ২২)

সৃষ্টির পূর্ণতার চূড়ান্ত পর্বে এই মানব-মানবীগণ একসাথে মিলিত হয়ে বাসা বেঁধে ছিলেন এই পৃথিবীর বাগিচায়। এই বাগিচা বস্তু নামের প্রাকৃতিক জীবন্ত ও মৃত সরঞ্জামে তৈরী। বৈধ পথে এর সবকিছু ভোগ করার অধিকার তাঁরা পেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ বৈধ, অবৈধ দু'ভাবেই তা ভোগ করছে।

বস্তু জগতের বাসিন্দাদের মাঝে মানুষ নামের বিবেক বৃদ্ধিশীল জাতির জড় মূর্তির বাম পাঁজরের নিচ বরাবর যে চালক বসে আছে, সে তো কোন সময় অলস হয়ে বসে থাকে না। যখন যা ইচ্ছা তাই সে এই জড় মূর্তিটি দিয়ে করায়। তার ইচ্ছার ব্যগ্রতা মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ভাঁজগুলোকে আলোড়িত করে, গতিশীল করে। গতির এই

www.nagorikpathagar.org

স্পন্দন স্রোতের বেগে অঙ্গ-প্রতঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। তখন সেখানে ইচ্ছার ব্যগ্রতার ঢল নামে। এই ঢল অঙ্গ-প্রতঙ্গের প্রান্তদেশের কণাগুলোকে প্লাবিত করে, তার রূপ পাল্টে দেয়। এতে জন্ম হয় নতুন সত্তা। পক্ষান্তরে এ নতুন সত্তা সেখানে বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না। মায়ের জরায়ুতে যেমন সন্তান পূর্ণতা (৪০ সপ্তাহ) লাভ করলে কিংবা অপ্রাপ্ত অবস্থায় ঐ কুঠুরীতে মরে গেলে তাকে সেখান থেকে বের করে দেয় তেমনি অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরমাণুর গর্ভে যখন নতুন শুক্র জন্ম হয় তখন সে ঐ শুক্রটিকে প্রসব করে তার স্থান খালি করে। এ শুক্রের নাম প্রতিকণা। যা দিয়ে সৃষ্টি হবে নতুন এক জগৎ। তাই বস্তুর সাথে দুনিয়ার জীবনে আমাদের আত্মার ও দেহের যেমন সম্পর্ক আছে তেমনি পরকালে আমাদের জীবন ব্যবস্থার সাথে এই রহস্যময় প্রতিকণার সম্পর্ক থাকতে পারে বৈ কি? সেটি প্রতিবস্তুর জগৎ হবে কিনা তা আমাদের জানা না থাকলেও এ জগতের ওপারে যেমন পরজগৎ আছে বলা হয় তেমনি বস্তু জগতের ওপারের ঐ জগতকে প্রতিবস্তুর জগৎ বলতে বাধা কিসের?

একথা স্বীকার না করলে কার্যত বস্তুর জোড়া প্রতিবস্তুকে অস্বীকার করতে হয়। আমরা হয়ত কেউ বলি, পরজগৎ বা পরকাল, কেউ বলি কর্মফলের জগৎ, সে ক্ষেত্রে কেউ হয়ত বলবো প্রতিবস্তুর জগৎ। এখানে তো শুধু অভিব্যক্তিগত শাব্দিক পার্থক্যই বলা চলে। আসলে সে যাই হোক মূল জিনিস তো এক। পরকালকে তো আর অস্বীকার করা হলো না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিনাস পলিং-এর মতে, এ বিশ্বের কোন কোন এলাকায় প্রতিবস্তুর জগৎ বিদ্যমান আছে। সকল যুক্তির সীমানা পেরিয়ে শেষাবধি যেহেতু আমাদের জ্ঞান অসীমের কাছে হার মানে তাই আমাদের যুক্তি ষোল আনাই যে সত্য হবে, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবু একথা বলতে পারি, বস্তু জগতের গর্ভ থেকে যে সত্তার জন্ম হয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে, তা দিয়েই যদি পরকাল বা পরজগৎ তৈরী হয়, তাহলে প্রতিবস্তুর জগতের কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আমাদের আত্মা একটি বিশালকার দেহরাজ্যকে এক জায়গায় বসে শাসন করে। এ দেহরাজ্যটি জড় পদার্থের সমষ্টি, একে একটি জীবন্ত জড় মূর্তিও বলা চলে। বস্তুর গর্ভ থেকে যেহেতু প্রতিবস্তুর কণা ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে প্রতিবস্তুর কণার সাথে আমাদের আচার-আচরণের বিকীর্ণ সত্তা বা পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

অতঃপর প্রতিবস্তু আর পাপ-পুণ্যের সেই সঠিক সম্পর্ক যদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়, তাহলে বিজ্ঞানের সূত্র ধরে আমরা পরকালকে আবিষ্কার করতে পারব, তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

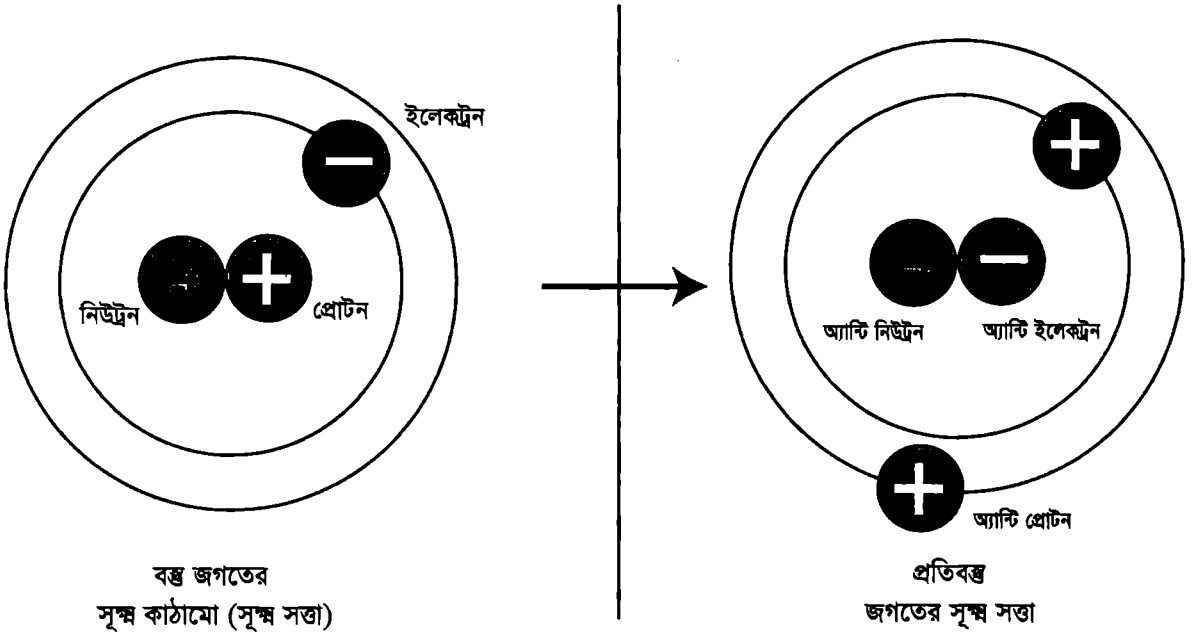

[বস্তু ও প্রতিবস্তুর সত্তার সম্পর্ক হলো, এরা পরস্পরের মুখোমুখি হলে উভয়ই উভয়কে ধ্বংসে মেতে উঠে।]

"যেদিন যমীন ও আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ করে দেয়া হবে।" (সূরা ইবরাহীম)

প্রতিবস্তু, পাপ-পুণ্য ও জগতের সম্পর্ক

দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মে মাতাপিতার উত্তরাধিকারী হলো তার সন্তান-সন্ততি। যতদিন তারা জীবিত থাকেন ততদিন সন্তান সন্ততিরা তাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ভোগ করতে পারেন না। যখনি তারা এই পৃথিবীর আলো বাতাস ছেড়ে অন্য জগতে চলে যান তখনি তাদের অধিকার বৈধ হয়। প্রতিবস্তুর বেলায়ও তেমনি এক রহস্যময় উত্তরাধিকার আইন বা নীতি প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত আছে বলে মনে হয়। যেমন বস্তুর গর্ভে প্রতিবস্তুর কণা নামের যে অদৃশ্য কণা পয়দা হয় তার বৈধ মালিকানা এই বস্তু জগৎ অবলুপ্তি বা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যেহেতু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, সেহেতু বলা যায় সে জগৎ দেখার মতো বিধান এখনো চালু হয়নি। সে কারণে এর গুণাগুণ সম্পর্কে বস্তু জগতের বাসিন্দাদের কোন প্রকার জ্ঞান লাভ সম্ভব হচ্ছে না।

অপরদিকে আমাদের আচার-আচরণের সত্তা পাপ-পুণ্যও সেই রূপ রহস্যের জালে বন্দি। এই পাপ-পুণ্য কি এবং কেমন ও কিভাবে, কোথা থেকে সৃষ্টি হয়, কোন রাস্তা দিয়ে উড়ে যায়, কোথায় যায় এর কিছুই আমরা জানি না। তাই কৌতুহলী মন প্রতিবস্তু ও পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে ঘুম-নিদ্রা হারাম করতে বাধ্য। সৃষ্টির জোড়া তত্ত্ব, বা বিপরীত জাতের সন্ধান, বস্তু ও প্রতিবস্তুর সম্বন্ধ ইত্যাদি পাপ-পুণ্যের চিন্তা-চেতনাকে দিনে দিনে যেন হিমালয় চূড়ার মতো ভাবনার পাহাড় আবিষ্কার করতে শক্তি-সাহস যোগাচ্ছে।

বস্তু কণার পজিট্রন যখন ইলেক্ট্রনকে নর-নারীর মতো আদর-সোহাগে প্রেমের রশিতে বেঁধে রাখে তখন মিলনের তীব্র আনন্দের জোয়ারে ইলেকট্রনগুলো পজিট্রনের চারপাশে ঘুরতে থাকে, এতে গতি নামের প্রাণ শক্তি তাদের মিলনের অন্তিম স্বাদ মিটিয়ে দেয়। ফলে তারা চরম পুলক অনুভব করে। ক্ষণিকেই ঢেউ জাগে তাদের গায়ে। এতে করে পরমাণুর সূক্ষ্ম গর্ভ থলিতে নতুন এক ভ্রূণ-এর জন্ম হয়। তারপর যখন এই ভ্রূণের পূর্ণতা আসে তখন সেটি গর্ভ থলি থেকে এক রহস্যময় রাস্তা দিয়ে প্রসব হয়ে প্রকৃতির সাগরে ভূমিষ্ঠ হয়। এই নতুন প্রজন্মের নাম প্রতিকণা বা প্রতিবস্তুর কণা।

মানুষের জীব কোষের একটি ডি.এন.এ-এর ভেতরেই থাকে অগণিত সংখ্যক পরমাণুর স্তর। মানুষের অঙ্গের গাঠনিক কোষগুলোর অনবরত পরিবর্তন হয়। প্রতি নিয়ত জন্ম-মৃত্যুর পালাবদল চলে তাতে। যখন নতুন কোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন ঐ কোষের ভেতরে সূতার মতো আকৃতির এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম সত্তা জেগে ওঠে। একে বলা হয় ক্রোমোজম। এই ক্রোমোজম বংশগতির ধারা বজায় রাখে। শুধু কোষ বিভাজনের সময়ই তাকে সেখানে লক্ষ্য করা যায়।

www.nagorikpathagar.org

এই ক্রোমোজম একসময় খুব উত্তেজিত হয়ে নড়াচড়া শুরু করলে তার শরীর পাক খেতে খেতে খুব পাতলা স্প্রিংয়ের মতো হয়ে যায়। এই অবস্থায় পুরো ডি.এন.এ-এর মাঝেও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিশেষে কোষ বিভাজন সম্পন্ন হলে ক্রোমোজমগুলো আবার সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিসের প্রেরণায় ক্রোমোজমগুলো উত্তেজিত হয় সেটি আমাদের ভাবনার বিষয়। পক্ষান্তরে এই অদৃশ্য ক্রোমোজম কোন তথ্য নিয়ে পালায় কিনা তাই বা কে জানে? আমাদের মনের কামনার বাসর থেকে যে ঢেউ ওঠে এর দ্বারা যদি সেটি উত্তেজিত হয়, তাহলে তার মাঝে মনের অভিব্যক্তির ছোঁয়া লেগে থাকা বিচিত্র কিছু নয়। এই অদৃশ্য সত্তাকে তথ্যকণাও বলা যায়। কিংবা তার নাম দেয়া যায় কর্মফলের ভ্রূণ।

ছোট বেলায় ভাবতাম মাতৃগর্ভে স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গ তৈরী হওয়ার মতো দু'টি প্রকোষ্ঠ আছে। একটি হলো স্ত্রী প্রকোষ্ঠ আর অপরটি পুরুষ প্রকোষ্ঠ। সন্তানের বীজ স্ত্রী প্রকোষ্ঠে ঢুকলে স্ত্রী সন্তান হয় আর পুরুষ প্রকোষ্ঠে ঢুকলে পুরুষ জাত সন্তান তৈরী হয়। অথচ বড় হয়ে বাস্তবে বই পত্র পড়ে অভিজ্ঞতা হলো তার বিপরীত। এখন জেনেছি স্ত্রী লোকের জননেন্দ্রিয়তে জরায়ু নামের একটি মাত্র কুঠুরী আছে। এর ভেতরেই ছেলে-মেয়ে তৈরী হয়। পিতা মাতার ক্রোমোজমের নিপুণ ক্রিয়াকলাপেই বংশ গতির ধারা বজায় থাকে। তার মাঝে জীন নামের এক সূক্ষ্ম সত্তার আনুপাতিক প্রাধান্য আর প্রাধান্যহীনতার ওপরই সন্তান ছেলে-মেয়ে হওয়া নির্ভর করে। কারণ জীন-এর মাঝেও আছে দ্বৈত রূপ। মায়ের গর্ভে সন্তান গঠনের সময় শুক্র আর ওভাম মিলে প্রথমে যে পিণ্ডটি গঠিত হয়, সেটিতে যদি পুরুষ জীনের সংখ্যা বেশি থাকে, তবে ছেলে সন্তান হয়, অপরদিকে যদি স্ত্রী জাত জীনের সংখ্যার আধিক্য হয় তবে মেয়ে সন্তান হয়।

মূলত ক্রোমোজম এমনি সত্তা যা লিঙ্গ রূপান্তর থেকে নিয়ে সন্তানের স্বভাব-চরিত্র, বর্ণ, গঠন আকৃতি ও প্রকৃতি সবই বিন্যস্ত করে। এই বিশ্ব জগৎ সূচনা হবার আগে কোথাও শক্তি, (বস্তুর উপাদান) কিংবা বস্তু ও সময়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সে সময় অস্তিত্বহীন পরম স্থিতিশীল এক রহস্যময় অবস্থা অবশ্যই বিরাজমান ছিল। সে অবস্থাটা কেমন ছিল আমরা তা বলতে পারব না। তখন গতি নামের কোন চাকা ঘুরেনি। ধর্মের মহান উৎস থেকে আমরা জানতে পেরেছি, সে সময় নিরাকার এক আল্লাহ্ বিরাজমান ছিলেন এবং তিনিই প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেন। তাই তিনি একাধারে সৃষ্টির উপাদানের স্রষ্টা এবং জগৎ ও প্রাণের স্রষ্টা। তাঁর পরিকল্পনা ব্যতীত কিছুই সৃষ্টি হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

অথচ একশ্রেণীর বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আল্লাহকে না এনে বলেন, বিশ্বে আদি অবস্থায় অস্তিত্বহীন শূন্য পরিবেশে কোন এক বিন্দুতে হঠাৎ করে আদি ভর-শক্তির সমাবেশ ঘটে। এই ভর-শক্তি উচ্চ তাপে ও চাপে একসময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একে বলা হয় মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাংগ। কিন্তু তারা আদি ভর-শক্তি সৃষ্টির কোন কারণ বা উৎস ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তবে এতটুকু বিশ্বাস করেন যে, শক্তির রূপান্তরেই বস্তু এবং গতিবিহীন বস্তু সৃষ্টি হতে পারে না। পক্ষান্তরে বস্তুর মূল উপাদান হলো তরঙ্গ বা ঢেউ।

আমাদের মনের কামনার কুঠুরীতে প্রেরণা বা ঢেউ উদয় হয়। প্রবৃত্তির প্রেরণায় এখানে সু-মতি ও কু-মতি বাস করতে পারে। একে সদভাব ও কুভাব বলা যায় কিংবা কু-প্রবৃত্তি বা সু-প্রবৃত্তি। যে কোন রকম প্রবৃত্তির তৃষ্ণা মেটানোর জন্য আমাদেরকে স্থূল দেহের সাহায্য নিতে হয়। দেহ কাজ করলেও তার কোন আত্মিক ক্ষুধা মেটে না। মন বিশ বছর আগে যদি কোন অঙ্গের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে, তবে বিশ বছর পর সেই অঙ্গে এর কোন অনুভূতির ছাপ থাকে না।

অথচ বিশ বছর আগের ঘটনাটি যদি মনে হয়ে যায় তবে সহসাই মনের গভীরে তার কিছু অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তাই অঙ্গের কোন সময় সুখ-দুঃখ ভোগের পিপাসা বা লিপ্সা হয় না। কার্যত অঙ্গ শুধু জীবনকে তার মধ্যে ধরে রাখার জন্য তার-ই আজ্ঞাবহ থাকে। মূলত দেহ জীবনের প্রয়োজনেই আহার করে, কাজ-কর্ম, ঘুম-নিদ্রার প্রয়েজান বোধ করে। মনের প্রয়োজনেই সে মসজিদে যায় কিংবা গোপন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে। মন যখন দেহকে মস্‌জিদে কিংবা নিষিদ্ধ পল্লীতে নিয়ে যায় তখন কার্য অনুযায়ী সু-প্রবৃত্তির কিংবা কু-প্রবৃত্তির কামাবেগ দেহের স্নায়ু কোষে ঝড় তোলে, এতে করে অঙ্গ কিছু শক্তি হারায়। মনের প্রবৃত্তির ঢেউ বা তরঙ্গ থেকেই স্নায়ু কোষগুলো উত্তেজিত হয়। তাই ফুরানো শক্তির মাঝে মনের সু-প্রবৃত্তির বা কু-প্রবৃত্তির মিষ্টি দাঁতের বা বিষ দাঁতের কামড় লেগে তা হয়ে ওঠে সু-কৃতিময় অথবা দুষ্কৃতিময়।

ধর্মের বিধান থেকে জানা যায়, আমাদের হাত, পা, নাক, কান, চোখ, মুখসহ শরীরের চামড়া থেকে পর্যন্ত পাপ কিংবা পুণ্য হয়। এ ছাড়া শুধু মনের মাধ্যমেও পাপ-পুণ্য হয়। কিন্তু এই সত্তাগুলো যে কিভাবে অঙ্গের থেকে সৃষ্টি হয়, তার কোন খবরই আমরা বলতে পারি না। সকল কাজের কর্মফল নির্ভর করে নিয়ত বা ইচ্ছা উপর। কারণ মনের ইচ্ছা ব্যতীত দেহের এক বিন্দুও নড়াচড়া করার উপায় নেই। দেহ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায়ই হোক, সে মনের নির্দেশেই কাজ করে। তাই সু-মতি থেকে সু-কৃতির সত্তা এবং কু-মতি থেকে দুষ্কৃতির সত্তা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞান বস্তু বা জড়সত্তার গর্ভের বিকীর্ণ সন্তানের নাম দিয়েছে প্রতিকণা বা প্রতিবস্তুর কণা। এ বিকীর্ণ সত্তাতে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন কৃষ্ণ কায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাব শক্তি। এ বিষয়ে পূর্বেও অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। তবে এখানে মনের ইচ্ছা বা প্রেরণা থেকে দেহ কোষের গর্ভে কিংবা মনের বাসর থেকে যে সত্তা বিকীর্ণ হয়, একে ধর্মের ভাষায় পাপ-পুণ্য বললেও বিজ্ঞানের ভাষায় বিকীর্ণ কর্মশক্তিও বলা যেতে পারে। মূলত এই বিকীর্ণ শক্তিতে কর্মফলের জগৎ সৃষ্টি হওয়ার ছাপ লেগে থাকে। এটি ক্রোমোজমের জীন নামক সূক্ষ্ম সত্তার মতো গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বহন করে। এ থেকেই জীবনের কর্মফল বা প্রতিফলের জগৎ তৈরী হবে।

আল্লাহ বলেন, "সেদিন তারা নিজেদের কর্মের সু-কৃতি ও দুষ্কৃতিগুলো দেখতে পাবে।" (আল-কুরআন)

"সেদিন তাদের নাক, কান, চোখ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।" (আল-কুরআন)

রাসূল (সা) বলেছেন– "পাপ, পুণ্য দু'টি সৃষ্ট বস্তু।" (আল-হাদীস)

আমাদের পেট নামের গুদাম ঘরটিতে একসাথে চিরদিনের জন্য মাল তুলে বোঝাই করে রাখা যায় না। খেয়ে দেয়ে সেটি বোঝাই করার পর কিছুক্ষণ কর্মব্যস্ত থাকলে সেটি আবার খাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকে। তাই খাবার খেতে একটু দেরি হলেই দেহ অবশ হয়ে আসে। তখন পুরো দেহই পীড়া অনুভব করে। এতে বুঝা যায় দেহকোষের কোষাগার হতেও শক্তি পাচার হয়। এই কোষাগার থেকে যে জিনিস পাচার হয়, এগুলো কি মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর দৃষ্টিতে সু-কৃতি ও দুষ্কৃতির সত্তা? একেই কি রাসূল (সা) বলেছেন– পাপ-পুণ্য দু'টি সৃষ্ট বস্তু? অন্যদিকে বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলোই কি প্রতিকণা? আসলেই পুরো বিষয়টিই গবেষণার দাবী রাখে। তাই সহজভাবে একে একি জিনিস বলা কঠিন। যদি একই জিনিসের ভাষান্তরে বিভিন্ন নাম হয়েছে বলে প্রমাণ করা যায় তবে তার সত্যতা জোর দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। তবে একথা সত্য যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে যুক্তির মাধ্যমেও অনেক সময় একটা জিনিসের সত্যতা যাচাই করা যায়। মূলত অদ্যাবধি যত যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে, তার শেষসীমা বা ঠাঁই, এরূপ সাদৃশ্যই প্রমাণ করে। তা থেকেই বুঝা যায় প্রতিবস্তুর কণা ও পাপ-পুণ্যের মাঝে একটি অতি গোপন নিগূঢ় প্রীতি আছে।

বিজ্ঞানে ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া বলে দু'টি কথা আছে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম বা ক্রিয়া ঘটে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া কর্তার ইচ্ছায় সরাসরি না ঘটলেও ক্রিয়া বা কর্মের অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝেই প্রতিক্রিয়ার সত্তা জন্ম হয়ে যায়। পরিশেষে এই প্রতিক্রিয়ার স্বাদ ভোগ করতে হয় ঐ কর্তা ব্যক্তির। এটি বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ঘটনা।

www.nagorikpathagar.org

নিউট্রন বলেছেন, "প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।" অথচ বাস্তব জীবনে এর অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়। এ অসঙ্গতির পেছনেও রহস্য বিরাজ করছে। সেই রহস্যের জাল কোথায় তা না জানলে মনের কোণে অতৃপ্তির দ্বন্দ্ব বিরাজ করতে পারে। কিন্তু অতৃপ্তি আমাদের প্রকৃত ক্ষুধা নিবারণ করে না। মন সবসময় জানতে চায়, বুঝতে চায়। এই আগ্রহের ফলে হয়ত আমরা জানতে পারব ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের খেলায়। তখন হয়ত কর্ম ও কর্মফলের সম্পর্ক খুঁজে পাব।

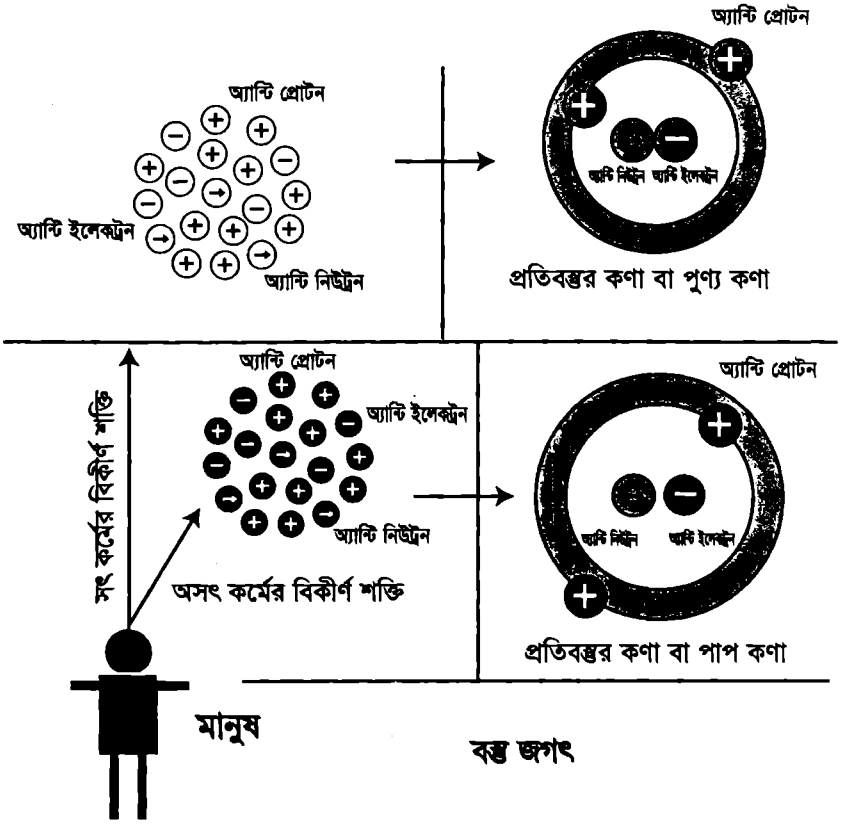

[বস্তু জগতের কর্মের বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে যেহেতু পরকালের জগৎ তৈরি করা হবে তাই পরকালের জগতকে বস্তুর বিপরীত সত্তা প্রতিবস্তুর জগৎ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।]

"যেদিন পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তন হবে এবং তারা অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত আল্লাহর সম্মুখীন হবে।" (আল-কুরআন)

www.nagorikpathagar.org

ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও পরজগতের সম্পর্ক

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক লিখতে বসে একটি ঘটনা মনে হয়ে গেল, সে ঘটনাটি এ লেখার সাথে অনেকাংশে মিল আছে বলে সে ঘটনাটি দিয়েই প্রসঙ্গটি শুরু করছি। একদিন রাতে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। বইয়ের কালো হরফের ছাপগুলো আমার হৃদয়ে এমনি অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল যার জন্য চোখের হলো বিরহ। সেদিন ঘুম মনে হয় আত্মহত্যা করে মরেই গিয়েছিল। তাই রাতের আগা গোড়ার কোন হিসাব আমার থাকেনি। পৃথিবীর উঠোনখানি কখন যে রাতের কালো বোরকা পরেছিল তার কোন সময় জ্ঞান আমার ছিল না। এক সময় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দরজা খুলে টয়লেটে যাবো স্থির করলাম। কিন্তু উঠে প্রথম দরজা খোলার সাথে সাথে আমার কানে পর পর দু'টি শব্দ বেজে উঠল। তৎক্ষণাৎ ভেবেছিলাম দ্বিতীয় শব্দটি হয়ত মেইন দরজায় হয়েছে। হয়তো বা এই মুহূর্তে কেউ রোগীর জন্য ডাকতে এসেছে। তাই তাড়াহুড়া করে টয়লেটের কাজ সেরে মেইন দরজার কাছে এসে কাঁচের জানালা দিয়ে এপাশ ওপাশ দেখতে লাগলাম। কিন্তু কাছে তখন কাউকে খুঁজে পেলাম না। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, কে? কোন সাড়া শব্দ নেই? তখন মনে একটা অজানা আতঙ্ক ভিড় করল। এতে ইতস্ততায় ভুগছিলাম, দরজা খুলে দেখবো কি? এই অজানা আতঙ্ককে পরাজিত করার সাহস সে মুহূর্তে আমার ছিলো না। তাই দরজার খিলগুলো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে, বিছানায় এসে গা লাগিয়ে শুয়ে রইলাম। কিন্তু কেন জানি ঘুম হচ্ছিল না। তাই বার বার কান পেতে শুনছিলাম, ঐ শব্দটি আবার হয় কিনা।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কোন সাড়া শব্দ নেই। নিরব নিস্তব্ধ একাকি শুয়ে আছি বলে বার বার বুকের ভেতরের প্রহরীটা কেঁপে উঠতে থাকে। কিন্তু এতো ভয়ের মাঝেও প্রকৃতি হলো বৈরী। আবার সে ডাক দিয়ে বসল। কি করব, ভয় আছে তাতে তার কি আসে যায়, প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। জোর করে চেপে ধরে তাকে বারণ করা গেল না। যেতেই যখন হবে, তাই আবার উঠে এসে দরজার খিল খুললাম। কিন্তু এবারও দরজা খুলতেই পর পর দুটি শব্দ আমার কানে বেজে উঠল। এবার যখন দরজা খুলতেই দু'টি শব্দ হলো তখন আর আমার বুঝতে বাকি রইল না। ধ্বনি হলেই তো প্রতিধ্বনি হবে তাই এবার নিশ্চিন্তেই টয়লেট থেকে এসে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ যখন মাটি দিয়ে হাঁটে তখন সে পা দিয়ে মাটিতে ঠেলা বা চাপ দেয়। এই ঠেলা বা চাপকে বলা হয় ক্রিয়া, আর মাটি পায়ের তলাতে বিপরীত দিকে যে ঠেলা দেয়, সেটি হলো সমান মানের প্রতিক্রিয়া। বন্দুক থেকে যখন গুলি বের হয় তখন সেটিও পেছনের দিকে ধাক্কা দেয়।

এ ধাক্কাটিও বলের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিঘাত যেগুলি ছুঁড়ে তার গায়েই লাগে। তাই প্রত্যেক ক্রিয়াজনিত বলের ঘাত, প্রতিক্রিয়া জনিত বলের ঘাতের সমান। এ ক্ষেত্রে যদি উভয় বলের মান সমান না হয় তাহলে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে না। পিচ্ছিল পথে এই দুই বলের মান সমান থাকে না বলে পথ চলা খুব কঠিন হয়। প্রকৃতির নিয়মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এ নিয়ম অনড় না থাকলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। কোন কোন ক্ষেত্রে এর বৈরী দ্বন্দ্ব বিরাজ করলেও প্রকৃতির সুদূর প্রসারী অনন্তে এর যোগ বিয়োগ সমান।

মানুষের সকল কাজ কর্মকে ক্রিয়া বলা চলে। আমরা বলি ঐ লোকটি কর্মব্যস্ত। এ কথা দ্বারা বুঝানো হয় যে, লোকটি কাজে আছে বা ক্রিয়াশীল আছে। কিন্তু মানুষের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা ক্রিয়ার অধীন হলেও প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক কাজের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিঘাত কিংবা প্রতিফল এই পৃথিবীতে ভোগ করে না। এখানেই শুধু প্রকৃতিতে সাম্যবস্থার মাঝে বৈরী বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কিন্তু সুদূর অনন্তে এর যোগ বিয়োগ সমান কিনা সেটিই আমাদের দেখার বিষয়।

একদিন একজন বয়স্ক লোকের দ্বারা একটি ১৩/১৪ বছরের কিশোরী সতীত্ব হরণের শিকার হলে, সে জীবনপণ সংগ্রামের মাধ্যমে তার ইজ্জত রক্ষা করে, তার নিকট থেকে ছুটে এসে, দু'হাত তুলে খুব বদদোয়া করছিল। তার বদদোয়াতে আকাশে বাতাসে মাটিতে কিংবা ঐ ব্যক্তির কোথাও কোন প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়তে না দেখে আমি বিস্ময়ে ভাবছিলাম কি ব্যাপার, ঐদিন এক দরজা খুলতে গিয়ে দুটি শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম কিন্তু আজ এই মেয়েটির কাকুতি মিনতির কোন পাল্টা প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া কেন হচ্ছে না? ধ্বনি হলেই যেখানে প্রতিধ্বনি হয় এবং ক্রিয়া হলেই যেখানে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা, আজ কি তা মিথ্যা হয়ে গেল? তবে কি নিউট্রনের সূত্র ভুল? না কি এর জন্য কোন জগৎ আছে, যেখানে এর প্রতিধ্বনি ছড়াচ্ছে বা তার প্রতিঘাত ভোগ করার ব্যবস্থা হচ্ছে?

একজন ছিনতাইকারী যখন নিরীহ পথযাত্রীকে গুলি করে তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে যায় তখন লোকটি মারা যাওয়ার আগে যন্ত্রণায় কাতরিয়ে কাকুতি মিনতি করে

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ব প্রভুর দরবারে বিচার জানায়। তারপর হয়তো সে রাস্তায়ই মরে পড়ে থাকে। এদিকে ছিনতাইকারী জনসমুদ্রের ভিড়ে নিজেকে আত্মগোপন করে নিশ্চিন্তে বহাল তবিয়তে বেঁচে যায়। এর জন্য তার কিছুই হয় না। এ সমাজে এরূপ হাজার রকম ক্রাইম করে অনেকেই বেঁচে আছে। এখানে সব ক্ষেত্রে কেন প্রতিঘাত বা প্রতিফল ভোগের ব্যবস্থা নেই? এরূপ প্রশ্ন অবশ্য অনেকের মনে উদয় হতে পরে।

এ বিশ্ব জগতের মধ্যে সকল কিছু যেমন একই স্তরে সংঘটিত হয় না তেমনি এ জগতের বিধানে রয়েছে দ্বৈত নিয়ম। যেমন প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিধান। অপ্রাকৃতিক বিধানে যত ঘটনা ঘটে তা সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এগুলো যেমন ঘটে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে তেমনি কর্মের প্রতিফলও সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এ দুনিয়ার লোকালয়ের অনেক বাইরে। তাই একে সাময়িকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। সেজন্য প্রশ্ন উদয় হলেও তাকে বিশ্বাস করতে হবে। অপেক্ষায় থাকতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের আচার আচরণের প্রতিক্রিয়া এ দুনিয়ার ঠেলা ঠেলির নিয়মে হবে না। স্রষ্টার সৃষ্ট বিধানে সেই আইন ভিন্নভাবে সাজানো রয়েছে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"তোমরা নেক কাজ করলে নিজেদের জন্যেই করবে আর দুষ্কর্ম করলে তাও নিজেদের জন্যে।" (সূরা-১৭ : ৭)

"তোমরা যেরূপ আমল করেছিলে আজ সেরূপই তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা-৪৫ : ২৮)

আল্লাহর বিচার ব্যবস্থার আইন খুব রহস্যময়। এই আইনের বিধান অনেকে টের করতে না পেরে হতাশায় ভোগে, যখন দেখে অন্যায়কারীর পরাজয় নেই, শাস্তির কোন বালাই নেই, বরং প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে তাদের উত্তরোত্তর সুনাম ও খ্যাতি দু'টিই হচ্ছে। কিন্তু এ দুনিয়াতে যদি একজন ছিনতাইকারী তার কর্মের পুরোপুরি কর্মফল ভোগ করে ফেলে তাহলে ঐ ছিনতাইকারী যাকে গুলি করে মারল সে তো তার বিচার প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। তাছাড়া একজন লোক দশ ব্যক্তিকে খুন করলে তাকে তো আর দশবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া সম্ভব নয়। এখানে শাস্তির সীমা অতিক্রম করলে কেউ জীবিত থাকে না।

পৃথিবীবাসীর এমন অনেক কর্ম আছে যার একটি কর্মফল ভোগ করতে দিলেই সে জীবিত থাকবে না। সেজন্য এ দুনিয়ায় পুরোপুরি কর্মফল ভোগ করার বিধান

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ রাখেননি। কিন্তু আমরা স্রষ্টার বিচার ব্যবস্থাকে যতই হালকা মনে করি না কেন, দুনিয়ার সবকিছু ফুরিয়ে গেলেও অন্যায়কারীর শাস্তির উপকরণ নষ্ট হবে না। ধ্বংসও হবে না। হারানোও যাবে না।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

"আমরা কিয়ামতের দিন নির্ভুল পরিমাপকারী তুলাদণ্ড রেখে দেব। কারো ওপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। যদি একটি শর্ষে পরিমাণও আমল হয় তবু আমরা তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।" (সূরা-২১ : ৪৭)

আমাদের আমলের কণাগুলো কোথায় কিভাবে রাখা হচ্ছে তা পরম স্রষ্টাই ভালো জানেন। একজন মজলুম মৃত্যু পথযাত্রীর কাঁন্নার ধ্বনিগুলো যন্ত্রণার দানা হয়ে, অদৃশ্য পালক মেলে ঘুরবে নির্মল আকাশে, অপেক্ষা করবে সেই অত্যাচারীকে ধরে শাস্তি দেয়ার জন্য। অন্যদিকে অন্যায়কারীর মন ও দেহের কুপ্রবৃত্তির দানাগুলো তার জন্য আমানত হিসেবে গচ্ছিত হবে। এই দানাগুলোই হবে তার বেদনার বস্তু। প্রতিক্রিয়াময় যন্ত্রণার উপাদান।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

"প্রত্যেকের ভালো ও মন্দ কর্মলিপি আমরা তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। আমরা তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি কিতাব বের করবো, যা সে নিজের সামনে উন্মুক্ত পাবে। তাকে বলা হবে, নিজের কর্মলিপি পড়ে দেখ। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাইল : ১৩-১৪)

এই পৃথিবীতে অন্যায়কারীকে তার কর্মের প্রতিফল পুরোপুরি ভোগ করার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এখানে যদি পাপীকে কর্মের সাথে সাথে তার প্রতিফল ভোগ করার ব্যবস্থা রাখা হতো, তাহলে সে সংশোধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। কারণ পাপীর একটি মাত্র জঘন্যতম আচরণের প্রতিফলই তার এরূপ হাজার জীবনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু পৃথিবীর জীবন তো বার বার ফিরে আসে না। দুনিয়ার জীবন একবারই আসে, একবারই যায়। তাই প্রতিক্রিয়ার ঘণ্টা বিলম্বে ধ্বনিত হওয়ার বিধান মানব জাতির পরম কল্যাণের জন্যেই রাখা হয়েছে। সময় দেওয়া হয়েছে সংশোধনের। সেজন্য আমরা আমাদের কর্মের ক্রিয়াজনিত বলের ঘাত, বিপরীত প্রতিক্রিয়া সাথে সাথে ভোগ করি না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

www.nagorikpathagar.org

"আমরা আসমান জমীন এবং তার মধ্যকার বস্তু নিচয়কে খেলার সামগ্রিকরূপে সৃষ্টি করিনি। আমরা তো এগুলো বিচক্ষণতার দাবী অনুসারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। অবশ্য তাদের বিচারের দিন পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট।" (সূরা-৪৪ : ৩৮-৪০)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।" (আল-কুরআন)

"তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতা তাদের রূহগুলো কবয করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর আঘাত করতে করতে তাদেরকে নিয়ে যাবে। এটাতো এ কারণেই করা হবে যে তারা এমন পন্থা-পদ্ধতি ও মতবাদ অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে এবং যে পথ অনুসরণ তাঁকে সন্তুষ্ট করা যেতো সে পথ অনুসরণ করা পছন্দ করেনি। এজন্যই তিনি তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ : ২৬-২৭)

আমাদের পাপ-পুণ্যের সত্তা ইন্দ্রিয় অনুভূতিতে ধরা পড়ে না। আবার এই পৃথিবীতে পুরোপুরি কর্মফল ভোগ করার মতো ব্যবস্থাও নেই। এই সুযোগে এক শ্রেণীর মানুষ পরকাল ও পাপ-পুণ্য বিশ্বাস করতে নারাজ। অন্য আর একদল আছে তারা ভাবে খোদার নির্দেশ ব্যতীত যেহেতু পাপ-পুণ্য কোন কাজই করা যায় না, সেহেতু তাদের ধারণা তারা পাপ-পুণ্য যাই করুক না কেন, তারা তার কর্তা নয়। এই বিশ্বাসের সূত্র ধরে তারা আরও মনে করে, খোদা যেভাবে চালায় সেভাবেই যখন চলতে হয় সুতরাং খারাপ কাজ করলেও তাদের কোন দোষ নেই। তাদের ধারণা যিনি পাপ করান তিনিই তা মাফ করে দিবেন।

আল্লাহ বলেন, "মানুষ কি এটা মনে করে বসেছে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে।" (সূরা আল-আনকাবূত)

প্রকৃতপক্ষে তাদের বিভ্রান্তির মূল বিষয় হলো, তারা মনে করে তারা পাপ-পুণ্যের কর্তা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যাদের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে তাদের কর্মের কর্তা সে নিজেই। স্রষ্টা শুধু ব্যক্তির বাসনা নিবৃত্ত করার হুকুম বা নির্দেশই দেন। সুতরাং যিনি বাসনার গাছ লাগাবে, তিনি তার ফল ভোগ করবেন। খোদার সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা এতো নিখুঁত ও রহস্যময় যা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হয় না। সেজন্য আমরা এই– সেই বলে থাকি। অথচ স্রষ্টার সৃষ্টি জগতের রহস্যময় ব্যবস্থাপনা তলিয়ে দেখলে একথা স্বীকার করতে হবে যে, এর জন্য দায়ী আমরাই।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিক্রিয়ার পুণ্য জগৎ

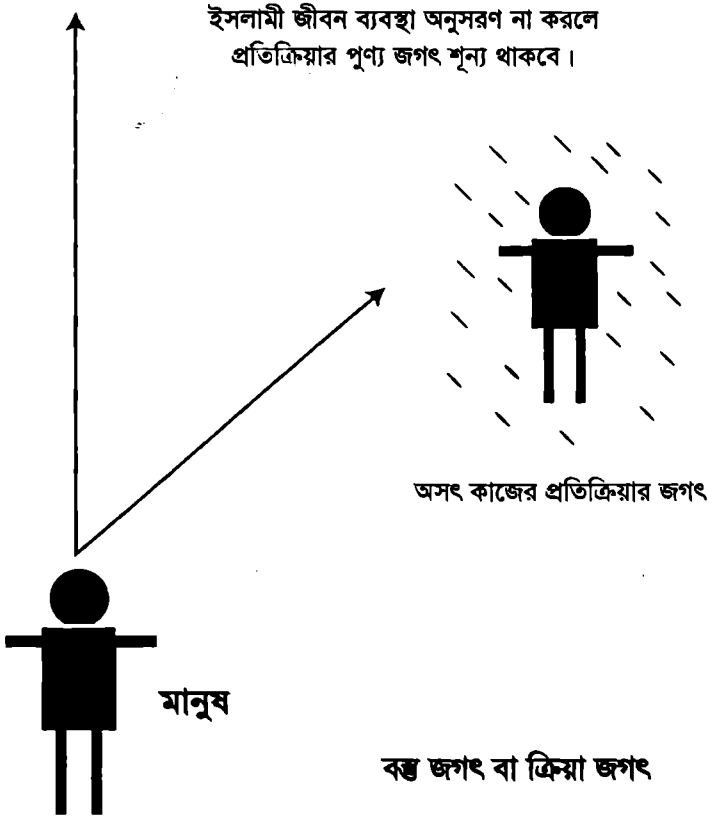

"তা আর কিছুই নয়, তোমাদের কৃতকার্যসমূহেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। পৃথিবীতে যে যা কিছু করবে তার অধিক তাকে দেয়া হবে না।" (আল-হাদীস)

"আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব, তারা যে সকল অসৎ কাজে লিপ্ত ছিলো তা তাদের ঐসব কৃতকার্যের ফল।" (আল-কুরআন)

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করেছে তা নিজের জন্যই করেছে।" (আল-কুরআন)

www.nagorikpathagar.org

পাপ-পুণ্যের কর্তা কে?

আমাদের সমাজে এক ধরনের ফকির, সাধু আছে, এরা গানের সুরে বলে, যেমনি ঘুরাও তেমনি ঘুরি, পুতুলের কি দোষ? কথায় বলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। স্রষ্টার নির্দেশ ব্যতীত পৃথিবীতে কেউ কোন কাজ করতে পারে না। এমনকি গাছের একটি শুকনো পাতাও তাঁর নির্দেশ ব্যতীত মাটিতে পড়ে না। তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে আমাদের পাপ-পুণ্যের কর্তা কে? অনেকে মনে করেন, খোদার হুকুমে যেহেতু ভালো-মন্দ উভয় কাজ করতে হয়, সেজন্য পাপ-পুণ্যের কর্তা আল্লাহ নিজেই। এরূপ ধারণা থেকেই ফকির, সাধুরা পুতুলের মতো নাচতে থাকে, গাইতে থাকে।

মূলত ঘটনাটি একটু জটিল ও রহস্যময়। সাধারণ অর্থে এর উত্তর এরূপ দাঁড়ালেও গভীর দৃষ্টিতে অন্তর কম্পিউটার দিয়ে নিরীক্ষা করলে মূল জিনিসটির রহস্যের দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু যাদের অন্তর দরজায় তালা দেওয়া, যারা হুকুমদাতা বা আদশেকারীকে পাপ-পুণ্যের কর্তা মনে করেন, তাদের এই ধারণা নেহায়েত অমূলক ও ভ্রান্ত। আকাশের মেঘমালার বিচরণ, পেশাদার খুনীর হাতে অস্ত্র চালানোর ক্ষমতা, এসবই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই হয়। মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক বিধানের অধীনে কিছু জিনিস আছে, যাদের স্বকীয় ইচ্ছা শক্তি অকার্যকর। যেমন পৃথিবী চাইলেই পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে ঘুরতে পারবে না, তেমনি সূর্য চাইলেই তার ঘূর্ণন বন্ধ রাখতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তাদের স্বকীয়তা পরম সত্তার ইচ্ছাধীন। তাই তারা জবাবদিহির বাধন থেকে নৈতিকভাবেই মুক্ত।

পক্ষান্তরে সৃষ্টির সেরা প্রাণী হিসেবে মানুষের ইচ্ছার স্বকীয়তা আছে, কর্মের স্বাধীনতা আছে। যাদের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে, তাদের বাস্তব জীবনের আচার-আচরণ তার নিজের ইচ্ছাধীন। এ ক্ষেত্রে সে নিজে স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণা এবং কর্মের জন্য নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। তবু কথা থেকে যায়, মানুষ যতই স্বাধীন হোক না কেন তবু তার কাজের জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। তবে ইচ্ছার স্বকীয়তার জন্য তাকেই ভালো মন্দের দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই যখন স্রষ্টার আদেশের প্রয়োজন হয় তাই কিছু অবুঝ লোক প্রশ্ন তুলে ভালো মন্দ সবই যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত করা সম্ভব হয় না সুতরাং যিনি নির্দেশকারী তিনিই পাপ-পুণ্যের কর্তা। তারা এর স্বপক্ষে আরও যুক্তি দেখায়, যে কাজে পাপ হয় তা তো আল্লাহ ভালো করেই জানেন কিন্তু তিনি এ কাজের হুকুম না দিলেই তো পারেন অর্থাৎ তিনি নির্দেশ না দিলে তো কাজ করাই সম্ভব হতো না। সুতরাং এতে যে অন্যায় করে তার দোষ কোথায়?

www.nagorikpathagar.org

আসলে এসব যুক্তি একটি চূড়ান্ত সত্যের ওপর একটি অতিক্ষীণ প্রলেপ মাত্র। এই প্রলেপ ঘষে দূর করে দিলে, দেখা যাবে মূল সত্যের আলো। আমাদের বিবেক ও ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতায় এই প্রলেপ কোন প্রতিবন্ধকই নয়। মানুষের যেমন ইচ্ছা আর কর্মের স্বকীয়তা আছে, তেমনি তার হৃদয় কুঠুরীতে বাস করে ভালো মন্দ ফারাক করার মতো বিবেক নামের এক প্রহরী। সে ভালো মন্দের ঘ্রাণ নিয়ে ইচ্ছা শক্তির স্বকীয়তার কাছে যুক্তি আপীল করে। বিবেক সকল ক্ষেত্রে ভাল কাজে সায় দেয়, মন্দ কাজের বিরোধিতা করে। কিন্তু ইচ্ছা শক্তি যদি বিবেকের যুক্তি না শুনে, তখন বিবেক নিরব হয়ে যায়। যখন বিবেক ইচ্ছার ব্যগ্রতার কাছে হার মানে তখন মনের স্পন্দনে দেহ যখন তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য উদ্যত হয়, সে মুহূর্তে স্রষ্টার নির্দেশ আসে। এতে করে বিবেক কর্মের প্রতিফল ভোগ করার জন্য স্রষ্টার কাছে নালিশ করে।

পক্ষান্তরে কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে মনের স্পন্দনে নিজ দেহ ও মনের ভেতর থেকে যে সত্তা তৈরী হয় এটিই পাপ-পুণ্য বিধায় ব্যক্তি নিজেই এর কর্তা। এখানে অবশ্য একটি প্রশ্ন থেকে যায়, যা সাধারণের বিবেকে উদয় হতে পারে। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যখন কোন লোক মন্দ কাজ করার জন্য উদ্যত হয় বিবেককে অবদমিত করে তখন তো আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের ইচ্ছা শক্তিকে নিবৃত্ত করতে পারতেন। কিন্তু সে মুহূর্তে কেনইবা তিনি করেন না?

আল্লাহ পারেন না, এমন কোন কাজ নেই। তিনি ইচ্ছার ব্যগ্রতা ও কর্মের স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তিকে কর্ম সম্পাদনের মুহূর্তে নির্দেশ দেন। এখানে যেমন তাঁর হুকুম ব্যতীত কিছুই হয় না তেমনি তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে ইচ্ছার ব্যগ্রতাকেও অবদমিত করেন। এ ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনকারীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাছাড়া যে কর্মটা সম্পাদন করার জন্য ইচ্ছাকারী চেষ্টা করছে তা আসলেই তকদিরে উল্লেখ নেই। এসব ক্ষেত্রে ইচ্ছাকারীর ইচ্ছার ব্যগ্রতা অবদমিত করা হয়।

বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি কূলের প্রতিটি রেনু দানা আল্লাহর সৃষ্টি সত্তার অধীন বা তাঁর প্রকাশের আবরণ বা চিত্র। সমস্ত বিশ্বই তাঁর অনুশাসনশীল রাজ্য।

আমাদের আত্মার প্রকাশের আবরণ এই জড় মূর্তিটিও মনের রাজ্য। মন একে শাসন করে। দেহ রাজ্যের কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে তার আবেদন নিবেদনের সংকেত যদি মনের বারান্দায় এসে কাকুতি মিনতি করতে থাকে, তখন মন তার সমস্যা সমাধান করার নির্দেশ দেয়। এখানে মন শুধু নির্দেশ প্রদান করে। মন যদি দেহের প্রেরিত আবদার না শুনে, তাহলে মনের পক্ষে একাকি পুরো দেহরাজ্য শাসন করা সম্ভব হবে না।

www.nagorikpathagar.org

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মশার আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য দেহের প্রান্ত ভাগ হতে যখন মনের কাছে সংকেত পাঠানো হয়, তখন মন বাধ্য হয়ে তাকে রক্ষা করার জন্য হাতকে নির্দেশ দেয়। এই সংকেত বা নির্দেশ পেয়ে হাত দেহকে রক্ষা করতে তৎপর হয়। পরম সত্তার (আল্লাহর) পক্ষে এই বিশাল সৃষ্টির খবরাখবর রাখার মহাব্যবস্থাপনার বিষয়টিও তেমনি রহস্যময়। এই সংকেত এতো তড়িৎ আদান প্রদান হয়, যার সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই।

কোন ব্যক্তির ইচ্ছার ব্যগ্রতার সংকেত যখন পরম সত্তার কাছে পৌঁছে তখন তার কর্ম ভালো মন্দ যাই হোক, সে ব্যক্তি স্রষ্টার কাছ থেকে নির্দেশ পাবেই। ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তি থেকে যখন Positive Impulse (ইতিবাচক সংকেত) বা Conduct of afferent Impulse প্রেরিত হয়, তখন স্রষ্টার পক্ষ থেকে Negative Impulse (নেতিবাচক সংকেত) বা Efferent Impulse আসে। এই নির্দেশ পেয়ে ব্যক্তি কর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু এই Negative Impulse-এর সংকেতে যখন ঘটনা পর্বটি সম্পন্ন হয় তখন তার সত্তার থেকেই একটি Negative dimension-এর জাত পয়দা হয়। তাই Negative dimension-এর সত্তা তৈরীর জন্য Positive Impulse যে তৈরী করে সে-ই-দায়ী। তাই মানুষের কর্মফল নিজেরই অর্জিত। তবে আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কেউ কোন কাজ করতে পারে না।

কথায় আছে যেমন কর্ম তেমন ফল। অর্থাৎ যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া। রহিম ভাত খেয়েছে এর জন্য শক্তি কিন্তু করিম পাবে না। করিম বন্দুক দিয়ে গুলি ছুড়েছে তার ধাক্কা রহিমের গায়ে লাগবে না। বরঞ্চ যে কাজ করবে, সে এর প্রতিক্রিয়া টের পাবে। সেজন্য যে কর্ম করবে, সে ব্যক্তিই কর্মফলের জন্য দায়ী থাকবে। যেহেতু সমস্ত বস্তুর স্থিতি আল্লাহ থেকেই উদ্ভব হয়েছে অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি তাঁরই ক্ষমতাধীন সে কারণে আল্লাহ নিজেই পরোক্ষভাবে সকল কর্মের আদেশ দাতা। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি সত্তাতে কেউ কষ্ট ভোগ করলে, এতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। অর্থাৎ এর জন্য আল্লাহর অনুভূতিতে কোন কষ্টই অনুভূত হবে না। কারণ কষ্টবোধ হওয়া আল্লাহর গুণাবলীতে নেই। যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি সত্তাতে সকল কিছুই তাঁর ক্ষমতাধীন, সেহেতু শান্তি বা অশান্তি, সুস্থতা কিংবা অসুস্থতা, ধনী কিংবা দরিদ্র, এসব তাঁর বেলায় বলা বা ভাবার কোন প্রশ্নই আসে না। এগুলোর প্রশ্ন শুধু একাধিক্যের বেলায়ই চলে। একক, অনাদি ও পরম সত্তার বেলায় তার কোনটিও প্রযোজ্য নয়।

আল্লাহর সৃষ্টি সত্তাতে কোন মানুষ কষ্ট ভোগ করলে তাতে আল্লাহর কিছু যায়, আসে না। যেমন একজন মানুষ হিসেবে আমি কখনো কষ্ট পাবো না যতক্ষণ না

www.nagorikpathagar.org

আমার শারীরিক ও মানসিক সত্তার বহির্ভূত অন্য কোন সত্তা আমার অস্তিত্বের ওপর আঘাত না করে। এই সত্তা কোন জীবাণু কিংবা মানসিক ব্যথা, বেদনাও হতে পারে। এসব সত্তা আমাদের দেহ ও মনের সত্তাধীন নয় বলে এগুলোর দ্বারা আমরা কষ্ট পাই। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি সত্তাতে এমন কিছু নেই, যা তাঁর সৃষ্টি সত্তার বহির্ভূত কিংবা তিনি তার মালিক নন। কষ্ট বোধ হওয়া শুধু একাধিক্যের বেলায় প্রযোজ্য। আমি ততক্ষণই সুস্থ থাকব, যতক্ষণ আমার মন ও শরীর পরজীবি কোন সত্তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমার মন ও অস্তিত্বের (শরীরের) বাইরের কোন সত্তা যখন এর ওপর চড়ে বসে, তখনই আমার অনুভূতিতে কষ্টবোধ হবে। কিন্তু এমন কোন সত্তা আছে কি, যা আল্লাহর রাজ্যের বাইরে থেকে এ সৃষ্টিতে ঢুকতে পারবে? নিশ্চয়ই নয়।

কারণ সকল রাজ্যই আল্লাহর মালিকানাধীন। অতএব কষ্ট বোধ হওয়া শুধু একাধিক্যের বেলায়ই প্রযোজ্য। সৃষ্টির সম্প্রসারণের জন্য আল্লাহর সৃষ্টিতে সকল কিছুই নিজ কর্মের জন্য দায়ী। কর্মের স্বাধীনতা আর ইচ্ছার স্বাধীনতা থেকেই যেহেতু কর্মফল তৈরী হয়, সে কারণে যাদের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে তারা নিজেরাই পাপ-পুণ্যের কর্তা। বিশ্বের সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় afferent (অন্তর্মুখী) আর efferent (বহির্মুখী) বার্তাই সৃষ্টিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলছে। মূলত efferent বার্তাকে যদি Positive Impulse (ইতিবাচক সংকেত) আর afferent বার্তাকে (নেতিবাচক সংকেত) মনে করি তাহলে এর আদান-প্রদানে যে নতুন সত্তা সৃষ্টি হয় সেটিই পরজগতের উপাদান। তাই একে Negative dimension এর সত্তা বলতেইবা আপত্তি কিসের? কিন্তু Negative dimension হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন।

বস্তুর উপাদান ও Negative-এর উৎস

কাঠ আর লোহা দিয়ে যেভাবে মিস্ত্রি আসবাবপত্র তৈরী করে, তেমনি স্রষ্টা এ বিশ্বকে পয়দা করেননি। তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন কার্পেন্টার গড নন। একাধারে তিনি যেমন বস্তুর স্রষ্টা তেমনি তিনি ঐ বস্তুর উপাদানেরও স্রষ্টা। এ জগতে কোন একসময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিরই অস্তিত্ব ছিল না। তখন তো বস্তু ছিলই না, সেই সাথে এর উপাদানও ছিল না। অর্থাৎ সে সময় পুরুষ (+) ও স্ত্রী (−) আদানের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক উপাদানেরও জন্ম হয়নি। হয়ত ছিলও না নিউট্রিনো নামের কোন উপাদান। এমন এক অনস্তিত্বশীল জগতে কি করে কোথা হতে এই বিশ্ব-জগতের বস্তুর উপাদান, বস্তুর অভ্যন্তরের Positive আদান ও Negative আদান এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সৃষ্টি হলো? মূলত

www.nagorikpathagar.org

তা জানতে হলে আমাদেরকে অনেক দূর অতীতের দিকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের মাধ্যমে অতীতের অনেক কিছুই জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান কি করে দ্বৈত রূপ ও নৈর্ব্যক্তিক (নিউট্রন) সত্তা সৃষ্টি হলো এ সম্পর্কে কিছুই খবর রাখে না। আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য এই বিশ্বকে তরঙ্গের লীলা খেলা মনে করে। এই পাহাড়, পর্বত নদী-নালা, সাগর, মহাসাগর এবং বিশ্বময় যত পদার্থ আছে– এসবই হলো তরঙ্গের গাঁথনিযুক্ত বড় রকমের বোঝা। অপরদিকে পদার্থের সূক্ষ্মাতীত কণা হলো তরঙ্গের প্যাকেট। আমরা যে পথ দিয়ে হাঁটি সেটিও ঢেউ বা তরঙ্গের বোঝা। আমাদের দেহাবরণটিও জীবন্ত ঢেউ বা তরঙ্গের সারি, যা প্রাচীরের মতো সাজানো রয়েছে। এসব ভাবলে অবাক হয়ে শির নত করা ব্যতীত আমাদের আর কিছু করার থাকে কি?

বস্তুর অভ্যন্তরে যে চারটি মৌল কণা রয়েছে, যা দিয়ে পদার্থ গঠিত হয়েছে, সেগুলো হলো : প্রোটন (+), নিউট্রন (নৈব্যক্তিক), ইলেকট্রন (-) এবং নিউট্রিনো। এদের মাঝে কি করে নর-নারীর মতো সম্বন্ধ গড়ে উঠল, বিজ্ঞান কি তার জবাব দিতে পারবে? আমার ধারণা বিজ্ঞানের হাতে পরীক্ষিত কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু বস্তুর আদি উপাদান তরঙ্গ বা ঢেউ থেকে যদি সে রহস্যের অনুসন্ধান শুরু করা যায় তবে তরঙ্গের প্রকৃতি ও গতিপথ ধরে সে বিষয়ের যে তথ্য পাওয়া যাবে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

রূহ আমাদের পরম সত্তা। এর রাজ্য হলো দেহ। আমাদের মনের অভিব্যক্তি এ দেহ রাজ্যের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ঢেউ বা তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হয়। আবার দেহ কোষের প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকেও ঢেউ বা তরঙ্গের ন্যায় সংকেত আসে মনের নিবিড় কুটিরে। আমাদের দেহের ভেতরে এই ঢেউ দু'টি উৎস থেকেই উৎপন্ন হয়। যেমন মন থেকে এবং অঙ্গের অগ্রভাগ থেকে। এদেরকে বহির্মুখী ও অন্তরমুখী তাড়না বলা চলে। এখানে ঢেউ বা তরঙ্গের প্রকৃতি ও গতিপথের উৎস দু'টি। অর্থাৎ প্রয়োজন সাপেক্ষে ঢেউ আদান ও প্রদান হয়। মূলত একই জিনিস বা সত্তা থেকে ঢেউ আদান ও প্রদান হতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে দু'টি সত্তা। কিন্তু এভাবে ঢেউ আদান ও প্রদানের ফলে বাইরের সত্তা থেকে মূল সত্তার নির্দেশের মাধ্যমে নতুন এক জগতের উদ্ভব হবে। কার্যতঃ এটিই Negative জাত। এ ধরনের জাত পরোক্ষভাবেই সৃষ্টি হয়।

এখানে দেহের মূল সত্তাকে Positive হিসেবে এবং মনের নির্দেশকে নিউট্রন এর মতো আঘাতকারী (উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী) হিসেবে ধরলে, এর ফলে দেহের কার্য সম্পাদনকারী অঙ্গ থেকে যে উদ্দীপক সত্তা সৃষ্টি হবে, সেটিই Negative জাত।

www.nagorikpathagar.org

পক্ষান্তরে এই গতির কার্যক্রম চালু থাকলে এর কিছু অংশ বর্জ্য হবেই। মহাসৃষ্টির এই বর্জ্য নিউট্রিনোর সাথেও সম্পর্কিত থাকতে পারে।

এই বিশাল জগৎ আল্লাহ তা'আলার রাজ্য। এ রাজ্য অনাদিকাল থেকে এভাবে সাজানো ছিল না। আদি অবস্থায় পরমস্থিতির জগতে কিছুই ছিল না। তখন তিনি (আল্লাহ) 'কুন ফাইয়াকুনের' মাধ্যমে সৃষ্টির অস্তিত্ব পয়দা করেন। তখনকার পরমস্থিতির জগৎটি অবস্থান্তর হলে তাতে জাগে পরম গতি। সেই স্তর হলো আল্লাহর নূর এর জগৎ। মহান আল্লাহ– ঐ পরিসরে প্রত্যক্ষভাবে আদম (আ)কেই সৃষ্টি করেন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে যা সৃষ্টি করেন তাঁর বৈশিষ্ট্য পুরুষ জাতের সাথে সম্পর্কিত। তখন আদম (আ) ছিলেন সঙ্গীহীন। এতে তাঁর মনে নিঃসঙ্গতার আবেগ পয়দা হয়। সেই আবেগের প্রতিধ্বনি কালক্রমে খোদার দরবারে পৌছে। পরিশেষে আল্লাহ্ নির্দেশ পাঠান আদম (আ)-এর কাছে। এতে আদমের (আ) নিজের অস্তিত্ব থেকেই তার সমমনা যে সত্তা তৈরী হলো সে সঙ্গী ছিল Negative সত্তা। পক্ষান্তরে এই প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত হতে মূল থেকে কিছু অংশ বিচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। এটিই সৃষ্টি জগতের বৈরী সত্তা। প্রসঙ্গত এই বৈরী সত্তা সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য ছিল। এই বৈরী সত্তাকে মহা সৃষ্টির বর্জ্যও বলা চলে।

এ মহাবিশ্বের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দু'টি জগত রয়েছে। একটি হলো আত্মিক জগৎ এবং দ্বিতীয়টি জড় জগৎ। মূলত দু'টি জগৎ পৃথক পৃথক হলেও আত্মিক জগতের নিগূঢ় ব্যবস্থাপনার মাধ্যম থেকেই যে জড় জগতের আদি উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, নিম্নের ধারণা থেকে সে বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুর সূক্ষ্ম উপাদান প্রোটন (+) ও ইলেকট্রন (-) পরস্পরকে নর-নারীর মতো আকর্ষণ করে এবং বস্তুর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সাথে বাঁধা আছে নিউট্রন, আবার সেই অস্তিত্বের সাথে বিপরীতমুখী আকর্ষণ নিয়ে লেগে আছে নিউট্রিনো। এসব দেখে অনুমান করা যায়, বস্তু জগতের উপাদান আত্মিক জগৎ থেকেই পয়দা হয়েছে। বস্তুর এই উপাদানগুলো তরঙ্গের প্যাকেট। খোদার 'কুন ফাইয়াকুন' বলার মাঝে তরঙ্গ বা ঢেউ-এর মৌলিক রূপ থাকা স্বাভাবিক। তবে আল্লাহ যেহেতু মানুষের মতো কথা বলেন না, সেহেতু আমাদের মনের প্রেরণা যেভাবে দেহ রাজ্যে তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়, হয়তো সেভাবেই খোদার ইচ্ছার প্রভাব সৃষ্টিতে প্রেরিত হয়। আবার সৃষ্টির ইচ্ছা খোদার কাছে তরঙ্গের আকারেই পৌছে। খোদার নির্দেশে সৃষ্টির ইচ্ছায় তার (সৃষ্টির) নিজের অঙ্গ থেকে যে সত্তা তৈরী হয় এর সাথেই Negative এর সম্পর্ক আছে। বস্তুর আদি উপাদান কোথাও মওজুদ ছিল না। সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজ ক্ষমতা বলে।

www.nagorikpathagar.org

একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ বিশাল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর মধ্যে আল্লাহর প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হলো Positive সত্তা-এর উৎস থেকেই জগৎ বিকশিত হয়।

আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি এক আত্মা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সহধর্মিণীকে এবং সেই দু'জন (আদম এবং হাওয়া) থেকে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা-৪ : ১)

আমরা এই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র এক গ্রহ পৃথিবীতে বাস করি। আমরা স্রষ্টার প্রতিনিধি। এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যই বিশ্বের পরম স্রষ্টা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর বাণিজ্যশালায় আমরা স্থায়ী না হলেও সৃষ্টি হিসেবে আমাদের এখানে অপূর্ণতা নেই। এখানে আমরা কাজ করি মনের তাড়নায়। আমাদের মনের কামনার দানাগুলো দেহকে কর্মচঞ্চল করে। সৃষ্টি হিসেবে আমাদের মনের তাড়নায় নিজ দেহ সত্তা ও মনের গহিন কুঠুরি থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হবেই। এই সৃষ্টিও এক অর্থে Negative সত্তা। কারণ দুনিয়ায় সৃষ্টির অভাববোধ থেকে স্রষ্টার ইচ্ছায় যা কিছু সৃষ্টি হবে সেটিই পরোক্ষ সৃষ্টি। এই পরোক্ষ সৃষ্টির অদৃশ্য দানাগুলোকে Negative dimension-এর সত্তা বলতে বাধা কিসের? আর পরকালকে Negative dimension এর জগৎ বলতে অসুবিধাই বা কি? কারণ সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার নির্দেশে আমাদের অস্তিত্ব হতেই তো সেই Negative সত্তা তৈরী হয়ে উড়ে যাচ্ছে অনন্তের দিকে।

আধুনিক বিজ্ঞানের কলা কৌশল এক সত্তা থেকে অন্য সত্তা বা অধিক সত্তা তৈরী হওয়ার সন্দেহ একেবারে দূর করে দিয়েছে। এখন বিজ্ঞানের কাছে এটি কোন রহস্যের ব্যাপার নয়। যেমন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, ইউরিনিয়ামের একটি আইসোটোপের নিউক্লিয়ার ফিশন বা বিভাজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে মূল নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে প্রায় সমান আকারের দু'টি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এভাবে বার বার আঘাত করতে থাকলে ফিশন শিকল বিক্রিয়ায় প্রচুর নিউক্লিয়ার শক্তি বের হয়ে আসে। এখানে আইসোটোপ হলো একই মৌলের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যার পরমাণুতে অবস্থিত নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন। এই ফিশন শিকল বিক্রিয়ায় দেখা যায় নিউট্রনের আঘাতের ফলে একটি হতে দু'টি তার থেকে পর্যায়ক্রমে তারও অধিক নিউক্লিয়ার শক্তির জন্ম হয়। কি বিচিত্র এই কৌশল। এই কৌশলটি একটি বস্তু সত্তা থেকে আর একটি বস্তু সত্তা সৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত

www.nagorikpathagar.org

কানুন। এটি মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার করে বিস্ময় সৃষ্টি করলেও মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির বিবর্তন খেলা যে এভাবেই শুরু করেছেন তার কিছু প্রমাণ আমরা আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (সহধর্মিণী) সৃষ্টির মর্মকথা থেকে অনুধাবন করতে পারি। তবে এ কথা সত্য যে, মানুষের আবিষ্কার যেমন সুফল দিতে পারে, আবার সেটি প্রয়োগের ব্যতিক্রমের জন্য ক্ষতিও করতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ সৌভাগ্যবান হতে পারে, আবার দুর্ভাগ্যবানও হতে পারে। মূলত পুরা বিষয়টির সুফল-কুফল নির্ভর করবে প্রয়োগ বা কর্মনীতির ওপর।

এ জগতের কোন কিছুর আকার ও গুণ চিরন্তন নয়। যখন কোন আকার বিলুপ্ত হয়ে অন্য আকারে প্রবেশ করে কিংবা তার অস্তিত্ব থেকে অন্য কোন সত্তা পয়দা হয়, তখন তার গঠন ও গুণের পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমাদের দৈহিক গঠনের সূক্ষ্ম আকার ভেদ করে যে সত্তা মনের ইঙ্গিতে খোদার ইচ্ছায় পয়দা হয়ে পালিয়ে যায় সেই পরোক্ষ বা Negative সৃষ্টির উপাদান ও তার গুণাগুণ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক অজানা সত্তা। যার সাথে বর্তমানের কোন সম্পর্ক নেই। সেজন্যই পরকালীন জীবন ব্যবস্থার সাথে দুনিয়ার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

এ পৃথিবীর যাত্রীগণ অজানা গন্তব্যের দিকে, নিজের ইচ্ছার বিপরীতে হলেও ছুটে চলেছে চাঁদ, সূর্যের মতো বিরামহীনভাবে। গতির স্তব্ধতা ঘটলে চাঁদ সূর্যের যেমন মৃত্যু হবে, তেমনি পৃথিবীর যাত্রীদের জীবন চাকা অচল হলেই 'মৃত্যু দূত' জীবন প্রদীপ নিয়ে চলে যাবে। এ সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ খোদার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ও সফল সৃষ্টি। এখানে মানব গঠনের পূর্ণতা ঘটলেও এ দুনিয়ায় মানুষের সময়ের পূর্ণতা নেই। মৃত্যুর জন্য মানুষ কোন বিষয়েই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সে কারণেই স্রষ্টার বিবর্তন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করে এখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একথা বলা ঠিক নয়। বরং এক চিরস্তায়ী অস্তিত্বের দিকে ক্রমেই তা এগিয়ে যাচ্ছে। যেদিকে আমরা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছি, সেই জগতের রহস্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে মানব সৃষ্টির রহস্য। এ রহস্য রাজ্যের মানুষ খোদার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে ফিরে যাবে সেই স্থিতির রাজ্যে। সেই রাজ্যে সূর্য নেই, চাঁদ নেই, পদার্থ নেই, সন্তরণ নেই। অথচ এই পৃথিবীতে কিংবা সৌরমণ্ডলের কোন একটি কণাও স্থির নয়। কারণ গতির যাত্রা শুরু হয়েছে পরমস্থিতি থেকে। মূলত: গতির মধ্যে কারও কোন স্থায়িত্ব থাকে না। শুধু স্থিতির রহস্যের অন্তরালে বিশ্বের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। আমাদের এ পৃথিবীর রঙ্গ-মঞ্চ গতির ঢাক্না দিয়ে ঝুলানো। এটি একবার স্থির হলেই তা কোথায় যে হারিয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারবে না। সকল কিছুর যখন দ্বৈত

www.nagorikpathagar.org

রূপ আছে, এ সূত্র থেকে একথা বিশ্বাস করা যায় যে, গতির দ্বৈত রূপ স্থিতি জগৎ যে আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া সৃষ্টির কর্ম প্রেরণা বা অভাববোধ থেকে খোদার নির্দেশে, তার নিজের থেকে যেটি সৃষ্টি হয়, সেটি যেহেতু Negative সত্তা সুতরাং Negative dimension-এর জগৎ থাকাও স্বাভাবিক।

(ক)

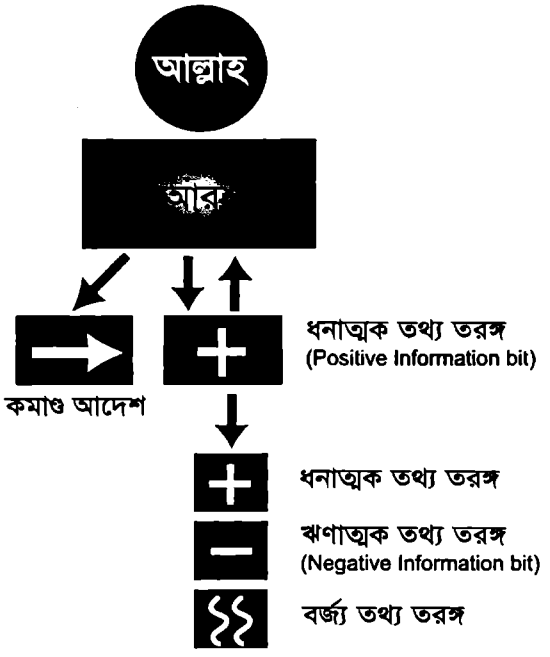

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি গঠন করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী।" (সূরা নিসা : ১)

"আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) কে পয়দা করলেন, তাঁকে পয়দা করে তাঁর ডান কাঁধে করাঘাত করলেন, তারপর তার সন্তানদেরকে বের করলেন, এরা এরূপ শুভ্র যেন মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল দুগ্ধ। তারপর তিনি তাঁর বাম কাঁধে করাঘাত করলেন এবং কৃষ্ণকায়া সন্তান বের করলেন; যেন তারা কালো কয়লা। তারপর তিনি তাঁর ডান হাতের সন্তানদের সম্বন্ধে বললেন, এরা জান্নাতবাসী হবে আর তাতে কোনো পরওয়া নেই। আর তাঁর বাম হাতের তালুস্থিত সন্তান সম্বন্ধে বললেন, "এরা জাহান্নামে যাবে, আর এই ব্যাপারে কোনো পরওয়া নেই।" (আহমদ ও ইবনু আসাকির, ইহা আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

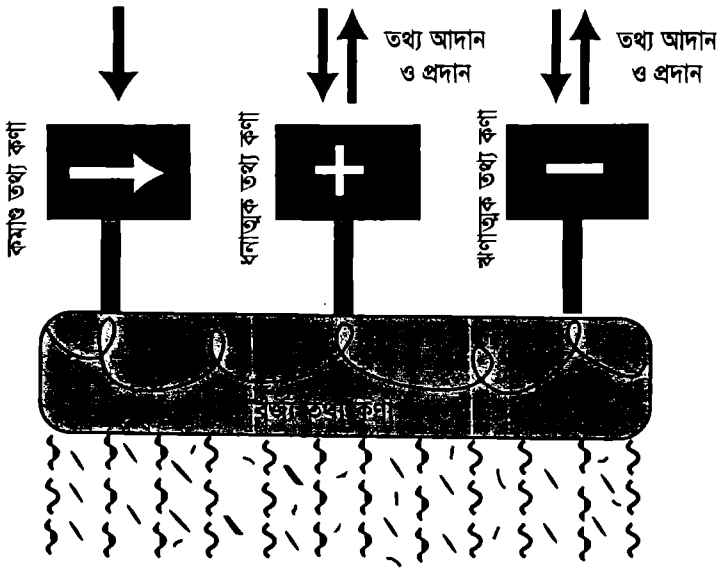

আণবিক গ্লু, ফোটন বা কোয়ার্ক

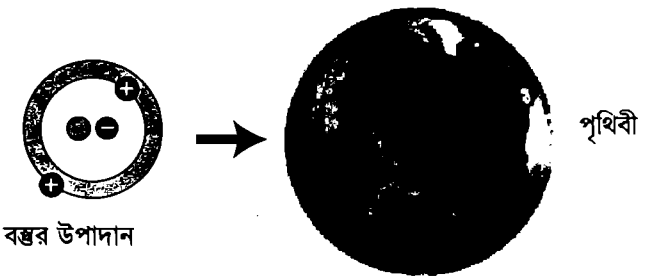

বস্তুর উপাদান

www.nagorikpathagar.org

গতি, স্থিতি জগৎ ও পরজগতের সম্পর্ক

স্থির অবস্থা থেকে অবস্থান্তর হওয়ার নাম গতি। বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিশ্বে কোন কিছু পরম স্থিতি অবস্থায় নেই। সেজন্য পরমগতি লাভ করাও অসম্ভব। কারণ পরম স্থিতি থেকে যা অবস্থান্তর হয় এর নাম পরম গতি, সেটি সম্ভব হয় না। আপাত দৃষ্টিতে যেগুলোকে স্থির মনে হয় সেটা তার আপেক্ষিক স্থিতি। কারণ এ বিশ্বে কোন জিনিস স্থির অবস্থায় নেই। পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি গাড়ি যখন আপেক্ষিক স্থিতি অবস্থা থেকে তার গন্তব্যের দিকে ছুটে চলে, তখন তার প্রাথমিক অবস্থাটিকে আমরা স্থিতি মনে করি কিন্তু গতিপ্রাপ্ত অবস্থাও সেটি আজীবন চলতে থাকে না। কোন এক সময় সেটি তার গন্তব্যে পৌঁছে স্থির হয়ে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্থির অবস্থায় তার কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গতিশীল অবস্থায় সেটি না খেয়ে চলতে পারে না। এ সময় এর সবকিছুর মাঝে সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রয়োজন হয় বিশ্রামের। সাথে সাথে রোগ বালাই বা যান্ত্রিক ত্রুটি এবং মৃত্যু সমস্যাও তার পিছু ধাওয়া করে। তাই গতির জগতটিতে সবসময় অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। এখন প্রশ্ন হলো, সকল গতিশীল বস্তু যখন স্থিরতা চায়, বিশ্রাম চায়, তাহলে এই গতির জগতটি কি কখনো স্থির হয়ে থমকে দাঁড়াবে? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের উত্তর হলো গতি চিরন্তন হওয়া অবাস্তব। একে কোন না কোন সময় স্থির হতেই হবে। তাছাড়া অন্য আর একটি যুক্তিতে বলা যায়, যেহেতু বিশ্ব প্রকৃতিতে সকল কিছুর দ্বৈত রূপ আছে, সেদিক থেকে গতির দ্বৈত রূপের স্থির অবস্থা তো থাকবেই। তবে এই বিশ্ব যেদিন স্থির হয়ে যাবে, সেদিন তার বর্তমান কাঠামো ধ্বংস না হয়ে থাকতে পারবে না। পক্ষান্তরে এই বিশ্ব ধ্বংসের পর তার ভর-শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘুমিয়ে যাবে না। একদিন হয়তো কালের উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের শেষ ধাপে সেই নিষ্ক্রিয় সত্তাগুলো নতুন সাজে জেগে উঠবে। বিজ্ঞানীগণের ধারণা হলো, নিউট্রিনো নামক এক প্রকার কণার আকর্ষণের ফলে এই বিশ্বের সম্প্রসারণ একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর এ আকর্ষণের ফলেই বিশ্ব আবার সঙ্কুচিত হয়ে আদি মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) পূর্বে বিশ্ব যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। এবং আবার মহাবিস্ফোরণের ফলে পুনরায় এই বিশ্ব নতুনভাবে সৃষ্টি হবে।" (আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন)

বিশ্ব যদি স্থির হয়ে যায়, তখন সময়ের ঘণ্টা অনড় হয়ে যাবে। সেটি জনমের জন্য তার ঘূর্ণন বন্ধ করে দিবে। এই অবস্থায় পদার্থ বলে কিছুই থাকবে না। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন এমন এক বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সেই অপার্থিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ নিচের দিকে টেনে নামায় না, পদার্থ বলে সেখানে কিছুই নেই, আলোক সেখানে অচল, পরিবর্তন সেখানে

www.nagorikpathagar.org

অসম্ভব। কাজেই নতুন গণিত আমাদের স্বর্গের প্রচলিত ধারণার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে।" (গোলাম মোস্তফা, বিশ্ব নবী)

এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন– "সেদিন আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া লইব যেরূপ কাগজের তাড়া গুটাইয়া লওয়া হয়, যেরূপ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম তদ্রূপ ইহার পরেও করিব, ইহাই আমার ওয়াদা, নিশ্চয় আমি উহা সংঘটিত করিব।" (সূরা-২১ : ১০৪)

"আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি এবং আমি তো অসমর্থ নহি যে, আমি তোমাদের গঠন পরিবর্তিত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে এমনভাবে গঠন করিব যা তোমরা অবগত নও এবং অবশ্যই তোমরা প্রথম সৃষ্টি পরিজ্ঞাত আছ, তথাপি তোমরা কেন উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। (সূরা-৫৬ : ৬০-৬২)

"গর্বিত কাফিরদের জন্যে ভয়ানক গর্হিত স্থান জাহান্নাম। আর এখানেই তাহাদেরকে অবস্থান করিতে হইবে চিরকাল" (সূরা-৩৯ : ৭১)

বিজ্ঞান ও কুরআনের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাই প্রতিয়মান হয় যে বর্তমান বিশ্বের ধ্বংসের পর নতুন যে বিশ্ব ব্যবস্থা শুরু হবে, সেখানে গতি থাকবে না, থাকবে না কোন আবর্তনশীল চাঁদ, সূর্য নামের কোন উপগ্রহ কিংবা নক্ষত্র। সেদিন গতিশীল আবর্তনের সময় কালের হিসাব অচল হয়ে যাবে। ক্ষয়, মৃত্যুশীল পদার্থ নামের কোন প্রকার জড় অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না। 'মৃত্যু দূতের' সেদিন মৃত্যু হয়ে যাবে। ফলে জীবন ফুরাবে না। সাত-আসমান জমিন পরিমাণ সরিষার পাহাড় হতে যদি হাজার বছর পর পর একটি করে সরিষা খাওয়া হয় তবু সেই খাদ্যের পাহাড় একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এরপরও জীবন নদী বয়ে চলবে। সেখানের জীবনের কোন সীমানা নেই, শেষ নেই। এর কারণ একটিই, তাহলো সে জগত হবে স্থির। প্রকৃতপক্ষে স্থিরতার মাঝে সময় যায় না, পদার্থ বলে কিছু থাকে না। সেই বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আমাদের গঠন কিরূপ হবে, সেই সম্পর্কে আমরা অবগত নই। এই অবস্থাটা এজন্যই হবে যেহেতু এ বিশ্বে গতি আছে। অপরদিকে তার বিপরীত রূপ স্থিতিশীলতার জন্যেই সেই পরিবর্তন দেখা দেবে।

এই বিশ্বে জোড়া রহস্যের মিলন তত্ত্বে অনেক জিনিসের এবং অনেক ঘটনার জোড়া বা প্রতিঘাত খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে গতির পাশাপাশি সময়ের চাকাও ঘুরছে কিন্তু এই বিশ্বে সময় যায় না এরূপ কোন স্থানের খবর আমাদের কাছে আপাতত নেই। তাছাড়া বস্তু জগতের পাশাপাশি তার বিপরীত বস্তুর দ্বৈত জগৎ (প্রতিবস্তুর) কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই জোড়া রহস্যের

www.nagorikpathagar.org

অসম্পূর্ণতার অন্তরালে পরকাল নামের ওপার জগতে বস্তুর দ্বৈত রূপের (প্রতিবস্তুর) কোন জগৎ আছে কিনা, এটিই এখন ভাবনার বিষয়? এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে জোড়া তত্ত্বের মূল রহস্য খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

জোড়া সম্পর্কে পরকালের ইঙ্গিত

আগুন, মাটি, পানি, বায়ুর জগতে জোড়া সম্পর্কের মধুর মিলন প্রকৃতপক্ষে খুব বিচিত্র। এই জগতে গাছপালা পশু পাখির যেমন রয়েছে জোড়া তেমনি আলোর দানারও রয়েছে দ্বৈত রূপ। আছে ইলেকট্রন, প্রোটনের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মতো সম্বন্ধ। আসলে পুরুষ ও নারী দ্বৈত বন্ধনের জগতের মধ্যে অঙ্গের গঠনের দিক থেকে নিয়ে স্বভাব, আচার আচরণের মাঝে একে অপর থেকে বৈরী দেখা গেলেও কেন জানি উভয়ের মাঝে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সবার মাঝে যেন প্রেম প্রেম ভাব উঁকি দিয়ে থাকে। মিলনের বাসনায় যেন সবাই ব্যাকুল থাকে। যখন দুই বিপরীত লিঙ্গে মধুর মিলন হয় তখন প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে নতুনের আগমন ঘটে। সেই নতুনরা আবার একদিন ঘর বাধে, সংসার করে। তাদের মাঝেও সেই চক্র শুরু হয়। এভাবেই পৃথিবীর সর্বত্রই জোড়া থাকলেও গতি আর বস্তুর কোন জোড়া নেই। এরা এতিমও নয়, বিধবাও নয়। অর্থাৎ এখানে (পৃথিবীতে) গতির সাথে তার পাশাপাশি স্থিতি বিরাজ করে না, ঘর বাঁধে না। সেই রূপে বস্তুর সাথে প্রতিবস্তুও ঘর সংসার করে না, জুটি বাঁধে না। জোড়া সম্পর্কের মধুর মিলনে অনেক ক্ষেত্রে নতুনের আগমন হলেও গতিশীল কাঠামোর বস্তুর সাথে স্থিতিশীল জিনিসের দেখা হলে, এদের মধ্যে প্রলয় ঘটে, সংঘর্ষ বাঁধে। যে ভাবে বস্তু কণার সাথে প্রতিবস্তুর কণার দেখা হলে একে অপরকে ধ্বংস করে তেমনি গতি আর স্থিতির সম্পর্কও তার অনুরূপ। সে কারণে এরা পাশাপাশি অবস্থান করে না, ঘর বাঁধে না। কিন্তু স্থিতিশীল প্রতিবস্তুর জগৎ বলতে আলাদা কোন জগৎ-এর কথা কি কল্পনা করা যায়? পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু কণার গর্ভ হতে অহরহ যে প্রতিবস্তুর কণা জন্ম হচ্ছে, সেই প্রতিবস্তুর সূক্ষ্ম কণা যেহেতু এখানে নতুন করে ঘর বাঁধে না, সংসার করে না, সেহেতু এরা যেখানেই থাক না কেন সেখানে তারা নতুন সংসার তৈরী করবে। যদি তাদের সংসার থাকে, বাড়ি-ঘর থাকে তাহলে এ বিশ্বের প্রকৃতির কোন কিছুই জোড়াহীন থাকবে না। আল্লাহ বলেন, "এবং আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরা-৫১ : ৪৯)

"এবং তিনি সমস্ত জিনিসের যুগল সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা-৪৩ : ৪২)

আদিকাল থেকে মানুষের জানা ছিল জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ জগতের সকল শাখার

www.nagorikpathagar.org

জোড়ার কথা। কিন্তু বস্তুরও যে জোড়া আছে সেকথা তাদের জানা ছিল না। এ যুগের মানুষ উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে বস্তুর জোড়া প্রতিবস্তুকে (Antimatter) খুঁজে পেয়েছে। আরও জানা গিয়েছে আলোর দ্বৈত রূপের কথা, আবিষ্কার হয়েছে একই ভর বিশিষ্ট প্রত্যেক বিদ্যুৎবাহী কণার বিপরীত বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত দ্বৈত আদান সম্পর্কে। এতো কিছু জানার পরও আমাদের জ্ঞান চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে কিনা, জানি না।

আল্লাহ বলেন– "তিনিই মহান, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মাটির উদ্ভিদ থেকে হোক বা মানুষের নিজেদের প্রজাতি থেকে এবং এরূপ জিনিস থেকে যার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নাই।" (সূরা-৩৬ : ৩৬)

এ পৃথিবীর আশে পাশে গতির জগতের পাশাপাশি স্থিতি জগৎ নেই অথবা বস্তু জগতের পাশাপাশি প্রতিবস্তুর জগৎ নেই। যদি সৃষ্টির ভারসাম্যের কথা চিন্তা করতে হয়, তাহলে বস্তু ও গতির দ্বৈত রূপ প্রতিবস্তু বা স্থিতি জগতের কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিনাস পলিং এর মতে, এই বিশ্বের কোন কোন এলাকায় প্রতিবস্তু দ্বারা গঠিত নীহারিকা বিরাজ করছে। কারও কারও মতে বিশ্বের অন্যত্র Negative dimension-এর জগৎ আছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক আলহাজ্জ গোলাম ছোব্‌হান সাহেব সে গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বি.এস.সি পড়ার সময় আমাদের এক প্রবীণ অধ্যাপক আমাদেরকে Negative dimension সম্বন্ধে অনেক কথা বলতেন, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে আমরা বিষয়টির বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। তাঁর মতে Negative dimension-এর জগৎ আছে। তিনি লিখেছেন, সে জগৎ প্রতিবস্তুর জগৎ কিনা তাই বা কে জানে?

আমরা যাকে প্রতিবস্তুর জগৎ কিংবা Negative dimension-এর জগৎ বলছি সেটি ধর্মের পরিভাষায় পরকাল কিনা তাই বা কে জানে? পরকাল এমনি এক জগৎ যেখানে আবর্তন থাকবে না, চন্দ্র, সূর্য নামের কোন জ্যোতিষ্ক ঘুরবে না। আবর্তনের সময় সেখানে অচল থাকবে। অর্থাৎ গতির জগতের মতো স্থান কালের অধীন লোকাল টাইম সেখানে অচল থাকবে। তবু সেখানে সময় যাবে, সময় জ্ঞান থাকবে। সে সময় খুব রহস্যময়, খুব জটিল। সে সময় মাপার জন্য কোন কৃত্রিম ঘড়ির প্রয়োজন হবে না। একই সাথে হাজার হাজার মানুষ বাস করলেও সবার সময় জ্ঞান এক হবে না। সে জগৎ স্থিতির জগৎ বলেই সময়ের এই করুণ পরিণতি দেখা দিবে। সেখানে পদার্থ হয়ে যাবে অচল। আমাদের আশে পাশে যেহেতু বস্তুর দ্বৈত রূপের জগতের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাই বলা যায় সে জগৎ প্রতিবস্তুর জগৎও হতে পারে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে জোড়া সম্পর্কে পরকালের ইঙ্গিত আমাদের ভবিষ্যৎ জগৎ সম্পর্কে অসীম ভাবনায় ফেলে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

অনেক সময় দেখা যায়, ভাবতে ভাবতে ভাবনার কুটির হয়ে যায় শূন্য। তখন জ্ঞান রাজ্যে নিজেকে একটি চড়ুই পাখির মতোও মনে হয় না। অথচ ভাবতে ভাবতে রাত্রি শেষ হয়ে যায়। আর ঘুমের বাড়িতে ধরে যায় আগুন। তখন সময়ের থাকে না কোন খেয়াল। তাই মনের ঘড়িতে সময়ের সংজ্ঞা নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা। পরিশেষে এই জটিলতা থেকে প্রশ্নেরও উদয় হয়। তখন ভাবি সময়েরও কি দ্বৈত কিছু আছে?

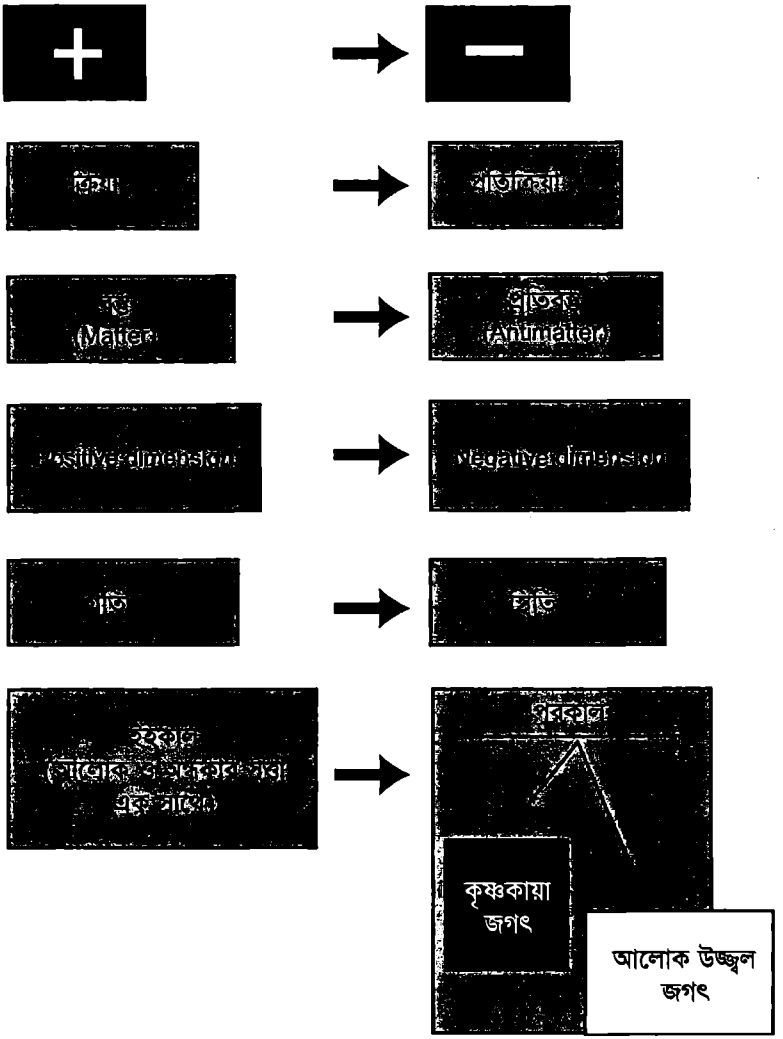

www.nagorikpathagar.org

পরকালের সময় সম্পর্কে নতুন ভাবনা

সময় সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহলে প্রকৃতির অনেক আচার-আচরণ দৈবের লীলা খেলাই ভাবতে হবে। কিন্তু দৈব আচরণ যেমন বিজ্ঞান স্বীকৃতি দেয় না, তেমনি ধর্মও তার পাত্তা দেয় না। বিজ্ঞান প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ কোন আইন মানতে রাজি নয়। তার কথা হলো, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কার্যকারণ নীতির উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যদিকে ধর্ম দৈব আচরণ বিশ্বাস না করলেও, তার এমন কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে যা আমাদের নিকট দৈব আচরণের মতো মনে হয়। এরূপ মনে হওয়ার প্রধান কারণ হলো, স্থান-কাল ও বস্তু সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণা। যেমন, সময়ের ক্ষেত্রেই আমরা নির্ভরশীল পৃথিবী ও সূর্যের আবর্তনের উপর। অথচ মৃত্যুর পর কিংবা এই দুনিয়াতেই অনেক ক্ষেত্রে 'সময়' এ সবের ধার ধারে না। কবরের জীবন সম্পর্কে বলা আছে, কারও সেখানকার জীবন হবে অগণিত লম্বা আবার কারও মনে হবে চোখের পলকের সমান। ধর্মের এই ব্যাখ্যা আমাদের কাছে দৈব আচরণ মনে হলেও, সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে, সে সম্পর্কে নতুন এক বিশ্বাস জন্মাবে। এই বিশ্বাসের কাছে তখন আর দৈবের কোন নীতি ঠাঁই পাবে না। তাই 'সময়' খুব রহস্যময়। একে যেমন ধরা যায় না, তেমনি বাঁধাও যায় না। এর না আছে হাত-পা, না আছে বস্তুগত কোন ডালপালা, না আছে নিজস্ব কোন অস্তিত্ব। যেখানে স্থান নেই, বস্তু নেই, সেখানে সময় বলে কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে স্থান-কাল ও বস্তুর কোনটিরও পৃথক বা স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই। যেখানে স্থান ও বস্তু আছে, সেখানে সময় থাকে। কিন্তু সময় চেপে বসে কোন ঘটনার মাথায়। সেজন্য একে ধরা যায় না, স্পর্শও করা যায় না। শুধু মাত্র স্থান ও বস্তুর মাঝ থেকে কোন ঘটনা বা নতুন কিছুর উৎপত্তির হিসাব মনে রেখে সময়ের ঘূর্ণন কল্পনা করা যায়। তাই সময়ের কোন বস্তুগত সংজ্ঞা বা যতি চিহ্ন দেয়া যায় না।

এই মহাবিশ্বের মানচিত্রে কোথাও 'সময়' বলে কোন একক বা স্বাধীন সত্তা জন্ম হয়নি। সেজন্য সময়কে সবসময় পরাধীন বা পরজীবি মনে হয়। যাকে পরজীবি মনে হয় সেটি পরনির্ভর বা ব্যক্তির ঘাড়েই চড়ে বসে। এ কারণে তার সম্পর্কে এককভাবে জানা হয় না। তাকে জানতে হলে তার সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় সম্পর্কেই জানতে হয়। তা না হলে এর আইন ও নীতি খুব সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তখন ঘুরে ফিরে পৃথিবী ও সূর্যের আবর্তনের মধ্যেই সময়ের সংজ্ঞা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। অথচ সময়ের হিসাব কোথাও এক হয় না। স্থানের ব্যবধানে যেমন এর পার্থক্য দেখা দেয় তেমনি ব্যক্তি নির্ভর ঘটনার উপরও এর পার্থক্য দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

যেমন মানুষ যখন অপেক্ষায় বা বিপদ আপদের মাঝে থাকে তখন তার ক্ষেত্রে সময় খুব লম্বা মনে হয়। এসব ক্ষেত্রে সময় একেবারে যেতেই চায় না। সেজন্য অনেকেই মনে মনে ভাবেন প্রতীক্ষার চেয়ে মৃত্যু ভালো অথবা বিপদ-আপদের থেকে পরিত্রাণ উত্তম। অন্যদিকে আনন্দের সময়, সুখের সময়, বাসর রাতের সময় খুব দ্রুত চলে যায়। এসব ক্ষেত্রে কেউ মৃত্যু কামনা করে না। পরিত্রাণের আশা করে না। মনের ঘড়িতে উভয় ক্ষেত্রে সময় জ্ঞান ভিন্ন হলেও প্রকৃত অর্থে কিন্তু সবার জন্য সময় একই থাকে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য যেমন, সুখীর জন্যও তেমনি।

তাই সময়-রহস্যের এই জটিলতা ঘড়ির কাঁটা দেখে বুঝা বা ধরা সম্ভব নয়। এ সব ক্ষেত্রে মনের অতিন্দ্রিয় কুঠুরীতে দেয়াল ঘড়ির ন্যায় সময় মাপার মতো কৃত্রিম কোন কিছু লাগানো থাকলে বুঝা যেত, সময় কত ব্যক্তি ও ঘটনা নির্ভর। এখানে যে বিষয়টি রহস্যময় তা হলো প্রত্যেক ঘটনার বেলায় সময়ের চাকা একই মাপে না ঘুরার ব্যাপারটি। ভয়ার্ত ব্যক্তির মনের ঘড়ির কাঁটা যতো দ্রুত ঘুরে, সেই তুলনায় আনন্দের আসরের যাত্রীর মনের ঘড়ির কাঁটা একেবারে স্থির থাকবে। সময়ের এতো তারতম্যের কথা শুনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে তাহলে সময় কি জিনিস? এবং এর সংজ্ঞাই বা কি হবে?

আমরা জানি সূর্য কেন্দ্রিক পৃথিবীর আবর্তনের ফলে রাত দিনের পালা বদল হয়। পৃথিবী তার অক্ষের উপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। সূর্য কেন্দ্রিক পৃথিবীর গতি থেকে দুনিয়াতে সময়ের পরিমাপ স্থির করা হয়েছে। অর্থাৎ গতি ও দূরত্বের পাল্লা থেকে সময়ের উৎপত্তি ঠিক হলো। এই হিসাবকেও সময়ের একক-এ বন্দি করা যায় না। কিন্তু পৃথিবী এবং সূর্য যদি নিজেদের স্ব-স্ব গতি বন্ধ করে দেয় তবে এক্ষেত্রে সময়ের চাকা ঘুরবে না, রাত দিনের পালা বদল হবে না। এই সূত্র ধরে গতি থেকে ঘটনাও সময়ের উৎপত্তির জাগরণ শুরু হয়েছে এ কথা ভাবা যায়। পৃথিবীর আবর্তনকালকে চব্বিশ ঘণ্টার সীমানা দিয়ে আমরা কৃত্রিম ঘড়ির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি। কিন্তু প্রকৃত সময় নির্ধারণ করতে হলে একটি স্থির স্তম্ভের প্রয়োজন। কিন্তু মহাবিশ্বের মানচিত্রে এমন কোন স্থির স্তম্ভ নেই বলে সময়ের পরিচিতি সর্বত্রই 'লোকাল'ভাবে স্থির করতে হয়। কিন্তু যে সময় গত হয়ে যায় তার যেহেতু কোন বস্তুগত কাঠামো থাকে না, তাই একে ধরে রাখা বা মনে রাখা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়। সেজন্য আমরা এই কঠিন জিনিসকে মনে রাখার জন্য কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ঘটনাকে করেছি সাক্ষী।

যেমন যীশু খ্রিস্টের জন্মের ইতিহাস থেকে গণনা করা শুরু হয়েছে খ্রিস্টাব্দ সনের এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর হিজরতের ঘটনা থেকে শুরু করা হয়েছে হিজরী

www.nagorikpathagar.org

সনের। কালের চাকার স্রোতকে এভাবে বেধে রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে একটি ঘটনাকে স্থিরভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে সম্মুখের সকল ঘটনাকে বন্দি করে রাখা হচ্ছে। এরূপ না করলে সকল ঘটনাই একদিন আমাদের স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে যেত। কিন্তু এই হিসাব পৃথিবীর বেলায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথাই মনে করে দেয়। অথচ অন্য গ্রহের বেলায় সে হিসাব একেবারেই অচল। যেমন আজ হয়ত আমরা রাসূলের (সা) আগমনকে ১৪০০ বছর আগের ঘটনা ভাবি, কিন্তু এমনও গ্রহ আছে যেখানে হয়ত রাসূলের আগমন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। সেই গ্রহে আমরা থাকলে তাই মনে করতাম। এই তারতম্য হওয়ার কারণ হলো রাসূল (সা) যে সময় পৃথিবীতে ছিলেন তখনকার আলোকের প্রতিবিম্বগুলো হয়ত এতো দিনে সেই গ্রহে পৌছবে। অন্যদিকে যে গ্রহ সূর্য হতে অনেক দূরে এবং যার আবর্তনকাল পৃথিবীর সমান নয়, সেই গ্রহে রাত-দিনের পালা বদল পৃথিবীর আবর্তনের পরিমাপ মতো হয় না। এর জন্য সেসব ক্ষেত্রে বছরের হিসাব পৃথিবীর সমান তালে ঘুরবে না। তাই গতির ক্ষেত্রেও মহাবিশ্বে কোথাও স্ট্যান্ডার্ড সময় নেই। সময় সর্বত্রই স্থান-কাল ও ঘটনার সাথে একাকার হয়ে আছে। তাই আইনস্টাইন সময়কে ধরেছেন আপেক্ষিক।

সময় যেমন কখনো একা চলতে পারে না, তাকে যেহেতু ঘটনার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, তাই ঘটনার যেমন রয়েছে ভিন্নতা তেমনি সময়েরও রয়েছে ভিন্ন পরিমাপ। আমরা ঘড়ি দিয়ে যে সময় নির্ণয় করি, এই সময় পৃথিবীর গতি বা আবর্তনের পরিমাপ। জীবনের সাথে সময়ের এই সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রে এক থাকে না। তাই গতির পরিমাপের উপর সময়ের মাপকে আসল মাপকাঠি ধরা যায় না। যেহেতু গতির ক্ষেত্রে দূরত্বের পাল্লা চলে সেহেতু এই পরিমাপ সবার ক্ষেত্রে এক হয় না।

অপরদিকে গতি বেশি হলে সময় যেমন কম লাগবে তেমনি দূরত্বও খাটো মনে হবে। তাই পৃথিবীর আবর্তন ও স্থানের সাথে সময় সম্পর্কশীল হলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির বেলায় সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হয়। কখনো আবার বড় মনে হয়। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা যায়, কেউ যদি দ্রুতগামী কোন যান্ত্রিক গতিযানে চড়ে পথ চলে এবং তার চলার অবস্থাটি যদি আনন্দ ও স্বস্তির হয় তাহলে তার কাছে সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হবে। কিন্তু এই চলার পথ যদি কারও বিপদের হয়, তবে তার বেলায় সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হবে না। অর্থাৎ কারও যদি চলন্ত গাড়িতে পায়খানায় ধরে বসে এবং সে গাড়িতে যদি পায়খানা করার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে তার কাছে সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হবে

www.nagorikpathagar.org

না। কিংবা কেউ যদি গাড়ির দরজায় ঝুলে থাকে এবং তার যদি পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রেও তার কাছে সময় ও দূরত্ব খাটো মনে হবে না। এদের দু'জনের বেলায় অল্প সময় অল্প দূরত্ব অনেক বড় মনে হব। অপরদিকে যে ভেতরে আরামে বসে গল্প গুজব করবে, তার কাছে কিন্তু সময় ও দূরত্বের কোন হিসাব থাকবে না। আবার বিপদ আপদ ছাড়াও উড়োজাহাজের যাত্রীর ও রিক্সার যাত্রীর সময় জ্ঞান এক রকম মনে হবে না।

গতির তারতম্যের জন্য সময় জ্ঞান ভিন্ন হয় বিধায় গতির শিকল দিয়েও মনের ঘড়িতে সময়কে এক করে বাঁধা যায় না। অপরদিকে যারা ঘুমে বা বেঁহুশ অবস্থায় থাকে তাদেরও সময় জ্ঞান থাকে না। কেউ যদি এক ঘুমে কিংবা বেহুঁশ অবস্থায় এক মাসও পড়ে থাকে, তবে সে বিগত সময়ের কোন উদাহরণ দিতে পারবে না। বরঞ্চ ঘুম থেকে উঠে এক মাসকেই এক রাতের সমান মনে করবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি ঘুমন্ত অবস্থায় ভয়ার্ত স্বপ্নের মুখোমুখি হয়, তবে তার সময় খুব প্রখর থাকবে। আল কুরআনে উল্লিখিত আসহাবে কাহাফ-এর ঘুমন্ত যুবকগণের দৃষ্টান্ত এমনি এক জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁরা প্রতিক্রিয়াহীন ঘুমের মধ্যে শত শত বছর পড়ে থাকলেও তাদের কোন সময় জ্ঞান ছিল না। অপরদিকে বলা হয় কাল হাশরের মাঠের একটি দিন কারও মনে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান আবার কারও মনে হবে চোখের পলকের সমান। প্রকৃত বাস্তবতায় আবর্তনের সময়সীমা যদি ' সময়ের' মাপকাঠি হতো তাহলে এর এতো ভিন্নতা কেন? কেনই বা এতো অসঙ্গতি? সেজন্য প্রশ্ন হলো সময়ের একক বলতে আমরা কাকে স্থির করব?

গতি আমাদের মনের ঘড়িতে সময়ের পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি দিতে না পারলেও গতি যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে সময় ও দূরত্বকে খাটো করে দেয় তেমনি সে বস্তুর আকারকেও ধরে রাখে। যেমন এই মহাবিশ্বের বিশাল শূন্যতার মাঝে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীসহ আকাশের মাতৃকোলে তারাদের যে মেলা বসে, তাদের কেউ কিন্তু স্থির নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন গতিতে মহাশূন্যে সন্তরণ করে বেড়াচ্ছে। অথচ এদের যদি কারও কোন গতি না থাকে, তাহলে এদের খুঁজে পাওয়াই হবে দায়। কারণ শূন্যের মাঝে কোথাও তো এদেরকে খুঁটি পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই গতি আছে বলেই এরা বেঁচে আছে, আছে এদের সুন্দর কাঠামো ও আকার আকৃতি। নেই শুধু স্থায়িত্ব। অহরহ চলছে তার মাঝে জন্ম মৃত্যুর খেলা।

যখন এই মহাবিশ্বের গতির চাকা স্তব্ধ হয়ে যাবে তখন আকাশের মাতৃকোল থেকে একে একে সবাই মৃত্যুর কোলে ধ্বসে পড়বে। ইসরাফীল (আ) এর শিঙ্গার

www.nagorikpathagar.org

প্রচণ্ড ধ্বনিতে সবকিছু রেণু রেণু হয়ে যাবে। তারপর এমন একদিন আসবে যেখানে সূর্য থাকবে না, চন্দ্র থাকবে না, পৃথিবী থাকবে না, কিংবা কোন গতিশীল বস্তুও থাকবে না। সেই জগৎ তো সৌর জগতের মতো কোন ভেগা নামক নক্ষত্রের পেছনে ছুটে চলবে না, কেউ কোথাও সন্তরণ করবে না। তবে কি সময় চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে যাবে? এখন প্রশ্ন হলো যদি সময় বলতে কিছুই না থাকবে তাহলে ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কোথাও কোথাও সময়ের কথা উল্লেখ করা হলো কেন? যেমন দোযখবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, একবার দোযখীকে সেখানে সাপে দংশন করলে তার যন্ত্রণা শত শত বছর পর্যন্ত চলবে। আবার বেহেশতবাসীর একবার আনন্দের মিলনে (যৌন মিলনে) শত শত বছর চলে গেলেও তার কাছে সময়ের কোন পরিমাপই থাকবে না।

মূলত পরপারের গতির সম্পর্কের আবর্তনের 'সময়' চিরদিনের জন্য অচল হয়ে গেলেও সেখানে সময়ের চাকা ঘুরবে। বরং সময় নামের সেই জিনিসটি হবে খুব কঠিন ও বেদনাদায়ক। সেখানে 'সময়' মাপার জন্য কোন কৃত্রিম ঘড়ির প্রয়োজন হবে না। হবে না কোন স্থির স্তম্ভের। যার যার মনন রাজ্যে এক জটিল জিনিস 'সময়' রাশিটিকে উঠানামা করাবে। আজকে এপার জগতে গতি আর আবর্তনের সময়ের পাশাপাশি মনের ঘড়িতে যে সময় উঠানামা করে বরং তার সাথে সে সময়ের যথার্থ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেদিন আমাদের মনের ঘড়িতে অনুভূতি নামক যে কাঁটাটি থাকবে এর মাঝে যদি কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়াশীল ছাপ লাগে তবেই সেটি দেয়াল ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে থাকবে। সেদিন প্রতিক্রিয়ার ছাপ যত তীব্র হবে সময় জ্ঞানও ততো লম্বা মনে হবে।

কিন্তু চলমান ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়ার দাগ যদি সেই ঘড়ির কাঁটাতে না পড়ে তবে একি সাথে হাজার হাজার বছর চলে গেলেও সেই কাঁটা থাকবে স্থির। তাই সময় হলো মনের খেয়ালে বা মনের গহীন অরণ্যে চড়ে বসা কোন বিষাদময় ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ঘর্ষণের ছাপ বা ফল। অপরদিকে সুখের আসরে মনের কুঠুরীতে যে শক্তি সময় জ্ঞান তৈরী করবে, সেই চাকাটি থাকবে স্থির। সেজন্য বিপদগ্রস্তদের বেলায় সময় হবে লম্বা ও জটিল। তারা যন্ত্রণার মধ্যে থাকবে, তাদের আফসোস হবে। তাদের মনে সময় শেষ হওয়ার জন্য মৃত্যুর প্রার্থনা জাগবে, তবু মৃত্যু হবে না, সময়ও যাবে না। মূলত সময়ের এই রহস্যময় সংজ্ঞা আমাদেরকে সৃষ্টি সম্পর্কে এক অজানা রহস্যের সন্ধান দেয়। যার মাঝে পাওয়া যায় স্রষ্টাকে বিশ্বাসের নতুন তত্ত্ব।

www.nagorikpathagar.org

আদিতে যখন এই বিশ্বে ভর-শক্তি ও সময়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না, তখন পরমস্থিতি অবস্থায় সর্বত্র ছিল শূন্য সময়। সেই শূন্য সময়ের কোন value নেই, মূল্য নেই। যখন থেকে সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে তখন থেকেই সময়ের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করার জন্যই এই সুন্দর, অনুপম, অপার, অসীম, জগতের ভিত্তি রচনা করেছেন। এই বিশ্বের সকল কিছুর উপাদান ও তার জড় গঠন স্রষ্টার মনের খেয়ালের বীজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য বাহির থেকে কোন প্রকার মাল মশলা আনার প্রয়োজন পড়েনি, এটি জগৎ স্রষ্টার অভিব্যক্তিরই ফল। তাই সময়ের অস্তিত্ব আত্মা ও বস্তুর সত্তার সাথে মিশে আছে। কিন্তু চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এই সময়ের পাল্লাকে অতিক্রম করতে না পারলে পরজীবনে কোন নিস্তার পাওয়া যাবে না। সেদিন জাহান্নামের নিশি জগতে যন্ত্রণাশীল প্রতিক্রিয়ার দানা হয়ে সময়ের অস্তিত্ব বেঁচে থাকবে। অতএব মনের খেয়ালে প্রতিক্রিয়ার শেষ ভাবনা আমাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে কঠিন চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাই জাহান্নামের আযাব আর অসৎ কর্মের প্রতিক্রিয়া খুব কাছাকাছি বিষয় মনে হয়।

জাহান্নামের আযাব ও বিকীর্ণ কর্মশক্তির সম্পর্ক

টক জাতীয় খাবার খেতে দেখলে জিহ্বায় যেমন পানি আসে তেমনি 'আযাব' শব্দ শুনলে মনে কেমন জানি ভয় হয়। আসলে জাহান্নাম নামের কোন জগৎ যদি না থাকে, তাহলে 'আযাব' ফেরারী আসামীর মতো ঘুরে ঘুরে কাউকে (অসৎ) শাস্তি দেয়ার জন্য খুঁজতে যাবে না। আযাবের জন্য যেমন থাকতে হবে তার উপকরণ তেমনি এর জন্য থাকতে হবে পৃথক জেলখানা। দুনিয়ার জীবনে কোন প্রতাপশালী শাসক কিংবা কোন ধনবান ব্যক্তি যদি আজীবন অন্যায় অত্যাচার আর অশ্লীলতায় লিপ্ত থেকেও মহাসুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়, তার বেলায় অন্যত্র যদি দুনিয়ার কর্মের প্রতিফল ভোগ করার কোন ব্যবস্থাই না থাকে, তবে এক্ষেত্রে প্রকৃতির বিধানে কেমন জানি শূন্যতা মনে হয়। দুনিয়াতে এমন নজির বহু আছে, যারা অন্যায়ের সাগরে সাঁতার কেটেও তাদের কোনরূপ আযাব সইতে হয়নি।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এরূপ শূন্যতা অসঙ্গতির ব্যাপার। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কর্ম ও শক্তির বিনাশ আছে মনে হয়। কিন্তু এই ধারণার অবসান অনেক আগেই শক্তির নিত্যতা সূত্র এবং নিউটনের গতির ২য় সূত্র প্রমাণ করে দিয়েছে। নিউটনের কথা হলো, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু আজীবন অন্যায় করে

www.nagorikpathagar.org

যেসব লোক দুনিয়ায় কর্মের কোন প্রতিফল ভোগ করেনি তাঁর বেলায় তো এ যুক্তি টিকে না। সুতরাং প্রকৃতির বিধান মতে এ ধারণাই পাওয়া যায় যে প্রতিফলের জগৎ বলতে বিশ্বের অন্যত্র কোথাও কোন জগৎ আছে, এর কাজ এই দুনিয়ার প্রকৃতির আইনের পতন হলে শুরু হবে।

অর্থাৎ স্রষ্টা সৃষ্টির কৌশলের আইন কানুনের মাঝে এমন এক নীতি বেধে দিয়েছেন যা থেকে কর্মের সাথে সাথেই তার প্রতিফলের সত্তা তৈরী হয়ে যায় এবং এই সত্তা দিয়ে যে জগৎ তৈরী হবে তার নামই পরজগৎ। মূলত সেই জগৎ দু'টি স্তরে বিভক্ত। তার একটি স্তর জাহান্নাম এবং অপরটি জান্নাত। সেই জাহান্নাম নামের জেলখানায় থাকবে কঠিন কঠিন আযাবের উপাদান। এই উপাদান দুনিয়াবাসীর কর্মের নিগূঢ় রহস্যময় দানা দিয়ে তৈরী করা থাকবে। সেই স্থানে থাকবে কাফির, বেঈমান, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজকসহ অন্যান্য যাদের নেকের পরিমাণ গুনাহ থেকে কম হবে তারাই। সেখানের বাসিন্দাদের মধ্যে কারও যাবজ্জীবনের সাজা হবে আবার কেউ কেউ নির্ধারিত দিন পর্যন্ত আযাব ভোগ করে সেখান থেকে মুক্তি পাবে। সেখানের বাসিন্দাদের গায়ের রঙ হবে আলকাতরা রংয়ের মতো কৃষ্ণকায়া বর্ণের। বিভিন্ন রকম আযাবের প্রাণীর সাথে তারা জীবন কাটাবে। এসব প্রাণী তাদেরকে কষ্ট দিবে, অশান্তি দিবে। এরা নিজের অবাধ্য সন্তানের মতো জ্বালাতন করবে। এই উপাদান অন্য কোথাও হতে আমদানী করতে হবে না, তৈরী করেও আনতে হবে না। নিজেদের উদর হতেই এরা দুনিয়া থেকে রাপ্তানী হয়েছিল। সেদিন কেউ কারও কষ্ট দূর করতে হাত বাড়াবে না, কেউ কারও দিকে ফিরে তাকাবে না, বরং একে অপরের থেকে তাদের ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে নিয়ে যাবে। কারও উপর অন্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে না। দুনিয়ায় একসময় 'মৃত্যুদূত' পৃথিবীর জীবন থেকে কষ্টের পরিত্রাণ করে দিলেও, সেখানে মৃত্যু হবে না, কষ্টও যাবে না। তদস্থানে কেউ মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ করলেও মৃত্যুর পেয়ালা সে পাবে না।

তাই জাহান্নাম সে-তো ভীষণ আযাবের স্থান। সেদিন কর্মফলের সত্তা দিয়ে অনন্ত অশান্তির মধ্যে দুনিয়ার জীবনের ভুলের অনুশোচনা, স্রষ্টাকে না চেনার জ্বালা, ব্যর্থ প্রেমিকের মতো বিরহের অগ্নি হৃদয়কে করবে জর্জরিত। চোখ বুঝে নিজে নিজের কলিজা ছিঁড়ে প্রাণকে করতে চাইবে যবেহ, কিন্তু প্রাণকে সে ধরতে পারবে না, স্পর্শ করতে পারবে না। এতে নিজের উপর নিজের প্রতিহিংসা বেড়ে যাবে। তাকে ধরতে না পেরে সে ক্রোধের অনলে নিজেই পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তবু বৃষ্টির ছোঁয়া পাবে না। গায়ে শান্তির পরশ লাগবে না। এর নামই

www.nagorikpathagar.org

দোযখ বা জাহান্নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে দোযখ সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। নিম্নে এর কিছু মাত্র উল্লেখ করা হলো :

"কাফিরগণ অনন্তকাল দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে, তা কখনো শেষ হবে না এবং বিন্দুমাত্র কম করা হবে না, সুখ শান্তির লেশমাত্র তাদের অবশিষ্ট থাকবে না।" (সূরা-৪৩ : ৭০)

"তাদের প্রতি আযাবের কিছুমাত্রও লাঘব করা হবে না এবং তারা সেখানে কারও নিকট থেকে কিছু মাত্র সাহায্য পাবে না। (সূরা-২ : ৮৬)

"কাফিরদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্ধারিত। সেখানে না তাদের মৃত্যু হবে, আর না তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে। তারা আর্তনাদ করে বলবে, প্রভু আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিন। আমরা পূর্বের মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে এখন থেকে ভালো কাজ করব।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন– "আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘায়ু দান করেছিলাম না, যাতে করে তোমরা সত্য উপলব্ধি করতে পারতে? (তা যখন করনি) তখন এ শাস্তি ভোগ কর। যালেমদের আজ কোনই সাহায্যকারী নেই।" (সূরা-৩৫ : ৩১-৩৭)

"যেদিন এ কাফিরদেরকে যে আগুনের মুখে এনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদেরকে বলা হবে; তোমাদের নিজেদের অংশের নিয়ামতসমূহ তোমরা দুনিয়ার জীবনেই শেষ করেছ এবং তার স্বাদও উপভোগ করেছ। দুনিয়াতে তোমাদের কোন অধিকার ছাড়াই তোমরা যেসব অহঙ্কার করছিলে এবং যেসব নাফরমানী করছিলে তার প্রতিফল হিসেবে আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাময় আযাব দেয়া হবে।" (সূরা-৪৬ : ২০)

"এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি– যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ঐসব লোক যারা দুনিয়ার জীবনে ছিল সুখী ও সচ্ছল। তাদের সুখী ও সচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে। সেসব পাপ কাজ তারা করতো জিদ হঠকারিতা করে। তারা বলতো, মৃত্যুর পর তো আমরা কঙ্কালে পরিণত হবো। মিশে যাবো মাটির মাঝে, তারপর আবার কি করে আমরা জীবিত হবো? আমাদের বাপ দাদাকেও কি এভাবে জীবিত করা হবে?

আল্লাহ বলেন, হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্য সময়-কালও নির্ধারিত আছে।" অতঃপর

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ বলেন, "হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীর দল! তোমরা জাহান্নামের যাক্কুম 'বৃক্ষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। তার দ্বারাই তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তৃষ্ণার্ত উটের মতো তারা পেট ভরে পান করবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি।" (সূরা-৫৬ : ৪২-৫৫)

হাদীসে কুদসীর বর্ণনায় আছে– "জান্নাতের অধিবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং দোযখের অধিবাসীগণ দোযখে প্রবেশ করবে। অতঃপর মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকেও বের করে নিয়ে আস (দোযখ হতে)। তারপর তাদেরকে সেখান হতে বের করে আনা হবে। তারা তখন কৃষ্ণকায় হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে আবে হায়াতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা এভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে যেভাবে জলার ধারে বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখনি যে, তা কেমন হলুদ বর্ণ হয়ে গজিয়ে উঠে।" শায়খাইন (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) এই হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

"কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে এরূপভাবে উপস্থিত করা হবে যেন একটা ভেড়ার বাচ্চা। তারপর তাকে আল্লাহ্‌র সমানে দণ্ডায়মান করা হবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন– "আমি তোমাকে জীবিকা দান করেছিলাম। তোমার প্রতি কৃপা বর্ষণ করেছিলাম এবং তোমাকে নিয়ামত দান করেছিলাম। তুমি তার পরিবর্তে কি কাজ করেছ?" সে বলবে "আমি তা জমা করেছিলাম, তা বৃদ্ধি করেছিলাম; আর আমার যা ছিল তার অধিকাংশ ছেড়ে এসেছি। আপনি আবার আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যেন আমি তা নিয়ে আসতে পারি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমাকে তা দেখাও যা তুমি অগ্রিম পাঠিয়েছিলে। সে পুনরায় বলবে, "হে আমার প্রভু! আমি তা জমা করেছিলাম, তা বৃদ্ধি করেছিলাম, তারপর আমার যা ছিল তার অধিকাংশ ছেড়ে এসেছি। আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তা নিয়ে আসতে পারি।" অতঃপর যখন স্থির হবে যে, বান্দা ভালো কিছু অগ্রিম পাঠায় নাই, তখন তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে।" তিরমিযী এটি আনাস (রা)-এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন। (হাদীসে কুদসীর বর্ণনা)

আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন আমাদের পক্ষে দুনিয়ার জীবদ্দশায় জাহান্নামের আযাবের গন্ধ পাওয়া ও তার সন্ধান লাভ সম্ভব নয়। কিংবা হিমালয় পর্বতের চূড়ায় উঠেও তা দেখা যাবে না। বর্তমান বস্তু জগতের আইন-কানুন রদ হয়ে গেলে সেই গুপ্ত জগতের সকল জিনিস আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিবে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিপুণভাবে দোযখের আযাব সম্পর্কে পাক কুরআনে বর্ণনা করেছেন। সেই বাণীতে রয়েছে দুনিয়া আখেরাত সম্পর্কের কথা। না দেখে এসব বিশ্বাস করা এবং সে মতে আমল করা ঈমানের অংশ।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তা দেখে আসা সম্ভব না হলেও মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জন্য যিনি সত্যের মাপকাঠি, তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে মি'রাজ রজনীতে স্বচক্ষে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই মহামানব আমাদের আলোর পথের দিশারী, অন্ধকার নিশি দ্বীপের জগতের সামনে পরশমণির আলো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি দূত। মানব জাতির উত্তম আদর্শ। তিনি আমাদের পরম বন্ধু। বন্ধু ও পথ প্রদর্শক হিসেবে তিনি আমাদের সামনে দোযখে শারীরিক আযাবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। দোযখের অগ্নি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এর উত্তাপ পৃথিবীর অগ্নি অপেক্ষা ৭০ গুণ অধিক তাপযুক্ত। এর এক বিন্দু যদি সূর্যোদয়ের স্থানে স্থাপন করা হয় তবে তার উত্তাপে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করে ঐ অগ্নিকে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করার ফলে তা লাল বর্ণ ধারণ করেছে, তারপর পুনরায় এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করার ফলে তা সাদা হয়েছে। তারপর আরও এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করার পর ঘোর কালো বর্ণ ধারণ করেছে এবং সে অবস্থায়ই আছে। তাই দোযখের মধ্যে ভীষণ অন্ধকার থাকবে। দুনিয়ার অগ্নির স্বভাব এটি পাপী ও নিষ্পাপ সকলকেই ভস্ম করে থাকে। সেদিক থেকে দোযখের অগ্নির বিশেষত্ব হলো; তাতে পাপীগণ জ্বলবে কিন্তু একেবারে ভস্ম হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আর তা নিষ্পাপ ব্যক্তির কোন ক্ষতি করবে না। দুনিয়ার অগ্নিতে পানি ঢেলে দিলে আগুন যেমন সম্পূর্ণ নিভে যায় কিন্তু দোযখের অগ্নিকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও নিভে যাবে না, বরং পানিই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রাসূল (সা) আরও বলেছেন, কিয়ামতের দিন সত্তর হাজার শিকল দিয়ে দোযখকে বেঁধে রাখা হবে। এর প্রত্যেকটি শিকল ৭০ হাজার ফেরেশতা ধরে রাখবে। এতদসত্ত্বেও দোযখ দোযখবাসীকে টেনে আনার জন্য সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। ফেরেশতাগণ যদি সেই সময় তাদের হস্তস্থিত শিকল একটু শিথিল করে দেয়, তবে দোযখ তাদের হাত হতে ছুটে গিয়ে পাপী, পুণ্যবান নির্বিশেষে হাশরের মাঠের সকলকেই স্বীয় উদরে টেনে নিবে। এতে অবশ্য পুণ্যবানদের কোন ক্ষতি হবে না।

দোযখে উষ্ট্রের ন্যায় অতিশয় বৃহৎ অগণিত সর্প রয়েছে। এগুলোর বিষ এত তীব্র

www.nagorikpathagar.org

যে তা একবার দংশন করলে ৭০ বছর পর্যন্ত তার জ্বালা বিদ্যমান থাকবে। দোযখের সর্পের বৈশিষ্ট্য হলো, এদের বিষের যন্ত্রণা দুনিয়ার সর্পের ৭০ গুণ অধিক হবে। অথচ এতে কারও মৃত্যু হবে না। দোযখে হৃষ্ট-পুষ্ট খচ্চরের ন্যায় অসংখ্য বিচ্ছু আছে। সেগুলোও সর্বদা দোযখীদেরকে দংশন করবে। তারা একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার যন্ত্রণা অব্যাহত থাকবে। অথচ প্রতি মুহূর্তেই তারা দোযখীদেরকে দংশন করবে। এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন, "আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব। তারা যে সকল অসৎ কর্মে লিপ্ত ছিল তা তাদের সেসব কৃত কার্যের ফল।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দোযখীদের চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত ও ভীষণ কালো হবে। 'দোযখীদের কাকেও যদি দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো, তবে তাদের কুৎসিত ও বীভৎস চেহারা দেখে এবং তাদের শরীরের দুর্গন্ধে দুনিয়ার মানুষ মরে যেতো।'

এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের সূরা মুমিনুনে ঘোষণা করেছেন– "দোযখের অগ্নি দোযখীদের চেহারাকে সম্পূর্ণরূপে তেথলিয়ে বীভৎস ও মুখমণ্ডলকে বিগড়িয়ে দিবে।"

বলা হয় দোযখবাসীর পিপাসা হলে বিষধর সাপ ও বিচ্ছুর বিষে পরিপূর্ণ এক পেয়ালা রক্ত ও পুঁজ এনে তাকে পান করতে দেয়া হবে। দোযখবাসীগণ আগ্রহ ভরে পান করা মাত্রই তাদের শরীরের চামড়া মাংস গলে গলে পড়তে থাকবে। এমনকি হাড়ের জোড়াগুলো পর্যন্ত আলগা হয়ে যাবে।

মহান রাব্বুল আলামীন বিজ্ঞানময় কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন, "কাফিরদের জন্য আমার নিকটে জিঞ্জির, আগুনের স্তূপ, গলায় বিধবার উপযোগী কণ্টক এবং ভয়াবহ আযাব মজুদ রয়েছে।" (সূরা মুয্যাম্মিল)

সূরা নাবায় আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, "দোযখবাসীরা উত্তপ্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘোলা পানি এবং গোচ্ছাক ব্যতীত অন্য কিছুই পান করতে পারবে না।" গোচ্ছাক দোযখবাসীদের শরীরের পুঁজ, চোখের অশ্রু ও গুপ্তাঙ্গ হতে প্রবাহিত রক্তের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এক প্রকার উত্তপ্ত পানীয়।

জাহান্নাম বা দোযখ সম্পর্কে কুরআন হাদীসে ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। দোযখের আযাব এতো ভীষণ হবে যা আমাদের কল্পনা ও চিন্তা শক্তির বাইরে। আমাদের জ্ঞান স্থান-কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় আমাদের মাথায় সেখানের যন্ত্রণার কথা, এ মুহূর্তে ধারণা করাই সম্ভব হয় না। তবে একথা সত্য যে, আমরা

www.nagorikpathagar.org

আমাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে দোযখের শাস্তির উপাদান এই পৃথিবী থেকে তৈরী করে পাঠাচ্ছি, ধর্মীয় পরিভাষায় এর উপাদানের নাম 'গুনাহ'। এই সত্তার নাম বিজ্ঞানের পরিভাষায় হয়তো অন্যকিছুও হতে পারে। জাহান্নামের আযাবের কথাবার্তা অনেক জায়গায় হয়তো রূপক ও সাদৃশ্যমূলক বর্ণনা দেয়া আছে। এ পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানের হাতে জাহান্নাম ও তার আযাবের কোন প্রমাণাদি ধরা পড়েনি। ধরা না পড়ার কারণের মধ্যে হয়তো থাকতে পারে, এ লাইনে আমাদের চেষ্টা তদ্বির কম থাকা স্বাভাবিক অথবা বিজ্ঞান সে সত্য উদঘাটন করতে অপারগ। তবে বর্তমান রবোটের যুগেও আমাদের পক্ষে তার ধারে কাছে না যেতে পারলেও সে সত্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকার করে নেয়ার মতো প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। সত্যকে যাচাই করার জন্য সে চেষ্টাও এক মহৎ প্রচেষ্টা।

জাহান্নামের অবস্থান ও তার বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক

জাহান্নামের আযাবের বর্ণনা বিজ্ঞানসম্মত কিনা, তা নিরীক্ষণ করার আগে পরকালের বৈজ্ঞানিক সত্যতা কতটুকু আছে তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। পরকাল অনেক দূরের জায়গা। কতটুকু দূরে এর হিসাব বলা যাবে না। কোথায়, কোন দিকে, তাও আমাদের অজানা। বর্তমান দুনিয়ার কোন বাসিন্দা জাহান্নাম দেখে ফিরে আসেনি। কারও পক্ষে রকেটে চড়ে সেখানে যাওয়াও সম্ভব নয়। কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়েও তার খবর নেয়া দুঃসাধ্য। তবু পরজগৎ বলতে একটা জগৎ যে আছে তার অনেক যুক্তি দেয়া যায়। গতি সম্পর্কে, তার দ্বৈত রূপ স্থিতি জগৎ থাকা বিজ্ঞানের বিচারে যুক্তিশীল। আবার বস্তুর দ্বৈত রূপের সম্পর্কে জোড়া তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্বের কোথাও প্রতিবস্তুর জগৎ থাকা অযৌক্তিক নয়। কিংবা সেটি কর্ম থেকে কর্মফলের জগৎ অথবা ক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার জগতও হতে পারে।

অপরদিকে সৃষ্টির প্রবৃত্তির তাড়নার ফসল ঋণাত্মক জগতও হতে পারে Negative dimension-এর জগৎ)।

বর্তমান গতির জগতের কঠিন বস্তুর সূক্ষ্ম কণাগুলো কাঁপে, ঘুরে ও দোলে এবং একের উপর অন্যটি গড়াগড়ি করে। গ্যাসীয় অবস্থায় আপন খুশি মতো ছুটে বেড়ায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে থাকে ও ঘুরে। এখানে সবকিছু যেন বিরতিহীন অশান্ত। পদার্থ হলো শক্তির ঘণীভূত অবস্থা বা গতির মন্থরতা। গতি অবিরাম হওয়া যুক্তিহীন। এর স্থিরতা থাকতেই হয়। অর্থাৎ গতিশীল জগৎ যেহেতু অনিশ্চয়তার দিকে ক্রমেই ধাবিত হচ্ছে, এ থেকে বুঝা যায় তার স্থিরতা

www.nagorikpathagar.org

আছে। সেই স্থির বিশ্বটি কোথায়, তা আমরা বলতে পারবো না। সেটি হয়তো মহাবিশ্বের এমন এক জায়গায় আছে, যেখানে আমরা জীবিত অবস্থায় গিয়ে ফিরে আসতে পারি না। গতির জগতের নাম বস্তু বা জড় জগৎ। সে হিসেবে তার দ্বৈত রূপের জগৎ হিসেবে একে স্থিতি জগৎ বা প্রতি বস্তুর জগৎ বলতে পারি। বিজ্ঞানের কথায় পদার্থ ও শক্তির যেহেতু ধ্বংস নেই, শুধু পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তি পদার্থে রূপ নিতে পারে, সুতরাং পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া শক্তি কোন না কোনভাবে রূপান্তরিত হয়ে অন্য জগৎ গড়ছে।

আমরা প্রতিদিন যে শক্তি ব্যয় করি তা খাদ্য থেকেই পেয়ে থাকি। সূর্য থেকে খাদ্য বস্তুতে এই শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে মওজুদ হয়। এই শক্তির মাধ্যমে আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন ও ক্ষয়পূরণ হয়। সূর্য প্রতিদিন তার তহবিল থেকে প্রায় ৩৬০ হাজার মিলিয়ন টন শক্তি বিকিরণ করে। তন্মধ্যে আমরা অতি অল্প পরিমাণ অংশই কাজে লাগাতে পারি। শক্তির যেহেতু ধ্বংস নেই, ক্ষয় নেই, সেহেতু আমাদের শারীরিক ও মানসিক কাজ-কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে যে শক্তি ব্যয় হয় তা যায় কোথায়?" পৃথিবী কিংবা সূর্য তো একে পুনরায় গ্রহণ করে না। তবে এর হবেটা কী? নিশ্চয়ই তা দিয়ে কোথাও কিছু হচ্ছে। সে জগতকে আমরা প্রতিবস্তুর জগৎ বা পরকাল বলে ভাবতে পারি। সে জগৎ কেমন তা আমরা এ মুহূর্তে বলতে পারবো না। অনেক দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ জগৎ সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন– এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে ক্রমবিকাশের পালায় এখনো তা অবিরাম বৃদ্ধি হয়েই চলছে এবং ভবিষ্যতে কতকাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলবে তা কারও জানা নেই। মহাশূন্যে সৃষ্টির এই বিকাশ দ্রুত হতে দ্রুততর বেগে সম্প্রসারণ হয়েই চলছে। এই বিকাশের গতি উত্তরোত্তর এতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, একে আলোর পক্ষেও ঘুরে আসা সম্ভব নয়। অথচ আলোর বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

আল-কুরআনে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতির কথা বলা আছে। আল্লাহ বলেন– "এবং আকাশমণ্ডল আমি আপন শক্তি ও কৌশল দিয়ে সৃষ্টি করেছি, নিশ্চয়ই আমি সম্প্রসারণকারী।" (সূরা-৫১ : ১৭)

বৈজ্ঞানিকগণ আরও মনে করেন, বিশ্বের সম্প্রসারণের সাথে সাথে শক্তি বিকিরণের জন্য এই বিশ্ব ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে এবং এই বিশ্বের ভর-শক্তি যথোপযুক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার পর সেটি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে বস্তুর মৌলিক কণা নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদি হতে অনেক অস্থায়ী কণা গঠিত হয়। তাছাড়া এদের পাশাপাশি অনেক বিপরীত প্রতিকণাও গঠিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

এই মহাবিশ্বের বিশাল শূন্যমণ্ডলীতে অন্ধকার রাতে মেঘশূন্য আকাশে সাদা সাদা পাতলা মেঘের ন্যায় যে স্তর দেখা যায় তার নাম নীহারিকা।

এই নীহারিকা বায়বীয় জড় কণার বিশালপুঞ্জ। অপরদিকে ছায়াপথকেও নীহারিকা ধরা হয়। দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করলে এই নীহারিকামণ্ডলীতে অসংখ্য তারকা দেখা যায়। এসব তারকাগুলো বড় দলের অসংখ্য পুঞ্জ সৃষ্টি করে আছে। তারকারাজির এই সকল পুঞ্জকে গ্যালাক্সি বলা হয়। মহাশূন্যের অসংখ্য গ্যালাক্সির একটি কক্ষদ্বার হলো ছায়াপথ। আমরা আকাশে যেসব উজ্জ্বল তারকা দেখি সেগুলো প্রকৃতপক্ষে বহুদূরে অবস্থিত গ্যালক্সি মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, সূর্যের মতো পরিবারভুক্ত আরও অনেক নক্ষত্র মহাশূন্যে বিরাজমান আছে। কেউ কেউ মনে করেন মহাশূন্যের নীহারিকাগুলো স্থির নয় (যেগুলো দেখা যায়)। এসব নীহারিকাগুলো অবিরাম ভন্ ভন্ শব্দ করে ঘুরছে। অনেক বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মহাবিশ্বের অর্ধেক সংখ্যক নীহারিকা পদার্থের এবং বাকি অর্ধেক প্রতিবস্তুর। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিনাস পলিং-এর মতে এই বিশ্বের কোন এলাকায় প্রতিবস্তু দিয়ে নীহারিকা বিরাজ করছে। প্রতিবস্তু মূলত বস্তুর দ্বৈত রূপ। পৃথিবীর বিভিন্ন পদার্থের গর্ভ থেকে এবং মানুষের দেহ কারখানা থেকেও প্রতিবস্তুর কণা প্রসব হয়। এরা পৃথিবীর প্রকৃতিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। ক্ষণিক সময় পরেই সেগুলো এখান থেকে উধাও হয়ে যায়। যেহেতু শক্তির ধ্বংস বা বিনাশ নেই, সে ধারণার আলোকে বলা যায়, আমাদের বিকীর্ণ কর্মশক্তিই কি প্রতিবস্তু কিনা, তাই বা কে জানে? যদি জোড়া তত্ত্বের উৎস ধরে বিচার করা হয়, তাহলে এই প্রতিবস্তুর জগতের সাথে পর জগতের সম্পর্ক থাকার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাবধি প্রায় ১০০ কোটির মতো নীহারিকার সন্ধান পেয়েছেন। তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন, সকল নীহারিকা আলো বিকিরণ করে না। সেগুলো নিষ্প্রভ নীহারিকা। সহজ কথায় এগুলো ছাইয়ের স্তূপের মতো। এগুলোকে মহাকাশে ঘন কালো ধোঁয়ার মতো দেখা যায়। সেজন্য এর পেছনের তারকাগুলো দেখা যায় না। এর পেছনে হয়তো রয়েছে উজ্জ্বল নীহারিকা। সেগুলোতে যে কি আছে তা বলা অসম্ভব। এ বিশ্বের অসীমত্বের কথা ভাবতে গেলে নিশ্চয়ই অবাক না হয়ে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ আরও অনুমান করছেন, আমাদের এই গ্যালক্সিতেই রয়েছে অসংখ্য নিষ্প্রভ নীহারিকা। একে বলা হয় কৃষ্ণবিবর। এর ভেতরে যে কি কাণ্ড ঘটছে তাও দেখা সম্ভব হয় না। আবার এসব কৃষ্ণবিবরের আড়ালে যে কি আছে তাও দেখা সম্ভব হয় না। কারণ

www.nagorikpathagar.org

এর ভেতর থেকে যেমন কোন আলো আসে না আবার তার পাশের কোন তারকার আলোও সে স্থান ভেদ করে আসতে পারে না। এ সকল বর্ণনার সাথে জাহান্নামের মতো অন্ধকার দ্বীপপুঞ্জের অনেকাংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী জাহান্নাম ঘোর কালো বর্ণের অন্ধকার দ্বীপপুঞ্জের মতোই। বলা হয় জাহান্নামের নিষ্প্রভ অগ্নিস্তূপ সূর্যের আলোকেও ম্লান করে দিতে পারে। এর দুর্গন্ধময় সামান্যতম উপাদান পৃথিবীর সমস্ত আলো বাতাসকে দূষিত করার জন্য যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা, নিষ্প্রভ নীহারিকার আড়ালে যে সকল উজ্জ্বল নীহারিকা আছে, সেগুলো এই অন্ধকার স্তূপের জন্যই দেখা যায় না। বেহেশত ও দোযখের পারিপার্শ্বিক অবস্থানের বেলায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক অনুরূপ বর্ণনাই রয়েছে। সেখানে বেহেশত-এর অবস্থান সর্বদাই দোযখের উপরে রয়েছে বলে উল্লেখ আছে। বেহেশত এর সারি করা স্তরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে উপরের দিকের বেহেশতগুলো নিচের দিক থেকে সুরম্য, বিশাল ও আরামদায়ক, পক্ষান্তরে দোযখের অবস্থানও উপরের দিক থেকে নিচের দিকে পর্যায়ক্রমে কষ্টকর ও অন্ধকারাছন্ন। এসব স্থান থেকে তার দিকে কেউ হাত বাড়ালে কেউ ফিরেও তাকাবে না। সে জগৎ অতি নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণায় ভর্তি।

জড় পদার্থের মধ্যে সরিষা একটি কঠিন বস্তু। এর আকার অতি ক্ষুদ্র। অপর দিকে বায়বীয় পদার্থের মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সূক্ষ্ম গ্যাসীয় পদার্থ। এগুলোর কোনটিই প্রয়োজনহীন নয়। আকাশের কোটি কোটি ছায়াপথের গোষ্ঠীভুক্ত আরও অসংখ্য কোটি কোটি তারকারাজির বিশাল বিশাল বিস্তৃতিময় অনন্ত অসীম ঠিকানা কি অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে? এর কি কোন প্রয়োজন নেই? বোকাও একথা বলবে না, তার প্রয়োজন নেই। তাই স্বীকার করতে হবে ধর্মীয় বিধানে জাহান্নাম ও জান্নাতের যে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে, হয়তো বা সেই বিশাল জগৎ এর সাথে সম্পর্কিত। এখন প্রশ্ন হলো– মানব জীবনে দুনিয়ার কর্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি কি মানুষকে শান্তি ও যন্ত্রণা দিতে পারবে? বিজ্ঞানের আলোকে যদি আমাদের কর্মের প্রতিফলের মধ্যে ঐ গুণাগুণ থাকে তাহলে জাহান্নাম ও জান্নাতকে অস্বীকার করার কি কোন যুক্তি খাটবে?

ধর্মের কাজকর্ম কোন নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক পর্ব বা লোক দেখানো কোন বিষয়বস্তু নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু বা প্রাণীর স্বভাব আল্লাহর দান। স্বভাবের বিপরীত কিছু করতে গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে আল্লাহ সৎ ও সুন্দর গুণাবলীর স্বভাব দান করেছেন। এতে রয়েছে দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল। কিন্তু মানুষ যদি তার স্বভাবের বিপরীত চলে তখন তার

www.nagorikpathagar.org

বেলায় দু'স্থানেই অমঙ্গল দেখা দিবে। দুনিয়ার জীবনে আমরা আখেরাতের অমঙ্গল দিক লক্ষ্য না করতে পারলেও দুনিয়ার ক্ষেত্রে যেসব কাজ এখানে অমঙ্গল ডেকে আনে তা লক্ষ্য করতে পারি। এর প্রত্যেকটি কাজ মানুষের স্বভাবের বিপরীত কর্ম। এই বিপরীত কর্মগুলো ধর্মের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বর্জন করার আদেশ রয়েছে। এরপরও যারা সেই আদেশ লঙ্ঘন করে স্বভাবের বিপরীত কাজ করতে থাকে, তারা কোন না কোনভাবে কষ্টের স্বীকার হয়। এ থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, স্বভাবের বিপরীতধর্মী কাজ আখেরাতে কষ্ট দিবে। যেমন অবাধ যৌনাচার ও নেশা করা স্বভাবের বিপরীতধর্মী কাজ। এ কাজগুলোকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে। তবু যারা এই নিষেধ উপেক্ষা করে সেগুলো চালিয়ে যায়, এদের দুনিয়াতেই পদে পদে যন্ত্রণা পেতে হয়। সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস এগুলোর মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করে। স্বভাবের বিপরীত কাজ করাতে এগুলো দুনিয়াতেই অপকর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে অসৎ ব্যক্তিকে দংশন করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু যারা স্বভাবের বিপরীত কাজ করে না এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম ঠিক ঠিক ভাবে মেনে চলে তারা কিন্তু দুনিয়াতে এর দ্বারা পদে পদে যন্ত্রণা পায় না। তাই বিশ্বাস করতে হবে স্বভাবের সৎ ও সুন্দর গুণাবলী পরকালীন জীবনের জন্যও মঙ্গলকর। কিন্তু দ্বীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান অনুসরণ না করলে সৎ ও সুন্দর গুণাবলী গড়ে ওঠে না।

মানুষ প্রবৃত্তির মোহে আকৃষ্ট না হয়ে কোন কাজ করতে পারে না। দুনিয়ার জীবনে মানুষ দু'ভাবে মোহে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কেউ দুনিয়ার মোহে পড়ে কুপ্রবৃত্তির ছোবলে দংশিত হয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়। কেউ আবার স্রষ্টার দিদার লাভের আশায় তাঁর জীবন ব্যবস্থার নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলতে গিয়ে স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে। এসব লোককে কুপ্রবৃত্তির ছোবলে দংশন করতে পারে না। তারা কোন কাজেই স্বভাবের সীমালঙ্ঘন করে না। পক্ষান্তরে যারা কুপ্রবৃত্তির ছোবলে দংশিত হয় তাদের কর্মের বিকীর্ণ শক্তির গায়েও এর ক্ষতচিহ্ন পড়ে। এতে সেগুলোর অবক্ষয়পূর্ণ ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। পরিশেষে এ সব দুষ্কৃতিময় সত্তা উজ্জ্বল স্বভাব হারিয়ে বিবর্ণ কালো ধোঁয়ার মতো রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু স্রষ্টার মনোনীত জীবন ব্যবস্থার আলোকে যারা পরিতুষ্ট আত্মার মালিক হয় তাদের কর্মময় জীবনী শক্তির বিকীর্ণ সত্তা উজ্জ্বল জ্যোতিপূর্ণই থাকে। এদের বিকীর্ণ সত্তা নিম্ন দিকে না গিয়ে বিপরীত দিকেই প্রবাহিত হয়। অপরদিকে দুনিয়ার মোহে শয়তানের শিষ্যদের কর্মশক্তি হারিয়ে যায় অতল সাগরের নিম্নের দিকে। ঘটনাটি অনেকাংশে এরূপ,

www.nagorikpathagar.org

যেমন-নদীনালা এবং সাগরের বিস্তৃত পরিসরে থাকে পানি। পানির মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। নদীর পানি সাগরের দিকে ছুটে চলে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় পানির প্রবাহ থেকে উৎপন্ন করা হয় বিদ্যুৎ। এর জন্য স্রোতের মুখে বাঁধ দিয়ে টারবাইন বসানো হয়। এই বাঁধ পানির প্রবাহকে বিপরীতমুখী করে। এর মাধ্যমে আমরা উপকৃত হই। কিন্তু বাঁধহীন নদীর প্রবাহ সাগরেই তলিয়ে যায়। সেই প্রবাহ আমাদের কোন কাজে আসে না। পক্ষান্তরে একে পুনরায় ফিরিয়ে এনেও কোন কাজ করা যায় না। মানুষের দেহ কাঠামোর কারখানাটি এবং তার শাসক জীবন প্রহরীর ক্রিয়া-কলাপ মহাসাগরের ঢেউ-এর মতো গতিময়। মনের মণি কোঠায় ভাবাবেগ, কর্মের স্পন্দন সবই ঢেউ-এর ন্যায় ওঠানামা করে। সেখান থেকে এর প্রবাহ ছুটে যায় দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। কিন্তু মনের কামাবেগ স্বভাবের বিপরীত হলে সেটি সীমালঙ্ঘন করে, এতে কোন বাঁধ থাকে না। ফলে তার জীবনী শক্তি বিপরীতমুখী না হয়ে অতল সাগরে ঠাঁই নেয়। তার মাধ্যমে বিদ্যুতের মতো উপকারী সত্তা তৈরী হয় না। যা কিছু সৃষ্টি হয় সবই দুষ্কৃতিময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখন প্রশ্ন হলো মানব জীবন নিয়ন্ত্রণে রাখলে কি তার মাধ্যমে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল সত্তা তৈরী হতে পারে? আমাদের দৈহিক কাঠামোর মূল উপাদান পানি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এতে পানির অংশ ৭৫ ভাগ। নদীর স্রোত থেকে যদি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যেতে পারে তবে মানব দেহ থেকে এর চেয়ে উত্তম সত্তা কেন তৈরী করা যাবে না? আমাদের দেহ কাঠামোর মূল উপাদান যে পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তা কুরআন মাজীদে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"আমি প্রত্যেক জীবিত পদার্থকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা-২১ : ৩১)

"আল্লাহ পানি দিয়ে সর্বপ্রথম জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর কতিপয় স্ব-স্ব উদরে ভর দিয়ে চলে এবং তাদের কতিপয় পদদ্বয় দিয়ে চলে ও তাদের কতিপয় চতুষ্পদ দিয়ে চলে।" (সূরা-২৪ : ৪৫)

"তিনি পানি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা-২৫ : ৫৪)

সৃষ্টিকর্তার এসব তত্ত্বের সপক্ষে রয়েছে বৈজ্ঞানিকগণের স্বীকৃতি। তাঁরা মনে করেন আদি প্রোটোপ্লাজম সাগরের লোনা পানির প্রবাহ হতে সৃষ্টি হয়েছে। এটি আদি জৈব অণু ডি.এন.এ. ও আর.এন.এ-এর সমন্বয়ে গঠিত। এই জৈব অণুর আদি মৌলও যৌগ হতে উচ্চ তাপে ও চাপে এবং অণু ঘটকের প্রভাবে মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই প্রোটোপ্লাজম। যার মাঝে প্রায় ৭৫ ভাগই পানি। মানুষের

www.nagorikpathagar.org

দেহটি অগণিত সংখ্যক প্রোটোপ্লাজমের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রোটোপ্লাজমে পানি ব্যতীত আরও রয়েছে কার্বন ও ক্যালসিয়ামসহ অন্যান্য উপাদান। বলতে গেলে মানুষের জড়দেহ একটি মিশ্র পানির কাঠামো। এর মধ্যে আছে জেলির মতো স্বচ্ছ অর্ধভেদ্য চটচটে পিচ্ছিল ও স্থিতিস্থাপক পদার্থের সমাহার। একে একটি সজীব ও প্রাকৃতিক জৈব কারখানা বলা চলে। এই কারখানার মালিক হলো আত্মা। এর স্বভাবের সৎ গুণাবলী বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টেশনের নীতির ন্যায়। এ থেকে টিভির প্রেরক যন্ত্রের মতো তড়িৎ চুম্বক শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বভাবের বিপরীত ক্রিয়ায় ধোঁয়ার মতো কালো অপশক্তি নিঃসৃত হয়। একেই আমরা বিকীর্ণ শক্তি বলি। আমাদের দেহ কাঠামোর মধ্যে অনবরত সমুদ্রের মতো ঢেউ চলে। কিন্তু এই ঢেউ বা তরঙ্গকে আমরা ধারণ করতে পারি না। শুধু একে অনুভব করি।

মানুষের জীবন কী? এ সম্পর্কে একজন বৈজ্ঞানিক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর সে বর্ণনার মাঝে আমরা ঢেউকে খুঁজে পাই। এই বৈজ্ঞানিকের নাম কাউণ্ড ফিসার লিং। তিনি বলেছেন, "মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন মহাসাগরের একটি বিশাল ঢেউ-এর মতো। মানুষ এক অজানা অন্ধকারময় লক্ষ্যের দিকে ঢেউ খেলে প্রবাহিত হচ্ছে। এই ঢেউকে বাহ্যত শিলার মতো অবিচলিত শক্ত ও স্থায়ী মনে হলেও প্রতি মুহূর্তে তার গঠন ও গাঠনিক উপাদান বদলে যায়। আমরা ঢেউকে দেখতে পাই এবং তার তর্জন-গর্জন শুনি কিন্তু আমরা তাকে ধারণ করতে পারি না। ঢেউ-এর গতি এবং তার গতি পথের দিক অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু তার যা কিছু দৃশ্যমান দর্শনীয় ও স্পর্শনীয় তা পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী। অদ্রূপ মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন ঠিক একটি ঢেউ-এর মতো মনে হলেও প্রতি মুহূর্তে তাদের গাঠনিক উপাদান বদলে যায়। জীবনের গতি ও গতির দিক ব্যতীত বাকী যা কিছু দৃশ্যমান ও স্পর্শনীয় তা পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী। আমরা জীবনকে শুধু অনুভব করি কিন্তু ধারণ করতে পারি না। সর্বশেষে নিজের চিন্তা ও জ্ঞান দিয়ে যখন আর কিছু বুঝতে পারি না তখন সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে এক মহাদুর্জেয় রহস্যময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করি। এই স্বইচ্ছায় নিজেকে কোন পরম সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম। এই আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার মানুষের মনে এক অনাবিল পরম শান্তি (সালাম) আনে যা সম্রাটের সাম্রাজ্যের ধন রত্ন দিতে পারে না।"

কাউণ্ড ফিসার লিং-এর ধারণার আলোকে বলা চলে, আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন নামের প্রবাহমান ঢেউকে যদি নিয়ন্ত্রণহীন ছেড়ে দেয়া যায় তবে কি এর মূল্যবান জীবনী শক্তি সাগরের অতল দেশে তলিয়ে যাবে না?

www.nagorikpathagar.org

পাক কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন– "তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করেছ। (সূরা আহকাফ : রুকূ-২)

নদ-নদীর পানির স্রোত বা ঢেউ এর অনুকূলে বাঁধ বসিয়ে যেহেতু বিদ্যুৎ নামের বিপরীতমুখী প্রবাহ তৈরী করা সম্ভব হয়, তবে মানবদেহের ৭৫ ভাগ পানির অংশ থেকে নৈতিক বাঁধ সৃষ্টি করে কি বিদ্যুতের মতো উপকারী সত্তা সৃষ্টি করা যাবে না? এই সত্তা দিয়ে কি জান্নাতের মতো সুন্দর ও মনোরম জগৎ তৈরী অসম্ভব? তবে জীবন নদীর নিয়ন্ত্রণহীন স্রোত বা ঢেউ যে পরবর্তীতে জীবনের কোন সুফল দিতে পারবে না তা দুনিয়ার নিয়মেই প্রমাণ হয়। যে নদীতে বাঁধ নেই, তার স্রোত তো মহাসাগরের অতল গহ্বরেই হারিয়ে যায়। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনের যেমন কোন উপকার হয় না তেমনি মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে তার পরপারে লাভের কোন আশা থাকে না।

গতি এক প্রকার প্রবাহমান শক্তি। এই গতি শক্তি চিরদিন একই অবস্থায় বিরাজ করতে পারে না। অর্থাৎ কোন গতিই চিরন্তন নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গতি চিরন্তন হওয়া অবাস্তব। তাই একদিন না একদিন গতি স্থিরতায় আসে। আসলে গতি থেমে যাওয়ার নামই মৃত্যু। এই পৃথিবীতে শুধু প্রাণীর বেলায় মৃত্যু আসে এমন নয়। এই বিশ্ব প্রকৃতিতে প্রতিনিয়তই অহরহ কার্যকারণ নীতিতেই বলা চলে অগণিত অণুর মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুর বেলায় বয়সের কোন ধারাবাহিকতা নেই। বৃদ্ধের আগে যুবক কিংবা শিশুও মরতে পারে। কার বেলায় কখন মৃত্যু ঘটবে বা ঘটতে পারে তা কেউ বলতে পারে না। এমনি এক অদৃশ্য নিয়মনীতির তাড়নায় সদাসর্বদাই গতির মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞান এই মৃত্যুদানকারী সত্তাকে Cosmic Radiation নামে অভিহিত করেছে। যখন কোন অণুর মৃত্যু ঘটে তখন সে সত্তা অদৃশ্য হয়ে আমাদের চোখের আড়ালে চলে যায়। তখন এর রূপ কি হয় তা আমরা জানি না। কিন্তু জোড়া তত্ত্বের শর্তে গতির কাঠামো যদি বস্তু হয় তবে তার দ্বৈত রূপ হবে প্রতিবস্তু। সে ধারণার আলোকে বলা যায় এ জগতের অন্তরালে রয়েছে আর একটি স্থির জগৎ। কিন্তু স্থির জিনিস আকারশীল হতে পারে না বিধায় সে জগৎ খুব সূক্ষ্ম জগৎ। কর্মের রূপ গুণশীল আকারহীন জগৎ। এর নাম প্রতিফল জগৎ বা পরকাল। মানুষের গতির চরিত্র থেকে তার প্রতিফল জগৎ যে সৃষ্টি হতে পারে তা নিম্নের উদাহরণ থেকেই বুঝা যাবে।

যেমন– পৃথিবীতে মাতা পিতার সহমিলনের ফলে মাতার ডিম্বানুর সাথে পিতার শুক্রকীটের মিলন ঘটে সন্তানের ভ্রূণ জন্ম হয়। এই পরিস্ফুটন্ত ডিম্বানুর মাঝে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজম। এর মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজম থাকে সক্রিয়। এসব সক্রিয় ক্রোমোজমের ভূমিকার উপর সন্তান-সন্ততির গঠন, আকার, বর্ণ,

www.nagorikpathagar.org

লিঙ্গ, স্বভাব ইত্যাদি সকল কিছু নির্ধারিত হয়। অথচ এই ক্রোমোজমের কোথায় যে এই গুণগুলো লুকিয়ে থাকে তা ধরা খুবই কঠিন। কার্যত গুণ দেখার জিনিস নয়। এটি উপলব্ধির ব্যাপার। কিন্তু বিভিন্ন পিতা-মাতার বেলায় এই ক্রোমোজমের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেজন্য অসৎ পিতার সন্তান অসৎই হয়। তাই বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানীগণ অপরাধপ্রবণতা রোধ করার জন্য আইনের সাথে সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলছেন। তবে সব অসৎ পিতার সন্তান যে অসৎ হয় এটি পুরোপুরি ঠিক না হলেও যারা ভালো হয় তারা সাধারণত সৎলোকের সান্নিধ্য পেয়েই ভালো হয়। কিন্তু খারাপ হওয়ার সংখ্যাই বেশি থাকে। এরূপ চরিত্র হওয়ার প্রধান কারণ হলো পিতামাতার ক্রোমোজমের (জীন) গতির ক্রিয়া।

একটি মারবেলকে সরল পথে গতি দিয়ে ছাড়লে সেটি আপাতত সরল পথেই চলে। কিন্তু বাঁকা পথে গতি দিয়ে ছাড়লে সেটি বাঁকা পথই অনুসরণ করবে। পিতা মাতার মিলনপর্ব গতিহীন নয়। মানুষ প্রয়োজনের মোহেই কাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার ফসল দুনিয়ায় প্রজনন বৃদ্ধি করে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য ভালো মন্দ গতিশীল কাজ থেকে কিছুই কি সৃষ্টি হয় না? নিশ্চয়ই তাদের থেকে বিকীর্ণ কর্ম সন্তানের জন্ম হয়। এর গুণাগুণ ভালো-মন্দ হওয়ার জন্য চরিত্রই দায়ী।

আমরা খাদ্যবস্তু থেকে শক্তি চুষে নিয়ে কর্মের মাধ্যমে তা ব্যয় করি। এই শক্তি প্রসব হয় পরমাণুর গর্ভ থেকে। স্বভাবের সীমালঙ্ঘন করলে পরমাণুর গর্ভস্থিত বিকীর্ণ সন্তানের আচরণ দুষ্কৃতিপূর্ণ হবে। সেটি ইঞ্জিনের ঘন কালো ধোঁয়ার মতো হবে। তার শরীর জুড়ে থাকবে আলকাতরার পোশাক। রোগ জীবাণুর স্বভাবের প্রকৃতির মতো থাকবে বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত। এরাই এক সময় জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে অবাধ্য সন্তানের ন্যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ জীবন ও মৃত্যুর সীমান্ত পারে এক ধরনের বাসিন্দার খোঁজ পেয়েছেন। সেগুলো উপযুক্ত পরিবেশে প্রাণী (ভাইরাস) আবার আশ্রয়দাতা ছাড়া জড় পদার্থ বলা চলে। কিন্তু একবার কোন আশ্রয়দাতা পেয়ে বসলে তখন সে আশ্রয়দাতার দেহ কোষগুলো ধ্বংস করে নিজের বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। আবার আশ্রয়দাতা ব্যতীত হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। এই অবস্থায় তার মাঝে কোন উত্তেজনা থাকে না।

সে অবস্থায় তার খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না এবং তখন বংশ বিস্তারও করে না। ঘুমের ভানে এক জায়গায় পড়ে থাকে আজীবন। অথচ বৃদ্ধও হয় না আবার মরেও না। এটিই হলো 'ভাইরাস'। আশ্রয়দাতা পেলে এরা যেভাবে প্রাণী দেহ কোষকে ধ্বংস করে, সেভাবে বস্তু বা প্রাণীর জড় কণার সাথে প্রতিবস্তুর কণা

www.nagorikpathagar.org

একত্র হলে তারাও পরস্পরকে ধ্বংস করে। সেদিক থেকে ভাইরাসের দেহ সত্তাকে প্রতিকণাও বলা চলে। এই ধরনের কিছু প্রতিকণার স্বভাবের ন্যায় ভাইরাস মানুষের অসৎ আচরণ থেকেও দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়। এমন এক ভাইরাস নিয়ে বর্তমান বিশ্ব আতঙ্কগ্রস্ত। এর নাম এইডস ভাইরাস। পাশ্চাত্য জগতে এর প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি। কিন্তু আশার কথা হলো এই ভাইরাস সকল মানুষের দেহে আঘাত করে না। শুধু কয়েক শ্রেণীর সীমালঙ্ঘনকারী পাপীর দেহেই এরা বংশ বিস্তার করে। এদের মধ্যে সমকামী, উভয়কামী, মাদকাসক্ত, ড্রাগ সেবনকারী (নেশা জাতীয়) উল্লেখযোগ্য। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন রক্ত ট্রান্সমিশন, ইন্‌জেকশানের সুঁচ ইত্যাদি দিয়েও ভালো মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু তারা যেভাবেই সংক্রামিত হোক না কেন তার উৎসটা আসলেই সীমালঙ্ঘনকারী অসৎ ব্যক্তির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এই ভাইরাসকে পাপী দেহের প্রতিকণা বা পাপ কণাও বলা চলে। যেহেতু পাপীদের দেহেই এর উৎপত্তি স্থল, দুনিয়াতে জীবন ও মৃত্যুর সীমান্ত পাড়ের বাসিন্দা ভাইরাস নামক প্রতিকণা যদি পাপীর দেহেই জন্ম নিয়ে তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে, তবে যেখানে মৃত্যুর দরজা খোলা থাকবে না, সেই জগতে এরূপ দেহ-অস্তিত্ব থেকে পয়দা হওয়া অগণিত সত্তা তার জীবনকে তো অবশ্যিই জ্বালাময় করে তুলবে বৈ কি? তাই আল্লাহ স্বভাবের সীমালঙ্ঘনকারীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, "মানুষ যখন পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাবে তখন তাদের মাঝে এমন রোগ-বালাই দেখা দিবে, যার নাম তাদের বাপ-দাদা আগে কখনো শুনেনি।"

আজ মানুষ পাপের সমুদ্রে ডুবে গিয়ে এই ভাইরাসের (এইডস) প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মোটের উপর যতদিন মানুষ নিজেদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ সীমার মধ্যে না নিয়ে আসবে ততদিন এরূপ একটার পর একটা দুরারোগ্য জাতীয় জীবাণু সৃষ্টি হতে থাকবে। এসব রোগ জীবাণুর চিকিৎসা ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার মতো মানুষের নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরেই থাকবে। এখানে উপলব্ধির বিষয় হলো এই, যেখানে সীমালঙ্ঘনকারীর দেহ কারখানায় উৎপন্ন জীবন-মৃত্যুহীন অদৃশ্য প্রতিকণার ন্যায় ভাইরাস জাতীয় পাপ কণা দুনিয়ার জীবনেই কষ্ট দেয়, সেখানে এদেরই জীবনের ব্যাধিগ্রস্ত বিকীর্ণ কর্মশক্তি কেন তার যন্ত্রণার কারণ হবে না? সেদিন খুব দূরে নয়, দুনিয়ার জীবন শেষ হলেই তাদের ক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। আজ হয়তো দুনিয়ার প্রাকৃতিক আইনে তারা আমাদের চারপাশেই ঘুমিয়ে আছে অথবা মৃত্যুহীন অবস্থায় ঘুরাফেরা করছে। এদের কাছেই হয়তো একদিন ফিরে যেতে হবে। সেদিন কোন সুপারিশ, তদবির এরা শুনবে না।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন– "তা আর কিছুই নয় তোমাদের কৃতকার্যসমূহই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।"

"পৃথিবীতে যে যা কিছু করবে তার অধিক তাকে দেয়া হবে না।" (আল-হাদীস)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দোযখীদেরকে বলেছেন– "দোযখ কাফিরদেরকে বেষ্টন করে রয়েছে।" (অর্থাৎ দোযখ তাদের সঙ্গেই আছে) (সূরা আনকাবূত : রুকূ-৬)

তিনি আরও বলেছেন–

"যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে বিমুখ রয়েছে; নিশ্চয়ই তার জন্য বড় কষ্টময় জীবিকা রয়েছে।" (পারা-১৬ : রুকূ-৭)

"যদি তোমরা বিশ্বস্ত জ্ঞানে জানতে পারতে, নিশ্চয়ই তোমরা দোযখ দেখতে পারতে; তখন তোমরা নিশ্চয়ই তাকে এরূপ দেখাই দেখবে যে, চাক্ষুস বিশ্বাস হবে।" (সূরা তাকাসুর : রুকূ-১)

যেদিন বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা ও তার কাঠামো সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে নতুন বিশ্ব ও তার আইন ঢেলে সাজানো হবে, সেদিন আজকের বিকীর্ণ কর্মশক্তির গুণাগুণ আমাদেরকে অবশ্যই ভাবিয়ে তুলবে। তখন হয়তো আবার দুনিয়ায় এসে ভালো কাজ করার ইচ্ছা জাগবে। কিন্তু মায়ের পেট থেকে প্রসব হয়ে গেলে যেমন সেখানে যাওয়া আর সম্ভব হয় না তেমনি ইচ্ছা থাকলেও তা আর সম্ভব হবে না?

বৈজ্ঞানিকগণ সকাল-সন্ধ্যার পালাবদলের মধ্যে আমাদের মন ও দেহ কারখানায় কি যে তৈরী হয় তার খবর বলতে না পারলেও, অন্যান্য বস্তু থেকে যে শক্তি বিকিরণ হয় তার স্বভাব ও গুণাগুণের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের গবেষণায় যে সকল জিনিসের কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিই উল্লেখযোগ্য। তারা বলেন X-ray রশ্মি, বৈদ্যুতিক বাতি, দাড়ি কামানোর ক্ষুর, ওয়াশিং মেশিন ও প্রতিটি বস্তু থেকে কাজে অকাজে শক্তি বিকিরণ হয়। এই বিকীর্ণ শক্তির প্রকৃতি ও গুণাগুণ হলো– কৃষ্ণকায়া বিকীর্ণ শক্তি এবং আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রভাবশক্তি। এসব বিকীর্ণ শক্তির মধ্যে অত্যধিক কম্পন সংখ্যার বিকীর্ণ শক্তি মানুষের ক্ষতি করে। পক্ষান্তরে অল্প হার্জ কম্পনের বিকীর্ণ শক্তি সেদিক থেকে নিরাপদ। কিন্তু আমাদের দেহ বৈদ্যুতিক যন্ত্র না হলেও কিংবা প্রাণহীন জড়বস্তু না হলেও আমরা শক্তি বিকিরণ করি। কোন ধরনের স্বভাবের বিকীর্ণ শক্তি আমাদের পরকালীন জীবন ব্যবস্থা ও দুনিয়ার জীবনের জন্য নিরাপদ হবে তা দুনিয়ার সীমালঙ্ঘনকারীর স্বভাবের প্রতিক্রিয়ার ভোগান্তি দেখে অনুমান করা যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ যত কাজ নিষেধ করেছেন, সেসব কাজই

www.nagorikpathagar.org

অমঙ্গলকর। তাই পাপীর কর্মের ফসল তার বিকীর্ণ সত্তা, উভয় জীবনের জন্য উত্তপ্তকর ও যন্ত্রণাময় থাকবে। আল্লাহ দোযখীদের সম্পর্কে বলেছেন–

"দোযখীগণ আগুন এবং আগুনের মতো উত্তপ্ত পানির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে।" (আল-কুরআন)

পক্ষান্তরে আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যারা তাঁর মর্জি মতো স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কোন কাজ করবে না, তাদের থেকে মঙ্গলদায়ক সত্তাই বিকীর্ণ হবে। এ ধরনের ব্যক্তিগণই থাকবে সেদিন পরম সুখে। পক্ষান্তরে পাপীরা দুঃখের সাগরে সাঁতার কাটলেও তাদের আর মুক্তির পথ থাকবে না। নিজের ভুল সেদিন বুঝতে পেরে দানা পানি ছেড়ে তজবি নিয়ে বসে পড়লেও সেখানে কোন সওয়াবের কণা তৈরী হবে না। এই দুনিয়াই হলো এর উপযুক্ত স্থান। কিন্তু এখানে তাদের আসা আর সম্ভব হবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা ক্বাফ-এ উল্লেখ করেছেন–

"এখন আমি তোমার হতে পরদা উঠিয়ে নিয়েছি কাজেই আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর হয়েছে।" (পারা-২৬ : রুকূ-২)

তখন লোকটি বলবে–

"হে আমাদের প্রভু! আমরা দেখলাম এবং শুনলাম অতএব আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন আমরা নেক কাজ করব। নিশ্চয়ই এখন আমরা বিশ্বাসী হয়েছি।" (পারা-২১, সূরা সিজদা : রুকূ-২)

পরকালীন জীবনের শারীরিক দোযখের উপাদান এ দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রের সম্পদ। এ সম্পদ মানুষের দেহ কারখানার স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কাজ থেকেই উৎপন্ন হয়। এদের চরিত্র সংক্রামক জীবাণুর ন্যায় বিভীষিকাময় ও এদের গায়ের রঙ আলকাতার ন্যায় মলিন। এগুলো উড়ে যায় ঘন কালো ধোঁয়ার ন্যায়। এরূপ সত্তা দিয়ে যে জগতটি তৈরী হবে তার নাম জাহান্নাম। দোযখের বর্ণনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে রূপক উপমা দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা সহজে তা অনুমান করতে পারি। আসলে দোযখের বর্ণনায় সাপ বিচ্ছুর যে কথা বলা হয়েছে এদের স্বভাব প্রকৃতি ও গঠন দুনিয়ার সাপ বিচ্ছুর মতো নয়। এদের স্বভাব, আকৃতি, প্রকৃতিই অন্য রকম। সেগুলো ভাইরাসের মতো সূক্ষ্ম হলেও এরা দুনিয়ার সাপ বিচ্ছুর তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী।

বেহেশতের বর্ণনায়ও এরূপ অনেক রূপক বর্ণনা এসেছে। যেমন তুলনা করা যায় পানীয় হিসেবে শরবতের কথা। সেই পানীয় যদি দুনিয়ার পানীয়ের মতো হতো

www.nagorikpathagar.org

তবে তা পান করলে অবশ্যই প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি করার প্রয়োজন পড়তো। তাই এসবও রূপক বর্ণনা। কিন্তু জাহান্নামের শুধু শারীরিকভাবেই আযাব হবে না, সেখানে মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করতে হবে। আজকে দুনিয়ার বেলায় যেরূপভাবে মানসিক যন্ত্রণা হয়, সেদিন তিনটি বিশেষ কারণে সেভাবেই মানসিক যন্ত্রণা শুরু হবে। এই তিনটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

প্রথমত দুনিয়ার স্থান-কালের জন্য অন্তর জ্বালা

এই যন্ত্রণা এরূপ যেমন একজন যাত্রী অতি ব্যস্ততার মধ্যে ট্রেনে চড়ে বসলো। গন্তব্য অনেক দূরে। কিন্তু প্রয়োজনের জন্য সাথে কি নিতে হবে তা একবারও ভাবেনি অথবা যে জিনিস নিয়েছে, সেগুলো অচল কিংবা যা নিয়েছে তা অপ্রতুল। এসব নিয়েই গন্তব্যে পৌঁছে গিয়ে দেখলো সে চরম ভুল করে এসে পড়েছে। এবার সে তীব্র প্রয়োজন অনুভব করল। কিন্তু এখানে এগুলো পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই কিংবা পূর্বের স্থানে ফিরে যাওয়াও আর সম্ভব নয়। এর ফলে দুনিয়ার স্থান-কালের জন্য অনুশোচনায় হৃদয় জুড়ে অনলের তুফান শুরু হয়ে যাবে। এ থেকে শুরু হবে তার অন্তর জ্বালা। এ ধরনের অন্তর জ্বালা এক প্রকার মানিসক আযাব।

দ্বিতীয়ত স্রষ্টার সাথে সম্পর্কহীনতার অনুশোচনা

স্রষ্টার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে ঈমানের সাথে আমল সম্পর্কযুক্ত। ঈমান ও আমলের একাত্মতা থেকে প্রেমবোধ গড়ে উঠে। কার্যত প্রেমবোধ থেকেই আনুগত্যের শর্ত পূরণ হয়। দুনিয়াতে যে যত বেশি খোদাপ্রেমিক তাকে তত বেশি ঈমানদার বলা চলে। এর মাধ্যমে পরকালে আল্লাহর দিদার বা সাক্ষাত পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কারণ প্রেমের ঐশী বন্ধনে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে পয়দা হয় আকর্ষণ। এর ফলে সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার গুণ রিলে হয়। মানুষ যখন খোদার গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় তখন সে পূর্ণতা লাভ করে। পরিশেষে মানুষ পরিতুষ্ট আত্মার অধিকারী হয়। এরূপ আত্মা আল্লাহর সৌমহনী ক্ষমতার কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করে। সে আত্মা অভাববোধকে জয় করে সার্বিক দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করে। যার কোন অভাব থাকে না, সে কোন পীড়াও অনুভব করে না। এরূপ গুণশীল আত্মার মূল বাহন দেহ-কারখানা থেকে বিকীর্ণ হবে উত্তমমানের সত্তা, যা পরকালের সওদা। এই সওদা অচল নয়। কিন্তু যারা খোদার সাথে সম্পর্কহীন থাকে তাদের কর্মশক্তির বিকীর্ণ সত্তা অচল মানের থাকে। এই অচল মুদ্রা পরকালীন জীবনের জন্য আযাবের উপাদান। যখন দোযখ নামের জেলখানায় এদের দিয়ে আযাব শুরু হবে তখন স্রষ্টার সাথে

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কহীনতার জন্য চরমভাবে মানসিক আযাবও আরম্ভ হবে। এ ধরনের আযাবও মানসিক দোযখ।

তৃতীয়ত এ প্রকার মানসিক জ্বালা হলো পরকালীন সম্পদহীনতার জন্য অনুশোচনা

এ প্রকার মানসিক জ্বালা জাহান্নামবাসীদের সর্বক্ষণই থাকবে। তবে প্রথম দিকে জান্নাতবাসীদেরও থাকবে। কিন্তু পরে অবশ্য আল্লাহ তাদের সে অনুশোচনা দূর করে দিবেন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কাজ করার জন্য নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে সৎ ও সুন্দর গুণাবলীতে বলীয়ান হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এই সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল নিহিত। এর মাধ্যমেই আখেরাতের মূল্যবান সম্পদ তৈরী হয়। কিন্তু যারা দুনিয়ার জীবনে একেবারে আল্লাহর আদেশ নিষেধকে তোয়াক্কা করেনি তারা হবে একেবারে সম্পদহীন, অপরদিকে যারা অবহেলায় আমল করতে অলসতাবোধ করতো তারাও পুরোপুরি সম্পদশীল হতে পারবে না। এরা নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী। যখন পরকালের সম্পদহীনতার জন্য আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানার গুরুত্ব বুঝে আসবে তখন মনের কোণে লজ্জা ও অবাধ্যতার ঘৃণাবোধ জাগবে। এই ঘৃণাবোধ এক প্রকার মানসিক আযাব এবং তার জন্য সম্পদহীন হওয়াতেও অনুশোচনার অনল হৃদয়কে করবে ক্ষত-বিক্ষত। এই প্রকার যন্ত্রণাও মানসিক দোযখ।

আল্লাহ বলেন– "প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে সে তা নিজের জন্যই করে; কেউ কারো বোঝা বহন করে না।"

"হ্যাঁ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে, বস্তুত এরূপ লোকই দোযখী হয়, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।" (আল-কুরআন)

"কেউ কারও বোঝা বহন করবে না; যদি কারও উপর গোনাহর বোঝা চাপিয়ে থাকে এবং সে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য কাউকেও ডাকে, তবে সে তার বোঝার কোন অংশই নিজের মাথায় তুলে নিবে না; সে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজনই হউক না কেন।" (আল-কুরআন)

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহ) কিমিয়ায়ে সা'দাত গ্রন্থে তিন প্রকারের আত্মিক দোযখের কথা বর্ণনা করেছেন। এগুলো হলো– পার্থিব আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য হতে বিচ্ছেদজনিত অগ্নি। লজ্জা বা অপমানজনিত অগ্নি। আল্লাহ তা'আলার অনুপম সৌন্দর্য হতে বঞ্চিত হওয়ার দরুন অনুতাপজনিত অগ্নি।

www.nagorikpathagar.org

মূলত মানুষ যখন পার্থিব জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় তখন তার চোখের পর্দায় অপার্থিব জগতের সম্পদই মূল্যবান মনে হয়। এতে পার্থিব জগতের সম্পদের প্রতি তার কোন মায়াবোধ থাকে না। কিন্তু পার্থিব জগতের সম্পদের মোহে যেহেতু সে পরকালের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলো তাই সে পরকালের সম্পদহীনতার জন্য আফসোস করবে, অনুশোচনার অনলে পুড়ে মরবে। সে সময় পৃথিবীর ব্যর্থ জীবন ব্যবস্থার সময়ের দিকে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাবোধ জাগবে। কিন্তু মাতৃগর্ভ থেকে প্রসব হওয়ার সময় যেমন কোন অভাব নিয়ে আসলে তা পূরণের জন্য আর মাতৃগর্ভে যাওয়া সম্ভব নয়; তেমনি দুনিয়ায় আসতে চাইলেও তার পক্ষে সে অভাব পূরণ করে নেওয়ার জন্য এখানে আসা সম্ভব হবে না। তাই পৃথিবীর ফেলে আসা সময়ের জন্য অনুশোচনায় ফেটে পড়বে। বার বার আকুল-ব্যাকুল হয়ে ফরিয়াদ জানাবে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে বিরহের অনলেই পুড়তে থাকবে। ধৈর্যের সীমা শেষ হয়ে গেলে 'মৃত্যু দূত'কে ডাকবে জীবন বায়ু বের করে নিতে। এরও যখন খবর থাকবে না, তখন আল্লাহর কাছে বেহুঁশ হয়ে মৃত্যু প্রার্থনা করবে। কিন্তু মৃত্যুর দুয়ারে চিরদিনের জন্য তালা লেগে যাবে। আল্লাহ বলেন–

"আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব দিতে থাকব, তারা যে সকল অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল তা তাদের ঐসব কৃতকার্যের ফল।"

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করেছে তা নিজের জন্যই করেছে।" (সূরা হা-মীম, আস-সাজদা)

"যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে বিমুখ হয়েছে, নিশ্চয়ই তার জন্য বড় কষ্টময় জীবিকা রয়েছে।" (পারা-১৬ : রুকূ-৭)

"তা এজন্য যে তারা দুনিয়ার জীবনকে পরকাল অপেক্ষা অধিকতর ভালোবেসে ছিল। এরূপ হলে তার শাস্তি বড়ই ভীষণ হবে।" (পারা-১৪ : রুকূ-১৪)

বর্তমান বস্তুজগৎ-এর সকল আকার-আয়তনশীল পদার্থ অসীম শূন্যে সাঁতরাচ্ছে। একে কোথাও খুঁটি পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কতোদিন এভাবে আর সাঁতরাবে? গতি চিরন্তন হওয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যুক্তিহীন। থার্মোডিনামিক্সের নিয়ম অনুসারেই বিশ্ব ছুটে চলছে অনিশ্চয়তার দিকে। তাই এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী। এ জগৎ (পৃথিবী) থেকে অসীম দূরে বিশাল দ্বীপ-জগতের মতো নীহারিকার জগৎ রয়েছে। এর কোনটিতে রয়েছে ঘন কালো ধোঁয়ার মতো অবস্থা। পক্ষান্তরে আরও অসংখ্য নীহারিকা রয়েছে আলোকোজ্জ্বল। এগুলো এতো বিশাল বিশাল যা

www.nagorikpathagar.org

আলোকবর্ষের হিসেবেও মাপা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আবার এদের একটি হতে অন্যটির দূরত্ব প্রায় বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ। সেসব দ্বীপ-জগতের উপাদান আমাদের পৃথিবীর বিকীর্ণ শক্তির অংশ যে নয় একথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তবে শক্তির অবিনশ্বরতার আলোকে এ বিশ্বাস করা যায় যে, এর সাথে বিকীর্ণ শক্তির সম্পর্ক আছে। তাছাড়া বেহেশত, দোযখের রূপ-চরিত্র, আকার আয়তনের সাথেও এর অনেকটা মিল রয়েছে। আমাদের অসৎ কর্মের বিকীর্ণ শক্তির মাধ্যমে যে শারীরিক আযাব হতে পারে তা সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস ইত্যাদি রোগ দিয়েই প্রমাণ করা যায়। আমাদের দেহের কোষকলার স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ টিউমার পিণ্ডের সাথে সুস্থ কোষকলার কোন সম্পর্ক থাকে না। এটি প্রাথমিক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে স্ফীত হওয়ার জন্য সুস্থ কোষকে চেপে ধরে তার স্থলে জায়গা করে নেয়। এর ভেতরে ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির মাত্রার কোন সুশৃঙ্খলতা থাকে না। সুস্থ কোষের স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ এ ধরনের কোষকলার (নিজ দেহের বিকীর্ণ সত্তা) মাধ্যমে যদি পুরো দেহ তৈরী করে তার ভেতর আযাবের উপাদান লাগিয়ে দেয়া হয় তবে দেহের স্ফীতির সাথে সাথে আযাবের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমাদের দুনিয়ার জীবনে, আমাদেরই স্বভাবের নীতি বিরুদ্ধ কাজ থেকে যে এরূপ সত্তা তৈরী হতে পারে এর দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরকালের দেহসত্তার উপাদান জড় পদার্থের ন্যায় স্থূল না হলেও তা যেরূপেই হউক না কেন, সেটি টিউমার পিণ্ডের গঠন ও বৃদ্ধির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়েই চলবে। তাই দোযখবাসীর এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় এবং তা ক্রমশই বাড়তে থাকবে। পক্ষান্তরে আযাবের মাত্রাও বৃদ্ধি হয়ে চলবে। আল্লাহ কোন পথে চললে এ ধরনের সত্তা তৈরী হতে পারে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে দ্বীন ইসলামই মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। এর মাঝেই মানব জাতির কল্যাণের শিখা প্রজ্জ্বলিত। কাল হাশরে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি আমলের (কাজের) সত্তা পরিমাপ করা হবে। তখন যাদের নেক আমলের চেয়ে বদ আমল বেশি হবে; তারাই হবে জাহান্নামী।

আল্লাহ বলেন– "সেদিন নিশ্চিতরূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতঃপর যার আমলের ওজন ভারী হবে; সেই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে; তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল-আ'রাফ)

"সেদিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্যে পৃথক পৃথকভাবে বের হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও সৎকাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।" (সূরা-৯৯ : ৬-৮)

www.nagorikpathagar.org

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে। (সূরা-৩ : ৩০)

জগৎ সৃষ্টির পর থেকে অদ্যাবধি যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা একদিন সৃষ্টি হবে এর কোন কিছুই বিলীন হবে না। মানুষ আর জীন ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীই পরকালে সুখ-দুঃখের অংশীদার না হলেও তাদের মৌলিক সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়ার কোন নিয়ম নেই। সেদিনের বিশ্ব ব্যবস্থার নিয়মনীতি আজকের মতো হবে না। সুখ-দুঃখ সেদিন আলাদা হয়ে যাবে। জাহান্নাম নামের দুঃখের জগতের গন্ধ জান্নাতবাসীদের নাগালের বাইরে থাকবে। সেই জান্নাত পরম সুখ শান্তির স্থান। বিজ্ঞানের আলোকে জান্নাতের সুসংবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পাওয়া গেলে বিশ্বাসের খুঁটি শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে অনেকের জন্য সহজ হবে। তা না হলে দিক ভ্রান্ত নাবিকের মতো জীবন নদীর শেষ ঠিকানা বা পথ হারিয়ে অন্ধকার জাহান্নামেই ঠাঁই নিতে হবে। সেই বিপদে যেন আমাদের পড়তে না হয় সে কামনাই আমাদের সকলের হওয়া উচিত।

জান্নাতের সুখ শান্তির বর্ণনা ও কর্মের বিকীর্ণ শক্তির সম্পর্ক

এক লোক শীতের রাতে কনকনে ঠাণ্ডায় লেপ কাঁথা ছুড়ে ফেলে আযান শুনার সাথে সাথে অযু করে স্রষ্টার আনুগত্যে সাড়া দিয়ে কল্যাণের জন্য মসজিদে গিয়ে আজীবন প্রার্থনা করেছে। দুনিয়ার সকল অন্যায়, মোহ, মায়া, কাম, ক্রোধ ত্যাগ করে ন্যায় ও সত্যের পথে চলেছে। ক্ষিধের জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছে তবু চুরি করেনি, ঘুষ খায়নি, সুদ খায়নি, মানুষের সাথে প্রতারণা, ছলচাতুরী করেনি। পোষা প্রাণীর মতো আত্মসমর্পণ করেছে খোদার কাছে। রাতের আঁধারে নিদ্রা ত্যাগ করে খোদাকে একান্ত গোপনে স্মরণ করেছে অন্তর দিয়ে, নিজের ভুল ভ্রান্তির জন্য আসামীর মতো দু'হাত জোড় করে মাফের আশায় চোখ থেকে পানি ফেলেছে।

পক্ষান্তরে যারা স্রষ্টার ডাকে সাড়া দেয়নি, অন্যায়, অসত্যের পথে জীবন কাটিয়েছে, তাদের উভয়ের পরকালীন জীবন যদি একই রকম হয়, তাহলে সৃষ্টির বিধানেই তা অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে। বিশ্ব ব্যবস্থার প্রকৃতিতে কোন প্রকার অসঙ্গতি সে ঠাঁই দিতে রাজি নয়। যখন কোন স্থানের বায়ু গরম হয়ে উঠে তখন তা হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। এ সময় বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস সে স্থান দখল করতে ছুটে আসে। এখানেও দেখা যায় গরম আর ঠাণ্ডা এক সাথে মিলে মিশে চলেনি। ফুলে থাকে সুগন্ধ আর মলে থাকে দুর্গন্ধ। এখানে ফুলের পরিবেশে থাকে ফুলের মতো প্রাণী আর পায়খানার পরিবেশে থাকে সেই শ্রেণীরই প্রাণী।

www.nagorikpathagar.org

তাই পরকালীন জীবনে ভালো মন্দের পারিপার্শ্বিক অবস্থান একত্রে যে হবে না, তা মহামহিয়ান সৃষ্টিকর্তা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।

অন্যায় অসত্যের পথে যারা জীবন কাটাবে তাদেরকে জানালেন হুশিয়ারী সংবাদ আর ন্যায় ও সত্যের পথে যারা চলবে তাদেরকে দিয়েছেন সুসংবাদ।

"দুষ্কৃতিকারীরা কি ধারণা করেছে যে, আমরা তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের সমান করে দেবো? এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? তারা কী মন্দ বিষয়েই না সিদ্ধান্ত করেছে।" (আল-কুরআন)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।" (আল-কুরআন)

"জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে আর দোযখকে পথভ্রষ্ট লোকদের সামনে পেশ করা হবে।" (সূরা-২৬ : ৯০-৯১)

ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়ার সাথে সাথে পরম করুণাময় জান্নাতবাসীকে কি কি উপহার দিবেন তাও জানিয়ে দিয়েছেন। জান্নাতে এতো সুখ, এতো শান্তি রয়েছে যা কোন মানুষের পক্ষেই এই ধুলির ধরায় থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ বলেন– "আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সুখের স্থান নির্মাণ করে রেখেছি যা কোন চক্ষু কোন দিন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন হৃদয় কল্পনা করতে পারেনি।" (আল-কুরআন)

"আর যারা খোদার সামনে পেশ হওয়ার ভয় পোষণ করে, এমন প্রত্যেক লোকের জন্যে দু'টি করে বাগান আছে। তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ পুরস্কার তোমরা অস্বীকার করবে? (সে বাগান) সবুজ শ্যামল ডাল পালায় ভরপুর। দু'টি বাগানে দু'টি ঝর্নাধারা সদা প্রবাহমান। উভয় বাগানে প্রত্যেকটি ফলের দু'টি রকম হবে। জান্নাতের লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসবে, যার আবরণ মোটা রেশমের তৈরী হবে। বাগানের বৃক্ষশাখাগুলো ফলভারে নত হয়ে আসবে। সেখানে আরও থাকবে লজ্জায় দৃষ্টি অবনতকারিণী পরমা সুন্দরী। ইতিপূর্বে এদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ অথবা জীন। তারা হবে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী, রক্ষিত মণি-মাণিক্যের মতোই। ভালো কাজের পুরস্কার ভালো ছাড়া আর কি হতে পারে?

সে দু'টি বাগান ছাড়াও দেয়া হবে আরও দু'টি বাগান। ঘন সবুজ শ্যামল সতেজ বাগান। দু'টি বাগানে দু'টি ঝর্নাধারা ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্তমান থাকবে। তাতে বেশুমার ফলমূল, খেজুর, আনার প্রভৃতি থাকবে। (এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে) সতী-সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রী। তাঁবুতে অবস্থানকারী হুরপরী। এসব

www.nagorikpathagar.org

জান্নাতবাসীদেরকে এর আগে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ অথবা জীন, এসব জান্নাতবাসী সবুজ গালিচা এবং সুন্দর ও মূল্যবান চাদরের উপর ঠেস দিয়ে বসবে।" (সূরা-৫৫ : ৪৬-৭৬)

"যারা আল্লাহকেই একমাত্র মা'বুদ বলে বিশ্বাস করেছে এবং সেই বিশ্বাসের উপর অটল রয়েছে তাদের নিকট ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে আসবে এবং তাদেরকে বলবে যে, তোমাদের কোন ভয় নেই। কোন চিন্তা নেই। তোমরা বেহেশতের সুসংবাদ শ্রবণ কর, যা তোমাদেরকে দেয়া হবে। আমরা দুনিয়াতে তোমাদের বন্ধু ছিলাম এবং আখেরাতেও তোমাদের বন্ধু থাকব। সেখানে তোমরা যা কিছু আশা করবে তা সবই পাবে। এটাই হবে তোমাদের প্রতি আল্লাহর মেহমানদারী।" (সূরা-৪১ : ৩০-৩২)

"যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎকার্য করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন জান্নাতে স্থান দান করবেন। যার নিম্ন দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, বেহেশতীগণ স্বর্ণের কাঁকন পরিধান করবে ও মতির অলঙ্কার ও রেশমী বস্তুসমূহের দ্বারা বিভূষিত হবে। (সূরা-২২ : ২৩)

"মুত্তাকীগণ আখেরাতে অতি উত্তম আশ্রয় লাভ করবে। তা হবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী আরাম। তাদের জন্য জান্নাতে আদনের দরজাসমূহ উন্মুক্ত রয়েছে, তাতে তারা পরম আরামে ঠেস দিয়ে বসে নানা প্রকার ফল, খাদ্য ও পানীয়ের জন্য ফরমায়েশ করবে। তাদের সামনে নিম্ন অবনতা অসামান্য রূপবতী অল্প বয়স্কা হুরগণ অবস্থান করবে। মুমিন বান্দাদেরকে মহাপুরস্কার দেয়া হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এটাই সেই অফুরন্ত নিয়ামত। (সূরা-৩৮ : ৪৯-৫৪)

"তাদের জন্য আমার নিকট হতে নেকী নির্ধারিত ছিল তারা জাহান্নামের আযাব থেকে দূরে থাকবে। যারা দোযখের আযাবে গ্রেফতার থাকবে, তাদের চিৎকার ও ক্রন্দন এরা শুনতে পাবে না। অধিকন্তু তাদের মন যা চাইবে, বেহেশতের মধ্যে তারা তাই পাবে। তাদের সুখ অনন্তকাল স্থায়ী হবে, কোনরূপ ভয় বা আতঙ্ক তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ফেরেশতাগণ এসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবে, আল্লাহ তোমাদের নিকট যে দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা হলো এই দিন। (সূরা-২১ : ১০১-১০৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদার সৎ ও নেক আমলকারীর দুনিয়ার কর্মের প্রতিফল হিসেবে জান্নাতে সুখ দিবেন। এই সুখের উপাদান এই দুনিয়া থেকেই পাঠানো হয়। আমাদের ভালো কাজের মাধ্যমেই সেগুলো তৈরী হয়। হাত পা নাক কান চোখ মুখসহ সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ হতেই সে সত্তা তৈরী হয়। কোরআন মাজীদের অনেক জায়গায় জান্নাতের সুখের খবর বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল (সা)

www.nagorikpathagar.org

নিজেও জান্নাতের সুখ শান্তির কথা বর্ণনা করেছেন। রাসূলের (সা) কথা হাদীস হিসেবে সংকলিত করা হয়েছে। হাদীসের এসব সন্নিবেশিত বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতে চন্দ্র বা সূর্যের আলো থাকবে না এবং কোন প্রকারের আলো জ্বালাবার প্রয়োজনও হবে না। আল্লাহ পাকের আরশের জ্যোতিতে তা সর্বদাই সমভাবে আলোকিত থাকবে। জান্নাতে শীত বা গ্রীষ্ম কিছুই থাকবে না, তা বর্তমান বিশ্বের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক আরামের থাকবে।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন– "সেখানে অধিক শীতও থাকবে না; অধিক গ্রীষ্মও থাকবে না।" (সূরা-৭৬ : ১৩)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, জান্নাতবাসীগণ যত অধিক পরিমাণে আহার করুক না কেন, সেজন্য তাদের কোন অসুখ বা অশান্তি হবে না। একটা সুগন্ধিযুক্ত আরামদায়ক ঢেকুর ও সুঘ্রাণযুক্ত ঘর্ম নিঃসরণ করবে। তাদের পায়খানা বা প্রস্রাবসহ কোন প্রকার পয়ঃনিষ্কাশন প্রয়োজন হবে না। জান্নাতবাসীদের দৈহিক রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে তাদের কোন প্রকার গোঁফ দাড়ি বা অন্য কোন প্রকার লোম থাকবে না। প্রত্যেক পুরুষ ৩৬ বৎসরের যুবক এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোক ২৫ বছরের বয়স্কা যুবতী সদৃশ হবে। তাদের এই বয়স কখনো বাড়বে না অর্থাৎ তাদের রূপ এবং যৌবন কখনও ক্ষুণ্ন হবে না, বা কখনো তারা বৃদ্ধ হবে না। তাদের প্রত্যেকেরই সহবাস ক্ষমতা একশত গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্যেক বার সহবাসের পর পুরুষগণ যৌবন এবং স্ত্রীলোকগণ কুমারীত্ব লাভ করবে। তাদের সহবাসের আনন্দও একশত ভাগ বৃদ্ধি পাবে। সহবাসের পর এক প্রকার বিশেষ বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে তাদের বীর্যপাতের কার্য সমাধা হবে। সুতরাং তাদের শরীর অপবিত্র হবে না এবং তাদের গোসল করার প্রয়োজন হবে না। জান্নাতবাসিণী স্ত্রীলোকদের ঋতুস্রাব হবে না। বেহেশতবাসীগণের খেদমতের জন্য তিন শ্রেণীর খাদেম থাকবে। যথা– ফেরেশতা, হুর, গেলমান। এর মধ্যে জান্নাতবাসী প্রত্যেক পুরুষের আপন স্ত্রী ছাড়াও অতিরিক্ত ৭০ জন করে হুর প্রদান করা হবে। তারা এতই সুন্দরী ও লাবণ্যবতী হবে যে, ৭০ পরদা কাপড়ের ভেতর হতেই তাদের রূপ বিজলীর মতো ফুটে বের হবে। তাদের চেহারা এমন স্বচ্ছ হবে যে, তদ্বারা আয়নার কাজ চলবে।

হুরদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন যে, বেহেশতবাসীগণকে পুরস্কারস্বরূপ এরূপ হুর দান করা হবে যারা নিম্নে দৃষ্টিকারিণী এবং যাদেরকে কখনও কোন মানব বা জীন স্পর্শ করেনি। (সূরা-৫৫ : ৫৬)

বেহেশতের প্রশস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন–

www.nagorikpathagar.org

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমতা এবং বেহেশতের দিকে ধাবিত হও যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের প্রশস্ততার সমতুল্য এবং যা এমন লোকের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ঈমান এনেছে।" হাদীসে বলা হয়, এরূপ প্রশস্ততার বেহেশত শুধু একজন বেহেশতবাসীকেই দেয়া হবে।

আল্লাহ পাক মহাপবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের সূরা আদ দাহরে বেহেশতীগণের নিয়ামত সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যেমন–

"পুণ্যবান ব্যক্তিগণ এক অপূর্ব পানীয় পান করবে যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে।" (সূরা দাহর)

"আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এক বিশেষ প্রস্রবণ হতে তা পান করবে, যা তাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে চলবে।" (সূরা দাহর)

"যারা আল্লাহকে ও কিয়ামতের ভয়াবহতাকে ভয় করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হয়ে দারিদ্র্য ও ইয়াতিমদেরকে আহার করায় (এবং বলে) আমরা তোমাদের নিকট থেকে বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ লাভের আশায় তোমাদেরকে আহার করাইনি, বরং আমরা শুধু আল্লাহর মুহব্বতে এবং সে কঠিন দিনের ভয় রাখি (বলেই আহার করাই তোমাদেরকে)"। (সূরা-৭৬ : ৭, ৮, ৯, ১০)

"অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেই কঠিন দিনের ভয়াবহতা হতে রক্ষা করবেন এবং তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে ফুর্তি আনন্দ উদ্যান এবং রেশমী পোশাকসমূহ দান করবেন।" (সূরা-৭৬ : ১১-১২)

"তারা তার ভেতরে উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং সেখানে অধিক শীত ও অধিক গ্রীষ্ম অনুভব করবে না।" (সূরা-৭৬ : ১৩)

"বাগানের ছায়াসমূহ তাদের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং বৃক্ষের ফল ও পুষ্পগুলোকে নিম্নগামী করে রাখা হবে।" (সূরা-৭৬ : ১৪)

"এবং তাদের জন্য রৌপ্যের পাত্রের এবং সোরাইতে তাদের ইচ্ছা মতো পানীয় পরিবেশন করা হবে।" (সূরা-৭৬ : ১৫-১৬)

"সেখানে তাদেরকে জানজাবিল নামক উৎকৃষ্ট পানীয় দান করা হবে এবং সানসাবীল নামক আরও একটি প্রস্রবণের পানীয়ও তাদেরকে পরিবেশন করা হবে।" (সূরা-৭৬ : ১৭-১৮)

"তাদের মধ্যে চির কিশোরগণ সর্বদা ঘুরাফেরা করতে থাকবে। তুমি তাদেরকে দেখলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফল বলে মনে করবে।" (সূরা-৭৬ : ১১)

www.nagorikpathagar.org

"যখন তথায় (বেহেশতে) দৃষ্টিপাত করবে তখন অবর্ণনীয় সম্পদসমূহ দেখতে পাবে।" (সূরা-৭৬ : ২০)

"তাদের পোশাক সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং পুরু রেশমের জামা এবং তারা ভূষিত হবে রৌপ্যবলয়ে, তাদের প্রভু তাদেরকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।" (সূরা-৭৬ : ২১)

"(তোমাদেরকে বলা হবে) এটাই তোমাদের বিনিময়।" (সূরা-৭৬ : ২২)

জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফল-মূল সম্পর্কে বর্ণনায় রয়েছে যে বেহেশতের বৃক্ষগুলোর বাকল স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত। সেখানের প্রত্যেকটি বৃক্ষের বোধশক্তি ও চলন শক্তি রয়েছে। কোন বেহেশতি যদি কোন ফল ভক্ষণের ইচ্ছা করে সেই ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখনি সেই ফলের শাখা তার দিকে ঝুঁকে এসে তার মুখের সামনে হাজির হবে। বেহেশতের বৃক্ষগুলোর মূল উপর দিকে এবং শাখা নিম্ন দিকে থাকবে এবং ফলের কোন রূপ খোসা বা বীজ থাকবে না অর্থাৎ উহার কোন অংশই ফেলে দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

আল্লাহ পাক ঈমানদার বান্দাগণ সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেছেন যে– তাদের সৎ কাজের পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতুল মা'ওয়া দান করবেন। তাতে উঁচু উঁচু বালাখানা এবং আরাম আয়েশের জন্য অফুরন্ত ব্যবস্থা থাকবে। এটাই হবে তাদের জন্য আল্লাহ পাকের মেহমানদারী।"

জান্নাতবাসীগণের শারীরিক সৌন্দর্য সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদের সৌন্দর্য নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।

আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, দুনিয়া এবং পরকালীন বস্তুসমূহের কেবল মাত্র নামেরই মিল রয়েছে। তাছাড়া এখানে শুধু সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে পরকালের অনেক বস্তু অবিকল বিদ্যমান না থাকলেও তার মতো সাদৃশ্যমূলক অন্যবস্তু এখানে বিদ্যমান আছে। ইমাম গাজ্জালী (রহ) জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনায় বিভিন্ন বস্তু এবং প্রাণীসমূহকে দুনিয়ার বস্তু ও প্রাণীর সাথে সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

অনন্ত অসীম জগতের মাঝে আমরা একটি বিন্দুর ন্যায়ও নয়। সে তুলনায় আমাদের জ্ঞান সুঁইয়ের আগার পানির পরিমাণও নয়। আমাদের অন্তর পরিবেশের সাথে এতোই মিলে চলে যে, আমরা একে ত্যাগ করে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারি না। তাই পরিবেশের বাইরের কোন বিষয়ের জ্ঞান ও স্বাদের কথা উপলব্ধিতে টিকতে চায় না। অথচ জান্নাতে যে কি সুখ আছে তা কল্পনাই করা যায় না। সমুদ্র সমান পানিও যদি কালি হয় তবু এর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লিখে শেষ করা

www.nagorikpathagar.org

যাবে না। এতো সুখ যেখানে আছে, তার সম্পর্কে আমাদের জানা হলে আমল করা সহজ হবে। আমরা যদি বিজ্ঞানের সাথে জান্নাতের ধর্মীয় বর্ণনা এবং ঈমান ও আমলের সম্পর্ক পাশাপাশি চিন্তা করতে পারি তবে বিষয়টি হৃদয়ে গেঁথে নেয়া আরও সহজ হতো। তাই সে সম্পর্কটি খোঁজাও মঙ্গলকর।

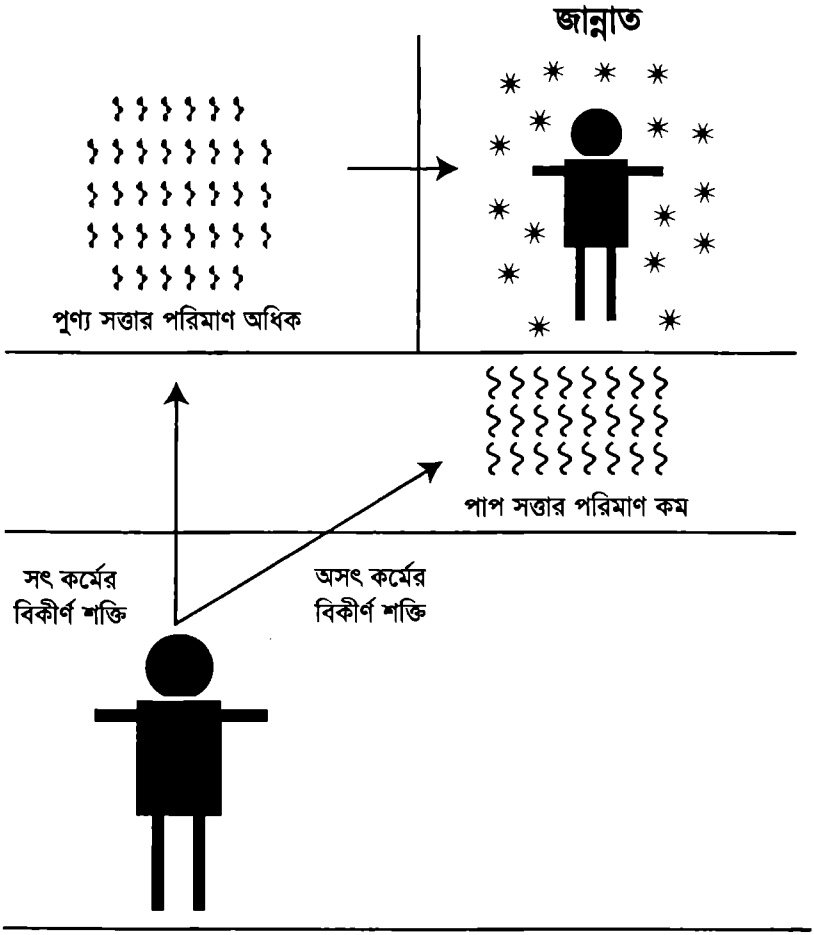

"তোমরা নিজেদের জন্য এ দুনিয়া থেকে যেসব নেকী পাঠাবে; আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তাই পারবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সবই দেখেন।" (সূরা বাকারা-১১০)

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে।" (আলে-ইমরান)।

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জান্নাতের অবস্থান ও সুখ-শান্তির সম্পর্ক

জান্নাতের বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক তলিয়ে দেখার আগে, জান্নাত আছে কি নেই, সে বিষয়টি যাচাই করে দেখার প্রয়োজন। যারা আস্তিক ও ধর্মের রীতিনীতিতে বিশ্বাসী এবং আমলকারী তাদের বিশ্বাস, এ বিশ্ব জগতের শুরু ও শেষ আছে। তারা মনে করেন, এ জগৎ সৃষ্টির পেছনে একজন মহাপরিকল্পকের মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। সৌর পরিবারের পৃথিবী নামক এ গ্রহ ছাড়াও সাত আসমান যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এ বিশ্ব জগতের মালিক ও শাসক। এই জগৎ দুই স্তরে বিভক্ত যেমন ইহকাল ও পরকাল। পরকালের কার্যক্রম শুরু হবে দুনিয়ার জীবন শেষ হলে। সে জগৎ চিরস্থায়ী। কিন্তু দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এর শুরু আছে, শেষ আছে। এখানে সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট একই পরিবেশে বিরাজ করলেও পরকালের বিধানে সে ব্যবস্থা নেই। ঈমানদার এসব বিষয় নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে। কিন্তু অন্য একদল আছে সন্দেহবাদী। তারা মনে করে পরকাল নামের জগৎ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। অথবা থাকলেই বা কি? মৃত্যুর পরে কি হবে এ নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে নাস্তিক ও জড়বাদীরা মনে করে, এই বিশ্বের বস্তুসমূহ ও সময় আদ্যান্তহীন। এদের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। এগুলো আপনা হতেই সব সময় বিরাজ করছিল এবং অনাদিকাল বিরাজ করবে। অর্থাৎ পরকাল বলতে কিছু নেই। মানুষ, উদ্ভিদ ও পশু শ্রেণীর মতোই। এখানেই তার উৎপত্তি। এখানেই তার শেষ। ধর্মের রীতিনীতি হলো মানুষের অন্ধ বিশ্বাস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্বলতার লক্ষণ। এর কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। যার প্রমাণ নেই, একে বিশ্বাস করাও মূর্খতা বৈ কি?

উপরের তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জন্য কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। তারা গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসী। এরা ধর্মের কথা সহজভাবেই মেনে চলে। গায়েবে বিশ্বাস করাই ধর্মের শর্ত। যারা এ শর্ত মেনে চলে, এদের নিয়ে কোন সমস্যা নেই। যত সব সমস্যা অন্য দুই শ্রেণীর লোক নিয়ে। এরা না দেখে কিছুই বিশ্বাস করতে রাজি নয়। এরা প্রয়োজনে মাতা পিতাকেও বিশ্বাস করতে রাজি নয়। তাই এরা পারিবারিক সম্পর্কের ধার ধারতে চায় না। এরা প্রকৃতির পোশাক পরে পঙ্গপালের মতো জীবন যাপন করতে ভালোবাসে। কিন্তু পরকাল বলতে যে একটা জগৎ আছে, সেটি আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে না পারলেও যুক্তি, দর্শন ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বিশ্লেষণ করে দেখানো এখন আর কঠিন কিছু নয়। জোড়া রহস্যের নিগূঢ় তাত্ত্বিক ধারণা, গতি জগতের

www.nagorikpathagar.org

দ্বৈত রূপ স্থিতি জগৎ কিংবা বস্তুর দ্বৈত রূপ প্রতিবস্তুর জগৎ অথবা Negative dimension-এর জগৎ হিসেবেও আজ পরকালকে চিন্তা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে শক্তির নিত্যতা সূত্রের বিনাশহীন ধারণা থেকে কর্মের প্রতিক্রিয়ার জগৎ হিসেবেও পরকালকে চিন্তা করা যায়। যেভাবেই আমরা ভাবি না কেন এর মাঝে পরকালের সন্ধান পাওয়া কঠিন নয়। অযৌক্তিক নয়।

এ পৃথিবী ও এ বিশ্ব ব্যবস্থা যে চিরন্তন নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় থামোডিনামিক্সের ২য় সূত্র থেকে। এই সূত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হলো, এ বিশ্ব একটি সুশৃঙ্খল অবস্থা থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে ক্রমশই ধাবিত হচ্ছে। এর নাম অনিশ্চয়তাবাদ। এ বিশ্বে যখন তাপ সমতা দেখা দিবে তখন তাতে কোন ভৌতিক পরিবর্তন হবে না। এ অবস্থায় বিশ্ব আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের মতে স্থান-কাল ও বস্তু পরস্পর নির্ভরশীল। কাজেই বিশ্বের আরম্ভ ও সময়ের শুরু একই সময় হয়েছিল। সুতরাং এ বিশ্বের শুরু এবং শেষ আছে। এসব যুক্তি প্রমাণ থেকে সে বিশ্বাসই জন্মে যে, এ বিশ্ব চিরন্তন নয়। এর ধ্বংস আছে। আবার সেটি নতুনভাবে রূপ নিবে। যখন নতুন সাজে আবার বিশ্ব কাঠামো সৃষ্টি হবে তখন বর্তমান প্রাকৃতিক আইনের পতন ঘটবে। শুরু হবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রাকৃতিক নীতিমালা। সেই বিশ্বের যেখানে পরম শান্তি থাকবে সেটির নাম জান্নাত। আমাদের সৌরজগতের পৃথিবী নামক গ্রহটি সূর্যের বিকীর্ণ শক্তি দিয়ে তার ঘর সংসার ও প্রকৃতিকে সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু সূর্য যদি এক মাসের জন্য তার আহার (শক্তি) দেয়া বন্ধ রাখে, তবে এই পৃথিবী কাঁদতে শুরু করবে। ক্রমশ পেটের ক্ষিধায় অবশ হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে সবকিছুতে ঘুম ঘুম ভাব দেখা দিবে। তারপর পৃথিবীর একদিন মৃত্যু অনিবার্য হয়ে আসবে।

পক্ষান্তরে পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী ও অন্যান্য উপাদানের বিকীর্ণ কর্মশক্তি দিয়ে গড়ে উঠছে পরপারের জগৎ। তন্মধ্যে এখানের ঈমানদার নেক আমলকারীর বিকীর্ণ শক্তি দিয়েই তৈরী হচ্ছে তার সুখের বাসর 'জান্নাত'। এখানে কেউ যদি ক্ষণিকের জন্য নেক আমল বন্ধ করে দেয়, তবে তার সুখের নীড় তৈরী সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। সেখানের রাজ মিস্ত্রিরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। অপেক্ষায় থাকে রসদের অভাবে। তারপর পুনরায় যখন আমল করা শুরু করে দেয় তখন রাজমিস্ত্রিগণ (ফেরেশতাগণ) আবার কাজে লেগে যায়। এভাবেই চলে দুনিয়ার নেক সত্তা দিয়ে পরপারের জগৎ তৈরীর কার্যক্রম। এ তত্ত্ব ধর্মেরই সারকথা। কিন্তু এ কার্যক্রম আমাদের পক্ষে দেখে আসা সম্ভব নয়। একে যান্ত্রিকভাবেও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখানো আমাদের নাগালের বাইরে। যে জিনিস দেখা যায়

www.nagorikpathagar.org

না এবং পরীক্ষা করে বের করা সম্ভব নয়, সেখানে দর্শন ও বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক যুক্তির মাধ্যমে হলেও সত্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। একটা চূড়ান্ত যুক্তিকে যখন আর কোন না কোনভাবে পরাস্ত করা সম্ভব হয় না, তখন তার ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবেই ধরে নেয়া যায়। বর্তমানে এরূপ এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরকালের বিশ্বাসকে জোরালোভাবে স্বীকার করে নেয়ার সন্ধান দিচ্ছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, এ বিশাল বিশ্ব জগতে শুধু বস্তু কণার নীহারিকাই বিরাজ করছে না, তার সাথে প্রতিবস্তুর কণার নীহারিকাও রয়েছে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক। এই অর্ধেক সংখ্যক নীহারিকা ঘন কালো ধোঁয়ার আড়ালে থাকায় দেখা যায় না। আমরা বলতে পারি না এর সাথে জান্নাতের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। তাছাড়া সে জগৎটি বস্তু জগতের দ্বৈত রূপের জগৎ থাকায় একে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এর মাঝে পরপারের জগতের একটা গন্ধ পাওয়া যায়। তাকে অস্বীকার করার মতো কোন যুক্তি দেখানো যাবে না।

হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায় জান্নাত জাহান্নামের উপরেই রয়েছে। অপরদিকে জাহান্নাম ঘোর নিশি দ্বীপের মতোই এবং জান্নাত উজ্জ্বল ও আলোকময়। আমাদের পৃথিবী হতে সুদূর বিশ্বে একেকটি জ্যোতিষ্কের আয়তনের পরিমাপের হিসাব শুনে মনে হয় না এগুলো শুধু নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। সারা বিশ্বের তুলনায় সরিষার দানার মতো এ পৃথিবী যেহেতু অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি সুতরাং শত শত আলোকবর্ষের পরিমাপের একেকটি জ্যোতিষ্ক এমনি সৃষ্টি করা হয়নি। হাদীসে আছে একজন নিম্ন দরজার বেহেশতি এই পৃথিবীর দশটির সমান একটি বেহেশত পাবে। আর উচ্চ দরজার বেহেশতির আবাসস্থল যে কত বড় হবে তা কল্পনাই করা যায় না। এখন প্রশ্ন হলো এ বিশাল নক্ষত্রের জগতের সাথে কি জান্নাতের সম্পর্ক আছে? আমরা তার স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ কোন যুক্তি না দিতে পারলেও উপরের ধারণা থেকে একটা চূড়ান্ত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছতে পারি। তবে এগুলো যে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন যুক্তি কেউ দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না।

পক্ষান্তরে মানব চরিত্রের আচার-আচরণের সাথে যে সুকৃতি ও দুষ্কৃতি জড়িত এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ দুনিয়ার জীবনে এর শত সহস্র প্রমাণ দেয়া সম্ভব। আমরা যদি এ কথা বিশ্বাস করি যে, আমাদের আচার-আচরণের সাথে কষ্ট ও শান্তি জড়িত আছে, তবে পরকালের বিশ্ব ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ গতির সাথে বিপর্যয় ও সাফল্য যে জড়িত তার প্রমাণ সাধারণ মানুষের চোখেই ধরা পড়ে। এর জন্য নিক্তির কোন প্রয়োজন পড়ে না।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের জীবন নদীতে ঢেউ বা গতির খেলা চলে। এই গতি বা ঢেউয়ের প্রকাশ হয় আচার-আচরণের মাধ্যমে। মানুষের আচার-আচরণ দু'ধরনের। সাধারণ আচরণগুলো অন্যান্য প্রাণীর আচার-আচরণের ন্যায়। যেমন আমরা আহার করি অন্যান্য প্রাণীরাও আহার করে। আমাদের পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়, তারাও করে। আমাদের যৌন ক্ষুধা আছে। অন্যান্য প্রাণীরাও এ ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের জটিল আচরণ হলো বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি। মানুষ বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি দিয়ে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের মাঝে এই উপলব্ধি জ্ঞান নেই। মানব প্রকৃতিতে চিন্তা শক্তির উন্মেষ মহামনের (আল্লাহর) পরিকল্পনার ফসল। এ শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টির রহস্য তথা বিশ্বাসের বা ঈমানের পথ ধরে মানুষ চরিত্র গঠনের দিক নির্দেশনা পায়। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। পরিশেষে আমাদের বিশ্বাস থেকেই কর্মের পথ নির্ধারিত হয়। এ থেকে সৃষ্টি হয় কর্মফলের সত্তা। এটি চিরন্তন সত্য ও যুক্তির কথা। কোন গতিযানের চালক, গতির সীমালঙ্ঘন করলে যেমন তার মাঝে বিপর্যয় দেখা দেয়, তেমনি মানব আচার-আচরণ একটি সঠিক বিশ্বাসের উপর স্থির না রাখলে, সেটিও সীমালঙ্ঘন করে। তাই সীমালঙ্ঘনশীল গতির জন্য মানব জীবনের একূল ওকূল বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়ে পড়ে।

একজন পুরুষ লোক যখন প্রাণী হিসেবে অন্যান্য প্রাণীর মতো যৌন জৈবিক সাধারণ আচরণের সন্ধিক্ষণে তার সহধর্মীণির সাথে প্রেম নিবেদন করে, তখন মিলনের চূড়ান্ত সময়ে তাদের থেকে উত্তরাধিকারী প্রজন্মের উদ্ভব হয়। সাধারণত ঐ প্রজন্মের মাঝে তাদের আচরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। পিতা মাতার স্বভাব, চরিত্র, বর্ণ ও মন মানসিকতা সবই ঐ সন্তান সন্ততির মাঝে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণেই সাধারণত ধর্মীয় মূল্যবোধহীন বিকৃত আচরণের পিতা মাতার সন্তান সন্ততি তাদের অনুরূপ স্বভাব চরিত্রই পেয়ে থাকে। এসব গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য যে জিনিসের মধ্যে লুকানো থাকে তার নাম ক্রোমোজম।

আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী কোষের মাঝে ঐ ক্রোমোজমকে সনাক্ত করতে পারলেও ক্রোমোজমের যে অংশে ঐ পৃথক পৃথক গুণগুলো লুকিয়ে থাকে তা দেখতে পারি না, কিংবা এর মধ্যে চরিত্র অথবা গুণের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। মূলত গুণ হলো স্বীকৃতির জিনিস। এটি বিশ্বাস ও উপলব্ধির ব্যাপার। অথচ 'গুণ' গতি বা আচরণের প্রকৃতি থেকেই সৃষ্টি হয়। যেমন উনুনে হাড়ির মধ্যে পানি বসিয়ে তাপ দিলে পানি গরম হবে। তাপে পানি ও হাড়ির সূক্ষ্ম পরমাণুর গতি বৃদ্ধির ফলেই তার স্বাভাবিক আচরণ পরিবর্তন হয়ে গরম অনুভব হয়। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

এই গরম বোধ হওয়ার অনুভূতিটি স্বীকৃতির ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে 'গরম' নামের বৈশিষ্ট্যটি কেউ দেখতে পারে না। আচরণ দেখে বুঝা যায় সেটা কোন প্রকৃতির গুণ নিয়েছে। আমাদের আচরণের উপরও তাই কর্মের গুণ নির্ভর করবে।

পৃথিবীতে আমাদের সাধারণ আচরণের উত্তরাধিকারী প্রজন্মের চরিত্র ভালো না হলে পিতা মাতাসহ সমাজ জীবনের অন্যান্যরাও কষ্ট পায়, ব্যথা পায়। অন্যদিকে উত্তম চরিত্রের হলে সুকৃতি বাড়ে, পিতা মাতা ও সমাজ উপকৃত হয়। এরা পিতা মাতার সাধারণ আচরণ থেকে মাতৃবাস হয়ে পৃথিবীতে আসবে। তাদের চরিত্রের প্রভাব এদের গায়েও লাগে। সন্তানের চরিত্রের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রভাব পিতা মাতাকে আনন্দ সুখ অথবা যন্ত্রণা দিতে পারে।

আমাদের জটিল আচরণ হলো বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি। এই বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগানোর বেলায় ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করে চলতে হয়। বিবেক নামের এক প্রহরী আমাদের সেই কাজটুকুই করে দেয়। যাদের মাঝে এর সবগুলো বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ঠিক থাকে তারা এ বিশ্বের প্রভু বা মালিকের আনুগত্য স্বীকার করে। তাঁর আদেশ নির্দেশ মেনে চলে। স্রষ্টার প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর করুণা প্রকাশ করে। তখন এই জটিল আচরণের সত্তা পয়দা হয়। এর মাতৃবাস হলো মন ও দেহ কোষের পরমাণুর সূক্ষ্ম কুঠুরী। এগুলো সেখান থেকে প্রবাহিত হয় ঢেউ বা তরঙ্গের আকারে। একটি সূক্ষ্ম তরঙ্গের মাঝেও তার চরিত্রের গুণগুলো বা কর্মের ছাপ লেগে থাকে। এই সম্পদ পরপারের নিয়ামত তৈরীর কাজে লাগবে। কিন্তু যারা চিন্তা ও বিবেককে একযোগে কাজে লাগাতে পারে না তাদের বিশ্বাস স্থির থাকে না। এতে চরিত্র বলতে কোনো বৈশিষ্ট্য তার মাঝে পাওয়া যায় না। তখন এরা দুনিয়ার মোহবিষ্ট হয়ে পড়ে। দুনিয়ার মোহ বিধৃত জীবন পদ্ধতির উপর শয়তানের আচরণ ভর করে। ফলে তারা তারই শিষ্য হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় তাদের কর্ম থেকে নিকৃষ্ট মানের সত্তা পয়দা হয়। এগুলো রোগ জীবাণুর মতো আমাদের দেহ ও আত্মার বৈরী সত্তা।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের আলোকে বলা যায় আমাদের সাধারণ আচরণের সন্তান সন্ততির মাঝে যেমন ভালো মন্দ গুণ বিরাজ করে তেমনি জটিল আচরণের অদৃশ্য সন্তানের মাঝেও দু'ধরনের গুণই বিরাজ করে। তবে এদের চরিত্র একটু ভিন্ন। এরা জন্মের সময় পৃথক হয়ে যায়। তাই একই জিনিসের মাঝে দুই গুণ থাকে না। এই সত্তাগুলো নিজেদের চরিত্র অনুযায়ী তার পিতাকে আনন্দ-ভালোবাসা, সুখ-শান্তি দিবে অথবা খারাপ চরিত্রের হলে জ্বালাতন করবে, কষ্ট দিবে। এ পর্যন্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলো

www.nagorikpathagar.org

বিকীর্ণ শক্তি। বিকীর্ণ শক্তির স্বভাব ভালো-মন্দ যে হতে পারে তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমাদের এ জগৎ গতির জগৎ। যেখানে আবর্তন নেই, সন্তরণ নেই, সেই স্থিতি জগতে এ সত্তার গুণাগুণ প্রকাশ পাবে। কারণ দুনিয়ার বর্তমান প্রাকৃতিক আইন চালু অবস্থায় সেগুলো গুপ্তই থাকবে, তাই এ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দুনিয়াতে যতটুকু জানা ও দেখা সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে যারা ধর্মীয় অনুশাসনহীন অন্যায় ও অসৎ পথে চলে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় লিপ্ত থাকে, তাদের এ আচরণ থেকে পৃথিবীতেই যেসব বৈরী সত্তা পয়দা হয়, এগুলো এ জীবনেই কষ্ট দেয়, বেদনা দেয়।

এদের মধ্যে এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদি জীবাণু প্রধান। কিন্তু উত্তম ও আদর্শ চরিত্রের লোকের মধ্যে এই রোগ হওয়ার প্রশ্নই দেখা দেয় না। এ থেকেই অনুমান করা যায়, উত্তম আমলের সত্তা মঙ্গলদায়ক ও শান্তিদায়ক হবে।

ঈমানী শক্তি আদর্শ মানব গড়ার মূল ভিত্তি। যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর আদেশ নির্দেশ মেনে চলবে তারাই আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে উঠবে। সেজন্যই ঈমানী শক্তি মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। যারা ঈমান ও উত্তম আমলের ধার ধারে না তাদের সু-কর্মের বিকীর্ণ সত্তা নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

"তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনে নষ্ট করে ফেলেছ এবং পৃথিবীতেই তা ভোগ করেছ।" (সূরা-৪৬ : রুকূ-২)

"কিয়ামতের দিন মানুষ সৎ কর্মের ফল প্রস্তুত দেখতে পাবে।" (আল-কোরআন)

"তাদের জন্য আমার নিকট হতে নেকী নির্ধারিত ছিল, তারা জাহান্নামের আযাব হতে দূর থাকবে।" (আল-কুরআন)

"যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের আমল নিষ্ফল; তারা যা করে তদানুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা-৪৬ : ১৪৭)

রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন– "প্রত্যেক মানুষ, কবরের আযাবের উপাদান এই পৃথিবী থেকেই সঙ্গে নিয়ে যাবে। যেমন– তা আর কিছুই নয়, তোমাদের কৃত কার্যসমূহেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।" (আল-হাদীস)

www.nagorikpathagar.org

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট জগতের মধ্যে মহাকাশের কোন ঠিকানায় আমাদের দুনিয়ার কর্মের বিকীর্ণ সত্তাগুলো জমা হয়ে নতুন সাজে ঘর বাঁধছে তা আমরা জানি না। এই মহাকাশের বিস্তৃতি এতো অসীম যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। মহাকাশের এমনও তারা আছে যার আলো পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীতে এসে পৌঁছেনি। অথচ আলোর গতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। মহাবিশ্বের বিশালত্বের মাঝে পৃথিবী একটি সরিষার দানার মতোও নয়। কিন্তু এ বিশাল সৃষ্টি কার জন্য? এ সৃষ্টি কি অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে? তার পেছনে কী কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই? আমরা গতির জগতে, গতির ধাঁধাঁয় পড়ে না পাচ্ছি এই জগতের কূল-কিনারা, না দেখতে পাচ্ছি স্থির কোন জিনিস। তাই উপরের প্রশ্নের কোন সূত্র দেয়া সম্ভব হয় না। তবে এটুকু বলতে পারি, যখন এ গতির জগতের গতি স্থির হয়ে যাবে তখন এ বিশ্ব অবশ্যই নতুন কিছু উপহার দেবে।

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার একটি নমুনা তুলে ধরেছিলেন। সেটি এ বইয়ের গতি ও স্থিতি জগৎ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক দিন পর্যন্ত এ ধরনের তাত্ত্বিক কথার কোন আগা-গোড়াই অনুভব করতে পারতাম না। কিন্তু বার বার যখন হৃদয় নয়নের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তার মাঝে চোখ বুলাচ্ছিলাম তখন গতি আর স্থিতির দৃশ্য মনের আরশিতে ভেসে উঠল। এরপর দেখি এ মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে রয়েছে তরঙ্গ আর তরঙ্গ। এ তরঙ্গের ঝাঁক বা পুটলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই কঠিন পদার্থ। এসব কঠিন জিনিস এখনও খায় তরঙ্গ আবার ত্যাগ বা বিকীর্ণও করে তরঙ্গ। মানুষের আচরণ যদি সীমালঙ্ঘন করে তাহলে তার বিকীর্ণ তরঙ্গ অবক্ষয় হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আচরণ যদি সরল গতির হয় তবে তার বিকীর্ণ তরঙ্গ উৎকর্ষতা লাভ করবে। এই উৎকর্ষ তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ উড়ে গিয়ে ধরা পড়বে স্রষ্টার মহাসৃষ্টির ওপার জগতের গ্রাহক যন্ত্রে। এ থেকেই সৃষ্টি হবে, তার সুখময় জগৎ। প্রকৃতির অসীম রহস্যের লীলাভূমিতে মানুষগুলো জীবন্ত মেশিন। এই মেশিন টিভির প্রেরক যন্ত্রের মতো তরঙ্গ পাচার করে। ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানবাত্মা দেহের কর্মশক্তিকে বিদর্শন বা স্ক্যানিং করে দেয়। এই স্ক্যানিং বিন্দু বা তরঙ্গ এক রকম নয়, আলোক তরঙ্গতে যেমন খাটো তরঙ্গ (Short wave), মাঝারি তরঙ্গ (Medium wave) এবং লম্বা তরঙ্গ (Long wave) থাকে তেমনি এরও রয়েছে অনেক রূপ, অনেক প্রকৃতি। কোন প্রকৃতির তরঙ্গ স্রষ্টার গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়বে, সেটি আল্লাহই ভালো জানেন। তাই তিনি জারী করেছেন, জীবন নীতির বিধান। সেজন্য ঈমান ও

www.nagorikpathagar.org

আমলের মাঝে আছে এক মহারহস্যময় শর্ত। এ দুই শর্ত এক না হলে আমলের বিকীর্ণ কর্মশক্তি গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়বে না। এতে তার সুখময় সংসার তৈরী না হয়ে সেগুলো অবক্ষয় হয়ে যাবে। এর দ্বারা তৈরী হবে নিকৃষ্ট এক নিশি জগৎ। তাই ঈমান ও আমলের মহারহস্যময় শর্তের সাথে জান্নাতের সম্পর্ক বিরাজমান। সেই রহস্য না ধরতে পারলে আমলের গুরুত্ব কমে যায়। বার বার অনীহা ও বার্ধক্য দেখা দেয় নেক কাজে। অতএব ঈমান ও আমলের রহস্যময় শর্ত কি সেটি আমাদের জানা দরকার।

ঈমান ও আমলের রহস্যময় শর্ত

দ্বীন ইসলামের মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে মনে ও মুখে স্বীকার করার নাম ঈমান। ঈমান চরিত্রের মানসিক ভিত্তি, দ্বীনের কথা গভীর প্রত্যয় ও সত্যতার সাথে এমনিভাবে আকড়ে ধরা যেন শত প্রতিকুল অবস্থায়ও এর মাঝে কোন সন্দেহ বা দুর্বলতা প্রকাশ না হয়, তবেই ঈমানের শর্ত মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। ঈমানের শর্ত পূরণ না হলে মানবিক ক্রিয়াকাণ্ড ও কাজকর্ম বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। আমরা অনেক সময় বলি, লোকটি চরিত্রহীন। এতে এ কথাই বুঝানো হয় যে, লোকটির কোন ধর্মীয় মূল্যবোধ নেই।

মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো চরিত্রের মাপকাঠি। মানুষের মনের চিন্তাধারার উপর জীবনের সকল কাজকর্ম ও চলন-বলন নির্ভরশীল। ঈমানের শর্ত পূরণ হলে তার কর্মকাণ্ড সুবিন্যস্ত ও সুসংহতভাবে সম্পাদিত হয়। মানব জীবনের সকল কাজ কর্মকে বলা হয় আমল। এই আমল কবুল হওয়া না হওয়ার মধ্যে প্রকৃতির নিয়মের ক্ষেত্রে নিগূঢ় রহস্য বিরাজমান। আমরা খাদ্য থেকে দৈহিক শক্তি পাই। এ শক্তি আমরা কর্মের (আমলের) মাধ্যমেই বিকীর্ণ বা ব্যয় করি। সে বিকীর্ণ কর্মশক্তি তরঙ্গ বা ঢেউ-এর ন্যায় প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির শিরা উপশিরাতে গুপ্ত বা অদৃশ্য সৈনিক আছে, আছে অদৃশ্য বা গুপ্ত স্নায়ু পথ। এ পথে নিয়ন্ত্রণ হয় তার সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড। এ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে না বলে তার খবর আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হয়। আমাদের ঈমান ও আমলের কর্মকাণ্ড যদি একই শর্তে না থাকে তবে সেই বিকীর্ণ ঢেউ প্রকৃতির স্নায়ু ব্যবস্থার অসমান্তরালে চলতে থাকে, ফলে সেগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। কিন্তু ঈমান ও আমলের শর্ত এক হলে সে সত্তার (বিকীর্ণ কর্মশক্তি) মধ্যে এমনি এক অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য জমা হয় যার জন্য সে সত্তা প্রকৃতির গুপ্ত স্নায়ু ব্যবস্থার সাথে সমান্তরালে চলতে পারে। এতে থাকে ইলেকট্রো-মেগনেটিক-ওয়েভের

www.nagorikpathagar.org

ন্যায় গতিসম্পন্ন 'পাখা'। এ 'পাখা' এতো দ্রুত কাঁপুনি দেয় যার জন্যে তার মাঝে আলোর চেয়েও বেশি গতি থাকে। এই গতিতে সেগুলো নিজ জগৎ থেকে উর্ধ্ব জগতে চলে যায়।

সমান্তরালে চলার ব্যাপারটি অনেক ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সিস্টেমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। টিভির প্রেরক যন্ত্র যেমন কোন চিত্রকে স্ক্যানিং বা বিদর্শনের মাধ্যমে বিন্দুতে রূপান্তরিত করে শূন্যে ছেড়ে দেয়। তারপর সেগুলো গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। সেদিক থেকে মানুষের দেহ-রাজ্যটি হলো একটি জীবন্ত স্ক্যানিং মেশিন। আত্মাই এর চালক। এই যন্ত্র দিয়ে টেলিভিশনের প্রেরক যন্ত্রের স্ক্যানিং সিস্টেমের মতো তরঙ্গের দানা বের হয়ে উড়ে যায় শূন্যে। চালকের চরিত্র হলো এই মেশিনটিকে সুবিন্যস্ত ও সুসংহতভাবে চালানোর কৌশল। মূলত চরিত্রের মূলনীতি গড়ে উঠে ঈমানের মাধ্যমে। যদি (ঈমান ও আমলের) উভয় শর্ত একযোগে চলে তাহলে প্রকৃতির গুপ্ত ব্যবস্থার পথ ধরে ব্যক্তির কর্মের বিকীর্ণ সত্তা সমান্তরালে চলতে পারে। অথচ এই শর্তগুলোর কোন একটিতে গোলমাল থাকলে পুরো সিস্টেমটির কার্যক্রমে গোলমাল থেকে যায়। যেমন ঈমান না থাকলে আমল ভালো হলেও এর দ্বারা কোন কাজে আসবে না। এ ছাড়া ঈমান বা বিশ্বাস কিছুটা দৃঢ় হলেও আমল খারাপ থাকলে তার কোন মূল্য হবে না।

আল্লাহ বলেন– "যে কেউ ঈমান আনতে অস্বীকার করে তার যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা-৫ : ৫)

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কিসের বাধায় মানুষের কর্মের বিকীর্ণ সত্তা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। আমরা জানি আমাদের দেহ কোষের সূক্ষ্ম কণাতে জ্যোতি বা আলোক আছে। সাধারণত জ্যোতি বা আলোর ধর্ম সরল পথে চলা। কিন্তু সরল পথে চলার কথা থাকলেও অনেকের আচরণ বা গতি সহজ সরল হয় না। এর মূল কারণগুলো হলো : লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনা। মানুষের সরল জীবন যাপনে এগুলো যখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তখন সে বাঁকা পথে চলে।

আল্লাহ বলেন– "হে মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু হালাল ও পবিত্র রয়েছে তা থেকে খাও এবং কোনো ব্যাপারে শয়তানের আনুগত্য করো না; কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। সে তো তোমাদেরকে পাপাচার, নির্লজ্জতা এবং খোদার সম্পর্কে যা তোমরা জানো না এমন কথা বলার নির্দেশ দেয়।" (আল-কুরআন)

www.nagorikpathagar.org

"আসল ব্যাপার এই যে, যারা আমাদের সাথে (আখেরাতে) মিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমাদের নির্দেশগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে; তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐসব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তারা (তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্ম পদ্ধতির দ্বারা) করেছে।" (সূরা-১০ : ৭-৮)

পৃথিবীর জড়বস্তুর কণাগুলো চক্র বক্র এবং এপাশ ওপাশ গতিতে চলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এসবের মধ্যে থাকে অতৃপ্ত। এ ক্ষেত্রে অনেক পেয়েও সুখ পাখিকে ধরা যায় না। কিন্তু যার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ নেই সে না পেয়েও সুখী থাকে। তাই সে বিশৃঙ্খল জীবনের ধার ধারে না। প্রকৃতপক্ষে যারা জগতের মোহে পড়ে যায় তাদের আচরণ সহজ সরল হয় না। তখন শয়তানের কু-দৃষ্টি তাকে আছর করে। এর ফলে নৈতিক মূল্যবোধ লোপ পেয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রবৃত্তিও লাগাম ছাড়া হয়ে পড়ে। তখন জীবন ব্যবস্থার কোন নীতি থাকে না। যখন যা মন চায় তখন তাই করে। সেজন্য মানুষের জীবন্ত স্ক্যানিং মেশিনের আচরণে দেখা দেয় বৈরী ভাব। এর ফলে এই যন্ত্র দিয়ে যে শক্তি বের হয় তার নৈতিক মান নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এগুলো প্রকৃতির সিস্টেমের সাথে সমান্তরালে চলতে পারে না। কারণ পরম সত্তার (আল্লাহর) সাথে প্রেম বা আকর্ষণ না থাকায় মানুষের বিকীর্ণ শক্তি 'তড়িৎ পাখা' হারিয়ে ফেলে। এতে এই কণাগুলো খোদার নির্ধারিত সূক্ষ্ম গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এ ধরনের নিকৃষ্ট কণাগুলো মহাবিশ্বের পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে এমন এক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিতে থাকে, যা দিয়েই সৃষ্টি হয় তাদের জন্য মহা কষ্টের স্থান। এরি নাম জাহান্নাম।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, টিভির গ্রাহক যন্ত্র ও প্রেরক যন্ত্রের মাঝে যোগসূত্র না থাকলে প্রেরক যন্ত্রের স্ক্যানিং বিন্দুগুলো ধ্বংস হয়ে যায় না। এগুলো গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়বে না। সে জন্য গ্রাহক যন্ত্র ও প্রেরক যন্ত্রের মাঝে সমতা ও যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। এ বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক এবং নীতিগত বন্ধন থাকা প্রয়োজন। আমরা যদি টিভির গ্রাহক যন্ত্র ও প্রেরক যন্ত্রের ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য করি তবে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

টিভির প্রেরক যন্ত্র একটি চলন্ত চিত্রকে অসংখ্য বিন্দুতে বিভক্ত করে। একে বলা হয় স্ক্যানিং বা বিদর্শন। ইলেকট্রন রশ্মিকে দৃশ্যের প্রতিচ্ছবির উপরে বাম দিক থেকে বিন্দুগুলোর উপর দিকে লাইন বরাবর নিয়ে যাওয়া হয়। এই রশ্মিটি দৃশ্যের আলো ছায়ার তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক অনুজ্জ্বল বিন্দুগুলোকে কম জোরালো বিদ্যুতের ঝলকে পরিবর্তিত করে। তারপর আবার ঠিক পরের লাইনটি

www.nagorikpathagar.org

এভাবেই বিন্দুতে পরিণত করে পাঠানো হয়। এরূপ একটির পর একটি বিন্দুর সাহায্যে সমগ্র দৃশ্যটি অসংখ্য সূক্ষ্ম ঝলকে বিভক্ত হয়ে তরঙ্গাকারে প্রচারিত হয়। এদিকে টিভির গ্রাহক যন্ত্র বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ ঝলককে বিভিন্ন আকারের আলোক বিন্দুতে পরিণত করে। একাজ এতো দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, চলমান দৃশ্য প্রদর্শনের সময় টিভির পর্দায় এ বিন্দুগুলো মিশে একাকার হয়ে যায়। এমনি অসংখ্য বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত ছবিই আমরা টিভির পর্দায় দেখে থাকি। মূলত এখানে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের যান্ত্রিক কৌশলেই প্রতিচ্ছবি আলোক বিন্দুতে পরিণত হওয়ায় উজ্জ্বল ও দৃশ্যমান চিত্র দেখা যায়। কিন্তু এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি কোন যোগসূত্র না থাকে তাহলে প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে না। আবার একটি ভালো থাকলেও অন্যটি খারাপ হলে কোন লাভ হবে না।

এ থেকে বুঝা যায় প্রেরক যন্ত্রের ত্রুটির জন্য গ্রাহক যন্ত্রের ব্যবস্থা যতই ভালো হোক না কেন তার পাঠানো আলোক রশ্মি গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়বে না। আমরা সাধারণ লোক কোন প্রেরক যন্ত্রের সামনে গিয়ে কথা বলি না বলে তা বেতার যন্ত্রে ধরা পড়ে না। তাই রেডিও ওয়েভ সৃষ্টির জন্য যান্ত্রিক কৌশলের মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে গিয়ে কথা বললে ঐগুলো বেতার যন্ত্রে ধরা পড়বেই। কিন্তু রেডিও ওয়েভহীন যেসব শব্দ আমরা করি, এগুলো কি ধ্বংস হয়ে যায়? নিশ্চয়ই নয়। কারণ শক্তির ধ্বংস বা ক্ষয় বলতে বিজ্ঞানে কোন কথা নেই। কার্যত শক্তির শুধু গুণগত মানের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

মানুষের জীবনী শক্তির বিকীর্ণ সত্তার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। এরও কোন ধ্বংস বা ক্ষয় নেই। ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে যে সত্তা বিকীর্ণ হয়, সেগুলোতে প্রকৃতির গুপ্ত বিধানের সাথে চলাচলের মতো সঙ্গতিপূর্ণ গুণ থাকে। প্রকৃতির কাজ একূল ভাঙ্গা ওকূল গড়া। সৃষ্টির বিধানে দুনিয়ার বাইরে আমাদের বিকীর্ণ সত্তা দিয়ে যে কূল গড়ছে সেটিই পরজগৎ। উল্লেখ্য প্রকৃতির বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সত্তাকে বলা যায় নেক বা পুণ্য। অপরদিকে অসঙ্গতিপূর্ণ সত্তার নাম পাপ বা গোনাহ্।

আল্লাহ বলেন– "যারা খোদার দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, তাদের সৎ কাজগুলো হবে ভস্মস্তূপের ন্যায়। ঝড় ঝঞ্ঝার দিনে প্রচণ্ড বায়ুবেগে সে ভস্মস্তূপ যেমন শূন্যে উড়ে যাবে, ঠিক তেমনি তাদের সৎ কাজগুলোর কোন অংশেরই বিনিময় তারা লাভ করবে না। কারণ আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল।" (সূরা-১৪ : ১৮)

www.nagorikpathagar.org

"তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন (ইসলাম) থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের সকল সৎ কাজগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" (সূরা-২ : ২৭১)

আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক খুব নিবিড়। ঈমান হলো একত্ববাদের মজবুত প্রেম। এই প্রেম থেকে সৃষ্টি হয় আকর্ষণ। অতঃপর এই আকর্ষণ থেকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের যোগসূত্র পয়দা হয়। ফলে মানবাত্মার মাঝে স্রষ্টার গুণের কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটে। এতে প্রাণ হয়ে উঠে সজীব ও সতেজ। তখন দৈনন্দিন কর্ম বা আমল দ্বীনের নীতি বিরুদ্ধ হয় না। মূলত নেক আমলগুলো হলো স্থিতি কণা বা নেক রশ্মি উৎপাদনের প্রক্রিয়া। ইলেক্ট্রোন রশ্মি যেমন প্রতিচ্ছবিকে বিদ্যুতের ঝলকে পরিণত করে তেমনি ঈমানী শক্তির ঢেউ কর্মের বিকীর্ণ শক্তিকে জ্যোতিপূর্ণ ঝলকে পরিণত করে সেগুলো আল্লাহর ব্যবস্থাপনার গ্রাহক যন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকে। এসব নেক রশ্মি দিয়েই পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর বান্দার সুখের সংসার তৈরী করবেন। এমন জ্যোতিপূর্ণ জগতে রাত থাকবে না, সূর্য থাকবে না, রোগ যন্ত্রণা, মৃত্যু ক্ষুধা বলতে কিছুই থাকবে না। সময় সেখানে হবে স্থির। গতির ঘটবে মৃত্যু। জড় আকার বা জড় পদার্থের কোন বাতাস সেখানে থাকবে না।

বিজ্ঞানময় কুরআনের যুক্তি ছাড়া কোন কথাই স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। 'নেক' সত্তা আল্লাহর নিকট জমা থাকে। আবার নেক আমল যথাযথ মানের না হলে সেগুলো আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। এরূপ আমল শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ঝুলতে থাকে। আমাদের হাত, পা, নাক, কান, মুখ, জিহ্বা ইত্যাদির মাধ্যমে নেক ও গোনাহ হয়। তাহলে এই নেক বা গোনাহ কি? আমি দীর্ঘ আলোচনায় নেক বা গোনাহকে কর্ম জীবনের বিকীর্ণ শক্তির সাথে তুলনা করেছি। আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় বিকীর্ণ শক্তির মতো গুণশীল কণাকে বলেছি নেক বা সওয়াব। পক্ষান্তরে অস্বচ্ছ ও অনুজ্জ্বল কৃষ্ণকায় বিকীর্ণ শক্তিকে বলেছি গোনাহ বা পাপ।

দুনিয়াতে মানুষ যখন কর্মে লিপ্ত থাকে তখন তার কর্মের প্রতিচ্ছবির দানাগুলো আলোকরশ্মি গায়ে মেখে মহাশূন্যের দিকে নিয়ে যায়। আলোকরশ্মির প্রতিবিম্বগুলো কর্মের বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি। একবার যে আলো ছবি তুলে নিয়ে যায়, সে আর কোন দিন ফিরে আসে না। তার দৌড় যে কোথায় গিয়ে থামে তাও আমরা বলতে পারি না।

এগুলো হয়তো প্রকৃতির গায়ে টেপ হতে থাকবে। যার নাম হয়তো আমলনামা। আজ আমরা ঈমান ও আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছি না বলে কোন কাজেই গুরুত্ব দিয়ে করতে পারছি না। কিন্তু যেদিন পুণ্য উপার্জনের দরজায়

www.nagorikpathagar.org

তালা লেগে যাবে সেদিন হয়তো আফসোস করব। তখন অনুশোচনার মানসিক পীড়ায় কাতর হয়ে দোযখের অগ্নির উত্তাপ ভোগ করতে হবে। সেদিন তো মৃত্যু হবে না, সময় যাবে না, তখন উপায় কি হবে! পরকালে কেন সময় যাবে না সে আর এক রহস্যের কথা। তাই সময় স্থির হওয়ার আগেই পৃথিবীতে পুণ্য সত্তার সন্ধানে বের হওয়া প্রয়োজন।

পরকালের সময় স্থির কেন?

পরকালের সময় যাবে কি যাবে না, চন্দ্র সূর্য উঠবে কি উঠবে না, মনে এরূপ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। সময় খুব জটিল জিনিস। এর না আছে কোন আকার আকৃতি, না আছে কোন স্ট্যান্ডার্ড মাপ। সর্বত্রই এর লোকাল স্বভাব। আছে তার ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিমাপ। বর্তমান বিশ্বে যেখানে আবর্তন আছে, সেখানে ঘড়ির কাটার মতো সময় বার বার ঘুরে ফিরে আসে। মনের ঘড়িতেও এক ধরনের আবর্তন হয়। এই আবর্তনের কারণ কোন প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনা। অথচ মনের ঘড়িতে কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া না হলে সেখানে সময় যায় না, আবর্তনও হয় না। তাই সময়ের হিসাব দু'দিক থেকে কার্যকরী। যখন এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্যসহ আকাশের যাবতীয় তারকাগুলোর গতির ঝরনা বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন ঐগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে খসে পড়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিবে। এতে করে বিশ্ব আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে হাশরের বিশাল মাঠে পরিণত হবে। তারপরে নতুন যে বিশ্ব ব্যবস্থা গঠিত হবে সেখানে থাকবে না চন্দ্র, সূর্য কিংবা থাকবে না সূর্যের মতো কোন আবর্তনশীল নক্ষত্র। কার্যত ঐদিন আবর্তনশীল গতির মৃত্যু ঘটবে। রাতের জায়গায় শুধু রাত আর রাত বিরাজ করবে। দিনের জায়গায় শুধু দিন। যেখানে রাত থাকবে, সেখানের আকাশ থাকবে কৃষ্ণবর্ণ ধোঁয়ায় ঢাকা। কোনদিন সেখানে সূর্য উঠবে না। অপরদিকে যেখানে শুধু দিন থাকবে, সেখানের আকাশ খোদার 'আরশের জ্যোতিতে থাকবে সর্বক্ষণই আলোকিত। গতির সম্পর্কের কোন উপাদান সেখানে থাকবে না। অর্থাৎ সেখানে পদার্থ বলতে কিছুই রবে না। মৃত্যু থাকবে না। ফলে গতির দ্বৈত প্রকৃতি স্থিরতাই সেখানে বিরাজ করবে। তখন বস্তুর দ্বৈত রূপের নতুন বিশ্ব কাঠামোতে আমরা লাভ করব চিরস্থায়ী জীবন।

আবর্তনহীন, গতিহীন, স্থিরতার মাঝে যেহেতু জীবন চাকা ঘুরবে, সেজন্যই সেখানে আবর্তনশীল সময়ের কোন হিসাব থাকবে না। ফলে সময় সেখানে হবে স্থির। সেদিন কারও পক্ষে আর চান্দ্র মাস কিংবা সূর্য কেন্দ্রিক বছরের হিসাব নিতে হবে না। কিন্তু সেখানে আবর্তনের সময় স্থির হলেও অনেকের মনের ঘড়িতে সময় উঠানামা করবে। কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া না হলে এই সময়েরও

www.nagorikpathagar.org

কোন হদিস থাকবে না। সেদিন যাদের মনের অনুভূতিতে কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ছোঁয়া পড়বে, সেই শুধু সময়ের ওজন করতে পারবে। কিন্তু সেই রাজ্যে যেহেতু কারও মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই, সেজন্য এদের কাছেও সময় যেতে চাইবে না। তাই পরকালে 'সময়' সব দিক থেকে স্থির মনে হবে।

এ পৃথিবীতে রাত যায়, দিন আসে। সাময়িকের জন্য হলেও মৃত্যু সকল প্রকার কষ্টকে (পৃথিবীর রোগ বালাই) দিয়ে দেয় পরিত্রাণ। তাই কেউ যদি রোগ যন্ত্রণায় ভোগতে ভোগতে অতিষ্ঠ হয়ে যায় তখন সে নিজেই মৃত্যুর প্রার্থনা করে। আমরাও বলি এই কষ্টের চেয়ে মৃত্যু ভাল। কিন্তু পরকালে যেহেতু মৃত্যু হবে না, সেজন্য যাদের মনের অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়া চেপে বসবে তাদের কাছে সময় অসীম মনে হবে। অন্যদিকে যারা সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে, তাদের মনে সময় জ্ঞান তো জাগবেই না, সেই সাথে আবর্তনের সময় অচল থাকায় সে সময়ের কোন টেরই পাবে না।

এখানে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে পরকালে যে স্থিরতা বিরাজ করবে এর প্রমাণ কি?

গতি চিরন্তন হওয়া অবাস্তব, এটি বিজ্ঞানের কথা, যুক্তির কথা, দর্শনের কথা। আমাদের সামনে দিয়ে যখন কোন গাড়ি চলে যায়, তখন আমরা মনে করি এই গাড়ি কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাবে। এটা সত্য যে, এই গাড়িটি এক সময় স্থির অবস্থান থেকেই যাত্রা শুরু করেছে। আবার সেটি তার গন্তব্যে পৌঁছে দাঁড়িয়ে যাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাস্তায় যান্ত্রিক ত্রুটি দূর করে আবার গতি সচল করা সম্ভব। কিন্তু গতিশীল বিশ্বে এ যুক্তির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কারণ চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীসহ আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রগুলো যদি একবার তার গতি হারিয়ে বসে তাহলে তাদেরকে কেউ মাথায় নিয়ে বসে থাকতে পারবে না। বরঞ্চ এই গতির জগৎ উদ্দেশ্যের গন্তব্য স্থানে পৌঁছলেই তার মাঝে স্থিরতা এসে যায়। এটিই যুক্তির কথা। গতির দ্বৈত প্রকৃতি হলো স্থিরতা, সেজন্য এটিই হওয়া স্বাভাবিক। যে যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা চলে না, সেটি তাত্ত্বিক হলেও বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন আমাদের প্রচলিত ধারণার বাইরে ঊর্ধ্বলোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন- "অপার্থিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ টেনে নিচে নামায় না, পদার্থ বলে সেখানে কিছুই থাকবে না।"

বিশ্বের আদি, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিন পর্যায়ের মধ্যে বর্তমানের ধারণা ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমাদের কোন বাস্তব জ্ঞান নেই। এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে পরম স্থিতি থেকে গতি, তারপর আবার স্থিতিতে চলে আসা বিজ্ঞানের যুক্তিতে

www.nagorikpathagar.org

যেমন আকাট্য তেমনি দর্শনের যুক্তিতেও সেটি ওজন করার মতো। পৃথিবীতে জন্মলাভ করলে তাকে তখন থেকেই 'সময়' ফাঁকি দিতে থাকে। কারও পক্ষে সময়ের গতিকে উল্টো দিকে ঘুরানো সম্ভব হয় না। মোটের উপর সময় সকলের জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন– "হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্য সময়-কালও নির্ধারিত আছে।"

"গর্বিত কাফেরদের জন্যে ভয়ানক গর্হিত স্থান এ জাহান্নাম। আর এখানেই তাদেরকে অবস্থান করতে হবে চিরকাল।" (সূরা যুমার)

"তাদের প্রভু (আল্লাহ) তাঁর রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন বাগ-বাগিচার বাসস্থানের সুসংবাদ দেন, সেখানে তাদের জন্য চিরন্তন সুখ-শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে। চিরকাল তারা যেখানে বসবাস করবে। নেক কাজের প্রতিদান দেবার জন্য তাঁর কাছে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে।" (সূরা-৯ : ২১-২২)

আমাদের দুনিয়ার জীবন মূলত পরকালীন জীবনের মাতৃগর্ভ। এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু পরপারের জীবন চিরস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কাজকর্মের সকল ফলাফল সেখানে প্রকাশিত হবে। সেদিন ভালো মন্দের আলাদা আলাদা জগৎ থাকবে। গতি আর স্থিতির ব্যাপারটি আকাশের উল্কা পিণ্ডের মতো। নির্মল আকাশের দিকে তাকালে গ্রহ-নক্ষত্রের উপস্থিতির ফাঁক থেকে কোথাও কিছু নেই, এমন স্থান হতে হঠাৎ একটা আলোর পিণ্ড যেন ছুটে আসে নিচের দিকে। সেটি পৃথিবীর কাছাকাছি এসে যখন মিলিয়ে যায় বায়ুর গর্ভে তখন আর তাকে দেখা যায় না। বায়ুর সাথে উল্কা পিণ্ডের ঘর্ষণে সেটি হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় তার আসল রূপ ও চরিত্র রূপান্তর হয়ে পড়ে। যার জন্য তাকে আর পৃথকভাবে দেখা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় একে দেখা না গেলেও সে তো নতুনরূপেই সেখানে থাকে। এক সময় এই বিশ্ব ভুবনে কোথাও কিছু ছিল না। স্রষ্টা সেই আসরে ছিলেন নিজ আসনে। তারপর তিনি সৃষ্টি করলেন গতির বিধান। এ বিধানের আইনেই 'প্রকৃতি' নামের নীতি জারী হয়। যখন কোথাও কিছু ছিল না তখন স্থির অবস্থান থেকে উল্কা পিণ্ডের মতো এ বিশ্বের যাত্রা শুরু হয়। এর উপাদান স্রষ্টার অভিব্যক্তির বিচ্ছুরিত এক পরম সত্তা। এ সত্তা কোথাও হতে তিনি আমদানী করেননি। আল্লাহর ইচ্ছার পরিকল্পনার ফসলই এটি। সেখান থেকেই উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের যাত্রা শুরু হয়। অবশেষে পরপারের কাছাকাছি এসে সেই যাত্রা উল্কা পিণ্ডের মতোই মিলিয়ে যাবে। তারপর তাঁর হুকুমেই নতুন সাজে গতির মৃত্যুর সাথে সাথে আবর্তনশীল সময় হয়ে যাবে স্থির। আমরা যখন সময়ের আদি-গোড়া নিয়ে চিন্তা করি তখন

www.nagorikpathagar.org

আমাদের চারপাশে এসে ভিড় করে পুনরুত্থান ও মৃত্যুর জিজ্ঞাসা। পৃথিবী সৃষ্টির পর যখন তার ঘরে মানুষ বাস করতে শুরু করে, তখন থেকেই এই জিজ্ঞাসা। এর সমাধানও অনেক জ্ঞানী-গুণীজন দিয়ে গেছেন। অধিকন্তু পাক কোরআনে হৃদয় জুড়ানো কথামালায় রয়েছে তার উত্তর। সেসব তালাশ করে দেখলেই আমাদের পক্ষে মহাবিশ্বের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই জানা সম্ভব। সেই সাথে জানা যাবে সময়ের কথা, জীবন, জগৎ ও একাল সেকালের কথা।

পুনরুত্থানের ধারণা

এ পৃথিবীতে জন্মিলেই মৃত্যু পিছু ধাওয়া করতে থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'মৃত্যু দূত' জীবন কেড়ে নেয়। সেজন্য কারও পক্ষে চিরস্থায়ীভাবে পৃথিবীতে থাকা সম্ভব হয় না। একদিন না একদিন সকলকে চলে যেতে হয়। তবে কেন এই আসা যাওয়ার পালাবদল? এর নেপথ্যে কী কোন উদ্দেশ্য নেই? জন্ম-মৃত্যুর পালাবদলেই কি জীবনের সমাপ্তি ঘটে? ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না, মানে না। কারণ বিজ্ঞানের হাতে ধ্বংস না হওয়ার পেছনে অনেক যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। আবার বিজ্ঞান পুনরুত্থান হওয়াও বিশ্বাস করে। মানুষের কামনা, বাসনার স্বপ্ন অফুরন্ত। মৃত্যুর অন্তিম ক্ষণেও তার আশা থেকে যায়। তাই দুনিয়ার জীবনে সৃষ্টির পূর্ণতা নেই। কেন জানি পৃথিবীর সবকিছুর মাঝেই থাকে বাঁচার আশা। এ বাঁচার আগ্রহই মানুষকে স্রোতের মতো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে ততই তার সময় ফুরিয়ে আসতে থাকে। বার্ধক্যের পর্যায়ে এসে সবাই যেন শিশুর মতো হয়ে যায়। তখনও তার আশা সে মরবে না। সেজন্য মৃত্যুর আগেও কেউ কল্পনা করে না, এখনি সে চলে যাবে। তবু চলে যেতে হয়। একবার দম চলে গেলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। যারা বেঁচে থাকে তাদের মনে লোকটির শূন্যতা হাহাকার করতে থাকে। তাই মৃত্যুটা যেন অপূর্ণতার শোক। এর যদি পূর্ণতাই থাকতো তাহলে কোন অতৃপ্তি কাউকে গ্রাস করতে পারতো না। আমাদেরকে যেহেতু আশা-ভরসার অপূর্ণতা নিয়ে চলে যেতে হয় সেহেতু ধরে নেয়া যায়, জীবন নদীর স্রোত এখানেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। মহাসাগরের জলরাশির স্পর্শ না পেলে যেমন নদীর স্রোত চলতেই থাকে তেমনি জীবন নদীর স্রোত কলকল রবে ছুটে চলে পূর্ণতার দিকে। সাগরের যেমন ঠাঁই নেই, পূর্ণতার মাঝে যেমন বাড়া কমার প্রশ্ন নেই তেমনি এ জীবন যে মহাসাগরে গিয়ে ঠাঁই নেবে সেখানেও শেষ নেই। তাই সৃষ্টির অপূর্ণতা আমাদেরকে পুনরুত্থানের নীতি কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। তাছাড়া সৃষ্টির অবিনশ্বরতা বা ধ্বংসহীনতাও পুনরুত্থানের বিশ্বাস জন্মায়।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন- "(হে মানুষ) কিভাবে তোমরা অস্বীকার করতে পার, অথচ তোমরা ছিলে মৃত; অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় জীবিত করবেন এবং অবশেষে তোমরা সকলে তার নিকট ফিরে যাবে।" (সূরা-২ : ২৯)

"এরপর একদিন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং আবার কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (১ : ১৫-১৬)

"তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। এ পুনরাবৃত্তি তার পক্ষে খুবই সহজতর।" (সূরা-৩০ : ২৭)

মুসলমান হিসেবে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। মৃত্যুর সাথে সাথে যে কেউ বেহেশতে যেমন সচরাচর চলে যেতে পারে না, তেমনি দোযখেও চলে যাবে না। তবে বেহেশত, দোযখের স্বাদ মৃত্যুর পর থেকে কবরের জীবনে পেতে থাকবে। যতদিন এ পৃথিবীর আয়ু আছে ততদিন মৃত ব্যক্তি কবর নামক রহস্যময় জগতে বাস করতে থাকবে। এই ক'দিনে দেহ পৃথিবীর মাটিতে পচে গলে মিশে গেলেও আত্মা সেই কবর রাজ্যে জীবিত থাকবে। যেদিন এ গতিশীল বিশ্বের অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে সেদিন থেকে নতুন বিশ্ব সৃষ্টির পালা শুরু হবে। সৃষ্টির এ বিপর্যয়কে বলা হয় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

"সেদিন আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেরূপ কাগজের তাড়া গুটিয়ে নেওয়া যায়। যেরূপ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম তদ্রূপ তা পরেও করব। তা আমার ওয়াদা। নিশ্চয়ই আমি সংঘটিত করব।" (সূরা-২১ : ১০৪)

"এবং সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর পুনরায় তন্মধ্যে ফুৎকার করা হবে; তৎপর তখনই দণ্ডায়মান দেখতে থাকবে।" (সূরা-৬৯ : ৬৮)

"অতঃপর যখন শিঙ্গায় একই ফুৎকার করা হবে এবং পৃথিবী ও পর্বতরাজি উত্তোলন করা হবে; তৎপর তাকে একই বিচূর্ণে বিচূর্ণ করা হবে। সেদিন আকাশ বিচূর্ণ হয়ে তা বিকল হয়ে যাবে।" (আল-কুরআন)

সৃষ্ট এই সুন্দরতম আবাস ভূমি কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ে নষ্ট হয়ে গেলেও তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। বস্তুর সূক্ষ্মতম কণা কিংবা শক্তির পাতলা মিহিদানা থেকেই যাবে। সেই সত্তাতে আবার একদিন সজীবতা আসবে। জেগে উঠবে নতুন বিশ্ব। নতুন বিশ্বব্যবস্থা এবং বর্তমান বিশ্বের প্রলয় সম্পর্কে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বাণী হলো– এই বিশ্বের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় একশত নিউট্রোনো বিরাজ করে। সেগুলো আলোর গতিতে চলে। মানুষের শরীর ও পৃথিবীর মধ্য

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে তা অনায়াসে চলাচল করতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণের ধারণা এ কণার আকর্ষণের ফলে এ বিশ্ব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এদের আকর্ষণের ফলে এ বিশ্ব আবার সংকোচিত হয়ে আদি মহাবিস্ফোরণের পূর্বে বিশ্বের যে অবস্থা ছিল আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। পুনরায় আবার মহাবিস্ফোরণের ফলে নতুন আর এক বিশ্বের সৃষ্টি হবে।" (আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন : পৃষ্ঠা-৭৫)

কুরআন ও বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে এ বিশ্বের প্রলয় ও নতুন বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু নতুন বিশ্বের নিয়ম নীতি কি এ দুনিয়ার মতোই হবে? সেখানে কি সূর্যের মতো সূর্য থাকবে, চাঁদের মতো চাঁদ থাকবে? অন্ধকার আর আলো কি একসাথে থাকবে? আমাদের আকার, আকৃতি, প্রকৃতি কি দুনিয়ার মতোই হবে? নিঃসন্দেহে বলা যায় কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন ব্যতীত সে বিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ গতির জন্য উৎকর্ষতা এবং বিপর্যয় ঘটে থাকবে। অর্থাৎ গতিশীল সত্তা সুষম গতিতে না চললে এর মাঝে ধ্বংস ও বিপর্যয় দেখা দেবে। এরাই সীমালঙ্ঘনকারী। আবার নিয়ম নীতিপূর্ণ সরল ও সুষম গতির জন্য উৎকর্ষতা ও পুরস্কার থাকবে। তাই নতুন বিশ্ব আর বর্তমানের অবস্থায় থাকবে না। বিজ্ঞানীগণের ধারণা ঃ এ বিশ্বের ধ্বংসের পর মোট ভরশক্তির পরিমাণ ঠিকই থাকবে, তবে রূপের পরিবর্তন ঘটবে। এ ভর-শক্তি অনন্তকাল ধরে একটানা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করবে না। কিন্তু নতুন বিশ্ব সৃষ্টি হলে তার জন্য নতুন ব্যবস্থাও প্রবর্তন হবে। (আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন : পৃষ্ঠা-৭৭)

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

"যেদিন পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত হবে এবং তারা অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত আল্লাহর সম্মুখীন হবে।"

"আমিই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করে দিয়েছি এবং আমি তাতে অসমর্থ নই যে, আমি তোমাদের গঠন পরিবর্তন করে দেব এবং তোমাদেরকে এমনভাবে গঠন করব যা তোমরা অবগত নও এবং অবশ্যই তোমরা প্রথম সৃষ্টি অবগত আছ। তথাপি তোমরা কেন উপলব্ধি করতে পারছ না।" (সূরা-৫৫ : ৪৬-৫২)

বিজ্ঞানের অগাধ বিশ্বাস গতি আদ্যান্তশীল। এ বিশ্বে গতি এবং সময়ের শুরু একই সময় হয়েছিল। গতি ও সময়ের সূচনার আগে সর্বত্রই ছিল স্থিতি অবস্থা। সেই পরম স্থিতি অবস্থায় বিশ্ব কেমন ছিল তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। তারপর গতির যাত্রা শুরু হলে সেই অবস্থাতে পরিবর্তন আসে। আজকের এ বিশ্বের আকার আকৃতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এতে লেগেছে অনেক যুগ, অনেক সময়। যার হিসাব আমাদের পক্ষে দেয়া কঠিন। আবার যেদিন এ বিশ্বের গতির

www.nagorikpathagar.org

চাকাটি বন্ধ হয়ে যাবে, তারপর প্রলয় ও ধ্বংসের পর নতুন বিশ্ব সৃষ্টি হবে, নতুন আইন জারী হবে। সে আইন সম্পর্কে এ মুহূর্তে বাস্তব ধারণা পাওয়া আশাতীত।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় গতি অবস্থান্তে তিন রূপে থাকে। যেমন আদি, চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়। তাই মানব জীবনের পর্যায়ক্রমিক পালাবদলের মধ্যে গতির নিয়মেই জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান থাকবে। ফুলের কলি না ধরলে যেমন ফল হয় না তেমনি বীজ না হলে পুনর্জন্ম লাভ সম্ভব নয়। ফল যখন পেকে যায় তখন সেটি গাছ থেকে ঝরে পড়ে। এই ফলের উপরের অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বীজ থেকে নতুন গাছ হতে পারে। পাকা ফল যেমন গাছে থাকে না, তেমনি মানুষের দুনিয়ার আয়ুষ্কাল শেষ হলে সেও চলে যায়। এই চলে যাওয়ার পথ করে দেয় মৃত্যু। মৃত্যুর সাথে পুনরুত্থানের সম্পর্ক খুব নিবিড়। মূলত মৃত্যু কি? এ প্রশ্নের সমাধান পেলে পুনরুত্থান সম্পর্কে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘুচিয়ে নেয়া আরও সহজ হবে।

মৃত্যু কি?

মৃত্যু কি সকল কিছুর অবলুপ্তি? না সাময়িক কর্মচ্যুতি? কোন কিছুর অবলুপ্তি বা বিনাশ ঘটা প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ। প্রকৃতির নিয়মে রূপান্তর চলে, পুনঃবণ্টন চলে কিন্তু একেবারে ধ্বংস হওয়া এ জাগতিক বিশ্বের কোথাও কোন নিয়ম প্রচলিত নেই। তাই মৃত্যুকে বলা হয় সাময়িক কর্মচ্যুতি বা মহানিদ্রা। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝতে হলে নিজের মধ্যেই ভাবতে হবে বেশি করে। কারণ এর মধ্যে মৃত্যুর আলামত লক্ষ্য করা যায়। মানুষ বহুকোষী প্রাণী। জীবিত অবস্থায় এর প্রতিটি কোষে থাকে প্রাণ উদ্দীপনা। ইটের সারির মতো এই জীব কোষগুলো স্তরে স্তরে একত্রিত হয়ে যে কাঠামো গড়েছে সেটিই আমাদের দেহ। মৃত্যু-সৈনিক প্রতি মুহূর্তে দেহকোষের কোন না কোন অংশ থেকে এদেরকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুতি দিয়ে থাকে। এ যুদ্ধ এতো দ্রুত ঘটে যে তা আমরা টের করতে পারি না। বয়সের দিক থেকে কে আগে মরবে, কে পরে মরবে এরূপ কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। তাছাড়া আংশিক কর্মচ্যুতি এবং তার সাথে সাথে পুনঃজন্মের জন্য এতে কারও অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিনষ্ট হয় না। আমাদের স্নায়ু ব্যবস্থাতে Inhibitory Impulse (বাধাদানকারী তাড়না) ও Inspiritory Impulse (অনুপ্রেরণাকারী তাড়না) কাজ করে। যখন কোন অঙ্গের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় তখন মনের নির্দেশে মস্তিষ্ক হতে Inhibitory Impulse প্রেরিত হয় এতে ঐ অঙ্গের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিংবা ঐ

www.nagorikpathagar.org

কাজ থেকে সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে ফিরিয়ে আনা হয়। যেমন কারও হাত যদি অসাবধানতাবশত আগুনে ঢুকে পড়ে, তখন ঐ অঙ্গের afferent Impulse (অন্তর্মুখী তাড়না) এর সাড়া পেয়ে তাকে দুর্ঘটনা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য মনের নির্দেশে মস্তিষ্ক থেকে Inhibitory Impulse প্রেরিত হয়। ফলে হাতটি ঐ কাজ থেকে কর্মচ্যুতি নিয়ে দূরে সরে আসে। আমাদের স্নায়ু ব্যবস্থার Inhibitory Impulse-এর কাজ সাময়িকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। সে কারণে হাতটি দীর্ঘক্ষণ কর্মহীন থাকে না।

আরও দেখা যায়, খেতে খেতে পেট ভরে গেলেও খাদ্য খাওয়া বন্ধ রাখার জন্য Inhibitory Impulse সাময়িকের জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু পেট খালি হলেই Inspiritory Impulse-এর কাজ শুরু হয়ে যায়। এ কাজগুলো এতো দ্রুত ঘটে, যার সম্পর্কে আমাদের কোন খরব রাখা সম্ভব হয় না। বিশ্ব-জগতের প্রকৃতির বিধানে এরূপ এক রহস্যময় বিধান চালু আছে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বেরও একটি অদৃশ্য স্নায়ুরজ্জু আছে। যার নিয়ন্ত্রণভার আল্লাহর হাতে। এই স্নায়ুরজ্জুর মূল ভাণ্ডার যেখানে তার নাম 'আরশ'। আল্লাহর নির্দেশেই সকল কাজ সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন কোন ব্যক্তির দুনিয়ার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহর নির্দেশে 'আরশ (মহামস্তিষ্ক) থেকে যে Inhibitory Impulse আসে এর দ্বারা ব্যক্তির দুনিয়ার কাজে সাময়িক কর্মচ্যুতি ঘটে। এতে আত্মার বাহন (জড় কাঠামো) প্রাণের দীর্ঘক্ষণ অবর্তমানে পড়ে থাকায় তা পচে গলে শূন্যে ও যমীনের মাটিতে মিশে যায়। আত্মাকে ধরে নেয় 'মৃত্যু দূত' নামের ফেরেশতা। তাঁর নাম আযরাঈল (আ)।

আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য নেওয়া আর না নেওয়ার জন্য একটি চক্র চলে। একে বলা হয় Feed-back mechanism। সেদিক থেকে আযরাঈল (আ)-এর কাজটি Life-back mechanism-এর মতোই। আয়ুর নাটাইটা যখন খালি হয়ে যায়, তখন দুনিয়ায়ও কারও পক্ষে এক পা নড়া সম্ভব নয়। সে মুহূর্তে Negative সংকেত বা afferent Impulse বইতে থাকে। এর ফলে Inhibitory Impulse-এর ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ফলে দুনিয়ার জীবনে নেমে আসে সাময়িক কর্মচ্যুতির পালা। একেই বলা হয় মৃত্যু। দুনিয়ার জীবনের জন্য এই সময়টা একটু লম্বা চওড়া বিধায় আত্মার অবর্তমানে তার বাহন পচে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কালের আবর্তে আবার যখন স্রষ্টা তাঁর বিশ্ব ব্যবস্থায় Inhibitory Impulse-এর ক্রিয়া রহিত করবেন, তখন Imspiritory Impulse এর সাড়া জাগবে। ফলে এ বিশ্বের সবকিছু পুনঃগঠিত হয়ে যে যার

www.nagorikpathagar.org

বাহনের মধ্যে চলে আসবে। এদিক থেকে সাময়িক কর্মচ্যুতি বা মহানিদ্রার অবসানের নাম পুনরুত্থান।

আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর রহমতের নিদর্শন দেখো, যমীন মৃত হবার পর কিভাবে তিনি জীবন দান করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃত মানুষকেও জীবন দান করবেন। তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।" (সূরা-৩০ : ৫০)

"তোমরা মৃত ছিলে, খোদা তোমাদের জীবিত করেছেন। তিনি আবার তোমাদের মৃত করবেন, আবার জীবিত করবেন। পুনরায় তাঁর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সূরা-২ : ২৮)

"এবং যখন ইবরাহীম বললেন : প্রভু কেমন করে তুমি মৃতকে পুনর্জীবিত কর, তা আমাকে দেখাও। তিনি (আল্লাহ) বললেন, কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না? তিনি (ইব্রাহীম) বললেন, নিশ্চয়ই (বিশ্বাস হয়) তবে দেখালে অন্তরে শান্তি পেতাম। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে (বিভিন্ন শ্রেণীর) চারটি পাখি এনে তোমার অনুগত হতে শিক্ষা দাও। তারপর তাদেরকে মাথা কেটে রেখে গোশতগুলো টুকরা টুকরা করে এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে এসো। তারপর তাদের নাম ধরে ডাকো। দেখবে তারা তোমার নিকট (নিজ দেহে) উড়ে আসবে এবং জানো যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।" (২ : ২৬০)

আমাদের দেহ রাজ্যের শাসনভার স্নায়ুমণ্ডলীর হাতে। মনের আজ্ঞাধীন হয়ে সে তার দায়িত্ব পালন করে। এর কারুকার্য এতো কঠিন যা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Nervous হতে হয়। সে তুলনায় আল্লাহর রাজ্যের স্নায়ুরজ্জুর ব্যবস্থাপনা আরো কতো যে জটিল তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। সেজন্য আল্লাহর রাজ্যের স্নায়ুরজ্জুর Inhibitory Impulse-এর কার্যের সাথে মৃত্যুর সম্পর্কটিও রহস্যময়। তাই ক্ষেত্র বিশেষে রূপক উদাহরণই প্রযোজ্য। তবে গবেষণার বেলায় মূলের দিকে কিছুটা হলেও ধাবিত হতে হয়। তা না হলে মৃত্যু আর পুনরুত্থানের সম্পর্কটি সহজ সাধ্যভাবে উপস্থাপন করা কঠিন।

গতি, স্থিতি, মৃত্যু ও পুনরুত্থান এসব নিয়ে যখন ভাবনা জাগে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এ মহাবিশ্বের সূচনা কোত্থেকে হলো? সবকিছুর যেখানে মূল, সেখানে ফিরে যেতে পারলেই যেন জানার আর কিছু থাকে না। ফলে বর্তমানকে খুব কঠিনভাবে মূল্য দেয়া সম্ভব হয়। তখন পথ চলা যায় সহজ ও সুন্দরভাবে। মূলত সহজ সরল পথেই মানব জীবনের সার্থকতা। বিশ্ব এতো বড় যে তার তুলনা হয় না। ফলে মৃত্যুর রহস্যকেও অনুধাবন করা সহজ নয়।

www.nagorikpathagar.org

মহাবিশ্বের সূচনা কোত্থেকে

দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আমরা যে বিশ্বকাঠামো দেখি, এই বিশ্ব কখন কিভাবে, কোত্থেকে এলো। এর কি কোন সূচনা নেই। নদীর উৎস পাহাড় বা হ্রদ। এর শেষ আশ্রয়স্থল সমুদ্র বা সাগর। এই নদী কেউ মাটি খুঁড়ে বানায়নি। প্রাকৃতিক নিয়মেই তার জন্ম। সাগর বা সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়। এই বাষ্প একসময় মেঘে রূপ নেয়। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে বৃষ্টিরূপে অনবরত পাহাড়ের গায়ে ঝরতে থাকে। সেই স্রোত থেকেই নদীর জন্ম। কিন্তু এই সাগর, এই পাহাড় ও পানি কোত্থেকে এলো? কে বানাল? এসব অগণিত প্রশ্ন চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। মরুভূমির মতো হৃদয়ে অনেক সময় বৃষ্টি নামে। সেখানের পানি হয়তো সহজেই বালির ফাঁক দিয়ে চলে যায় পাতালে। তারা উপরের প্রশ্নের উত্তর বের করতে না পারলেও সময়ে সময়ে ভাবে। কিন্তু জ্ঞানী ও ধৈর্যশীলগণ বসে থাকে না। তারা এসব প্রশ্নের আগা-গোড়া খুঁজতে গিয়ে রাতের ঘুমকে দিয়েছেন নির্বাসন। মস্তিষ্কের ভাঁজে ভাঁজে তুলেছেন ঝড়। নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ায় নিউট্রন যেভাবে নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে পারমাণবিক শক্তি বের করে, তেমনি মানব মনের মনন বুদ্ধি শক্তি বস্তুর রেণু-কণার ভেতর থেকে বের করার চেষ্টা করছে তার সূচনা কলি, হন্যে হয়ে খুঁজছে বস্তুর ভেতরে তার আদি উপাদান তালাশ করছে কিভাবে, কোত্থেকে এই সৃষ্টি জগতের বস্তু নামের আয়তনশীল পদার্থের আদি মৌল সৃষ্টি হলো? ভাবছে বস্তুর আদি মৌল কি জিনিস এবং এটি দেখতেই বা কেমন ইত্যাদি...। পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে দেখা যায়, এক পাহাড় পরিমাণ প্রশ্ন চিন্তাশীল মানুষকে সব সময় ভাবনার খোরাক দিয়ে বন্দি করেছে নির্জন কুটিরে। মানুষের চেষ্টার শেষ নেই। তার জানার সাধ অনেক। সে আকাশেও উড়তে চায়, আবার পাতালপুরীর রহস্যও জানতে চায়। জানতে পারলেই যেন সে তৃপ্তি অনুভব করে, আনন্দ পায়। মূলত জানার আগ্রহের মাঝে রয়েছে অসীমের রহস্য, তাঁর নিগূঢ় সত্য খুঁজে পাওয়ার পথ। এই পথ আবিষ্কার করতে পারলেই মানুষের সৃষ্টির রহস্য জানার বাকি থাকে না।

এই বিশ্ব জগৎ অসীম। এর কূল কিনার পাওয়া মানুষের সাধ্যাতীত। কতো দূর পর্যন্ত যে এর বিস্তৃতি তা বলা কঠিন। মাকড়সার জালের মধ্যে মাকড়াসা যেমন ঝুলে থাকে, তেমনি আমরা এই শূন্যে ঝুলন্ত পৃথিবীটার মধ্যে ঝুলে আছি। এর ওপরে কিংবা নিচে যাওয়া আমাদের সম্ভব হয় না। আমাদের বাসস্থান ও জীবনের গণ্ডি খুব সীমাবদ্ধ। তাই সসীম কখনো অসীমকে ধরতে পারে না, স্পর্শ করতে পারে না। সসীম যদি অসীমকে ধরতে পারে তবে অসীম বলতে কিছু থাকতে পারে না। সেজন্য মানুষ সৃষ্টির আদি অবস্থা, এর সূচনা কাল, তার বাস্তব নমুনা ইত্যাদি কোন কিছুর যথাযথ ধারণা দিতে সক্ষম নয়।

www.nagorikpathagar.org

(ক)

[আল্লাহর ইচ্ছার ব্যগ্রতার "মহাস্পন্দন" পরমস্থিতির জগতটিতে পরমগতি সৃষ্টি করে। এ থেকেই পর্যায়ক্রমে মহাবিশ্বের সূচনা হয়।]

"আল্লাহই সকল সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন; তারপর তা পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেছেন এবং সবশেষে সবাইকে তার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (১৭ ঃ ৫০-৫৩)

"আমি যে জিনিসের ইচ্ছা করি সেজন্য শুধু এতটুকু বলতে হয় "হয়ে যাও" তাহলেই তা হয়ে যায়"। (সূরা নাহল : ৪০)

"আমি ছিলাম একটি গুপ্তধন। আমি প্রকাশ হতে চাইলাম; তাই সৃষ্টি করলাম- এই সৃষ্টিকে। ইচ্ছা আমি পরিচিত হই।" (হাদীসে কুদসী)

www.nagorikpathagar.org

(খ)

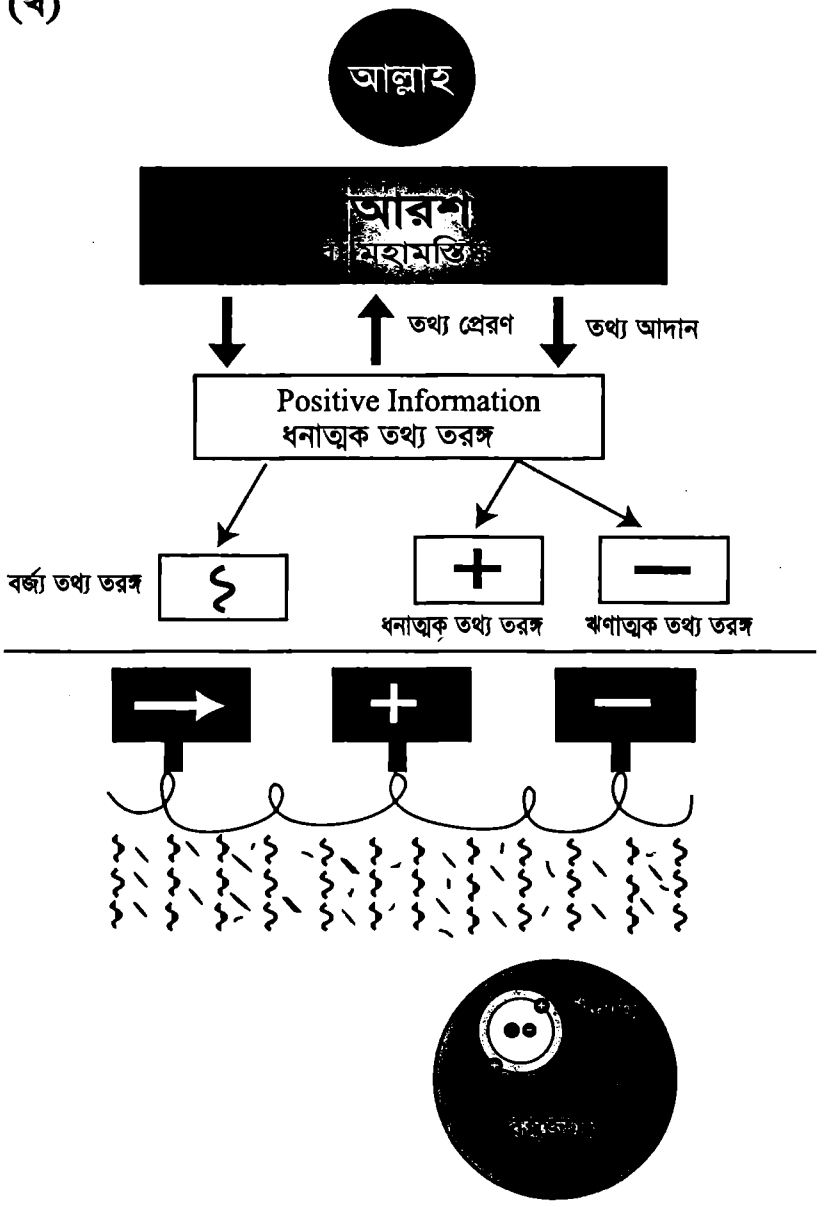

"তারপর 'আরশকে আল্লাহ নিজ আধিপত্যের অধীন করলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারুরূপে চলতে লাগলো।" (আল-কুরআন)

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু মানবজাতি সৃষ্টির যাত্রা শুরু হওয়ার মুহূর্তে জন্ম লাভ করেনি, অন্যদিকে ঐ মুহূর্তের কোন বাস্তব চিত্র মানুষের হাতে নেই। এ বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার অনেক পরে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের জন্মের আগে অনেক কিছু ঘটেছে। অনেক কাল অতিক্রম করেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা স্থান-কালের সাথে সম্পর্ক যুক্ত বিধায় আমরা যখন ছিলাম না তখন কি ঘটেছে, তা আমাদের জানার কথা নয়। তবু মানুষ চেষ্টা করেছে, সৃষ্টির রহস্যের দুয়ার খুলে তার ভেতর থেকে কিছু আনার জন্য। কিন্তু সৃষ্টির মালিকের ক্যাটালগ বা গাইড বুক না পড়ে যারা চেষ্টা করছে কিছু পাওয়ার জন্য তারা সার্থক না হয়ে ব্যর্থই হয়েছেন চরমভাবে।

এক দল দৈব বুদ্ধিশীল বস্তুবাদী মানুষ ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠে এ বিশ্বের সূচনাকে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব নামের এক কাল্পনিক ব্যাখ্যার ধোঁয়া তুলে তার যাত্রা শুরু করেছেন। তাদের বিশ্বাস এ জগৎ সৃষ্টি হওয়ার আগে কোথাও কিছু ছিল না। তখন সর্বত্রই অসীম শূন্যতা আর শূন্যতা বিরাজ করছিল। তারা সে সময়কে শূন্য সময় মনে করেন। তাদের ধারণা সেই অস্তিত্বহীন শূন্য পরিবেশে দৈবক্রমে এর কোন এক বিন্দুতে আদি ভর শক্তির সমাবেশ ও ঘনায়ন ঘটে। তারপর প্রবল অভ্যন্তরীণ তাপে ও চাপে সেই ভর শক্তিতে হঠাৎ এক মহাবিস্ফোরণ ঘটে। সেই থেকে এই ভর-শক্তি অস্তিত্বহীন বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন থেকেই শুরু হয় বিশ্বের ক্রমবিকাশ ও তার সম্প্রসারণ।

অন্যদিকে কট্টর বস্তুবাদী বানর শ্রেণীর লোকেরা মনে করে আদি হতেই এই বিশ্বে ভর-শক্তি মওজুদ ছিল। তাদের বিশ্বাস বস্তুর আদি মৌল ও তার গতি চিরন্তন। এর কোন স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক নেই। তাদের ধারণাগুলো এমন যেন হঠাৎ একটি পাখি এসে মাটিতে পড়ে গেল। পাখিটি জীবিত।

পৃথিবীর বেলায় এমন ঘটনা কল্পনা করা যেতে পারে। কারণ এখানে রঙ বেরংয়ের পাখি আছে। তারা অনেক বাচ্চা ফুটায়। কিন্তু চাঁদের বেলায় কিংবা সূর্যের বেলায় পাখি আসা কি করে সম্ভব? সেখানে তো পূর্ব হতেই জীবন ধারণের পরিবেশ নেই। আবার একেবারে শূন্যস্থানে পাখিটা জন্ম হবে কিভাবে? তবু তারা মনে করে এগুলো আদিকাল থেকেই ছিল। যার যার প্রয়োজনে সব লেগে লেগে এই জগৎ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

এ দু'শ্রেণীর দৈব বুদ্ধিশীল মানুষের তত্ত্বের মাঝে অনেক ফাঁক আছে বলেই কিছু প্রশ্নের জন্ম হয়। যেমন শূন্য পরিবেশে কোন এক বিন্দুতে যে সকল আদি ভর-শক্তির সমাবেশ ও ঘনায়ন হয়েছিল, এই শক্তি আসলো কোত্থেকে? ইত্যাদি..... ইত্যাদি। কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব দিতে তারা অপারগ। তারা বলে

www.nagorikpathagar.org

এটা এমন এক প্রশ্ন যার উত্তর দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যে জিনিসের মাঝে অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকে সেটি কোন কালেও বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকার করা যায় না। বরঞ্চ এখানে এসেই তারা পরাজয় বরণ করে হতাশায় আর দুঃশ্চিন্তায় ভোগে।

বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যেভাবে কোন বিষয়ের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মনে করি' কিংবা 'ধরি' এরূপ ধার করা অস্তিত্ব কল্পনায় এনে যাত্রা শুরু করে অগ্রগতির চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়, সেভাবেও যদি তারা বিশ্বের আদিতে অনন্ত অসীম মহাপ্রজ্ঞাবান স্রষ্টাকে এনে হাজির করে, বিশ্বের সূচনা তাঁকে দিয়েই আরম্ভ করেন তাহলেও দ্বৈব চিন্তা, মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ইত্যাদির মতো কোন খোঁড়া যুক্তি ছাড়াই তার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হতো। তারপর এমন এক সময় আসত যখন ঐ কল্পনার সত্তা চরম বিশ্বাসের বিষয়বস্তুতে রূপ নিত। তখন আর তাঁকে না দেখেও স্বীকার করার অফুরন্ত যুক্তি প্রমাণ তার হৃদয়ের দৃষ্টি শক্তিতে সত্যের আলোয় ঝাঁঝ ধরে যেত। অথচ এরা খোদার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বিশ্বের সূচনার কথা ব্যাখ্যা দিতে চায়।

আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন– "আমিই আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছি নিজ শক্তি বলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।" (৫১ : ৪৭)

"তিনিই আদি ও তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত।" (৬ : ১০৩)

এ বিশ্ব গতিশীল। কার্য কারণ ব্যাখ্যার মতে গতির জন্য স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজন। এ বিশ্বের প্রতিটি জ্যোতিষ্কের বাইরে যেমন রয়েছে গতি তেমনি তার ভেতরের পরমাণুর কাঠামোর মাঝেও আছে গতি। বিজ্ঞানীদের ধারণা শক্তির ঘনীভূত অবস্থাই পদার্থ কিংবা গতির মন্থরতাই বস্তু। সে কারণে যখন এই বিশ্বে গতি ছিলো না তখন পদার্থ বা বস্তু কিংবা শক্তির (পদার্থের মৌল উপাদান) কোন বালাই ছিল না।

কিন্তু বিস্ফোরণবাদীরা পদার্থের মৌল উপাদান শক্তিকে constant হিসেবে ধরে নেয়। তারা মনে করে স্রষ্টা থাকলেও পদার্থের মূল উপাদান মওজুদ ছিল। তাদের দৃষ্টিতে খোদা কার্পেন্টার গড। মিস্ত্রি যেমন কাঠ, লোহা, সংযোগ করে বিভিন্ন উপাদান তৈরী করে, তাদের দৃষ্টিতে খোদাও তেমনি। কিন্তু মুসলিম দর্শনে খোদা বস্তুর উপাদান ও বস্তুর স্রষ্টা। পরম স্থিতি অবস্থায় এ বিশ্বের স্রষ্টা ছিলেন নিরাকার, স্থিতিশীল ও অনন্ত, অসীম। তিনি তখনও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি আছেন। যার কিনার থাকে সেটিই হয় আকারশীল। কিন্তু নিরাকার

www.nagorikpathagar.org

কখনো কিনারশীল হয় না। তাই তিনি অসীম ও অনন্ত। ফলে গতি, সময় ও বস্তুর স্রষ্টা নিরাকার অনন্ত, অসীমের বেলায় হওয়াই বিজ্ঞানসম্মত।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে মানুষের ধারণা ছিল বস্তুর আদি মৌল ও গতি চিরন্তন। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। এই তত্ত্বের স্বীকৃত ব্যাখ্যা হলো গতি, সময় ও বস্তুর সূচনা একই সময় হয়েছিল। তাই এ বিশ্বে আদি হতে এসব বিরাজ করেনি। এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মনে প্রাণে পোষণ করলেও যে প্রশ্ন আমাদেরকে অস্থির করে তোলে, তা হলো পরম স্থিতির জগতে যখন বস্তুর কোন মৌলিক সত্তাই ছিল না, তাহলে এ জিনিস কোত্থেকে, কিভাবে আসল? বিশ্ব বিধাতা এ উপাদান আনলেন কোত্থেকে?

ধর্মের বাণীতে মানব জীবনের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান রয়েছে। আমরা যেহেতু আদিতে ছিলাম না, সে কারণেই আমাদেরকে ধর্মের গণ্ডিতেই তার সমাধান খুঁজতে হবে। অন্যত্র এর সমাধান খুঁজার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। বাস্তব ক্ষেত্রে পরম স্থিতি ও পরম গতির মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে সাঁতরাতে থাকলে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়।

মুসলিম দার্শনিকগণের বিশ্বাস, এ বিশ্ব আদিতে আল্লাহর মানসে স্থির অবস্থায় বিরাজমান ছিল। তখন না ছিল ভর, না ছিল সময় ও গতির কোন অস্তিত্ব। ছিল না শক্তির (পদার্থের আদি মৌল) কোন নিজস্ব উপাদান। তখন বিশ্ব মাতৃকোলে পরম স্থিতি নামের অস্তিত্বহীন জগৎটি ছিল আল্লাহর মালিকানাধীন। স্রষ্টা যখন নিজকে প্রকাশ করার অভিলাষে সৃষ্টির আদি পরিকল্পনার রূপ নিজ ধ্যানে আনলেন তখন পরম স্থিতির সাগরে তরঙ্গ বা ঢেউ-এর ন্যায় ঝড় ওঠে। গতির স্পন্দন শুরু হলে পরম স্থিতির জগতটি অবস্থান্তর হয়ে পরম গতির জগতে রূপ নেয়। আসলে ঢেউ বা তরঙ্গ গুদামে রাখার জিনিস নয়। সেটি মন থেকেই উদয় হয়। আল্লাহ যখন কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন 'হোক' এমনি তা গঠিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ 'কুন' 'ফাইয়াকুন' বললেই সব হয়ে যায়। তবে অবশ্যিই স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের মতো আল্লাহ শব্দ করে কথা বলেন না।

আমাদের ইচ্ছার ব্যগ্রতা মন থেকে নিজ সত্তাতে (দেহে) ঢেউ-এর ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এই মহাবিশ্বের মালিকের ইচ্ছার ব্যগ্রতা তাঁর মালিকানাধীন পরম স্থিতির রাজ্যে ঢেউ-এর ন্যায় ছড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নিজের অনুরূপ ইচ্ছার ব্যগ্রতা দিয়েই পয়দা করেছেন। মানুষের মনের বৈশিষ্ট্য খোদার কিঞ্চিৎ গুণের প্রকাশ। তাই মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। এ

www.nagorikpathagar.org

জন্য তাদের চিন্তা-চেতনা সৃষ্টিধর্মী। সে আলোকেই বলা যায়, সৃষ্টির আদি উপাদান স্রষ্টার অভিব্যক্তির প্রকাশ। যার স্বরূপ ঢেউ বা তরঙ্গ। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁর নাম নূর। বিজ্ঞানের ভাষায় হয়তো তার নাম কসমিক স্ট্রিং। এর রয়েছে তরঙ্গ ধর্ম। মনের অভিব্যক্তি প্রাথমিক ধাপে তরঙ্গের ন্যায়ই ছুটে চলে। এটি বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াতে সংঘটিত হয়। সে প্রক্রিয়াটি অন্য অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাই সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টার গুদামে বা শূন্য রাজ্যে কোন ভর-শক্তি জমা ছিল না। তিনি ছিলেন বিশ্বের আদি শাসক। অসীম শূন্য রাজ্যের পরম সত্তা, সেই জগতের মালিক।

মনে যখন খেয়াল জাগে তখন তার নির্জনবাসে উঠে স্পন্দন। এ স্পন্দন ঢেউ-এর ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল ঢেউ গর্জনে কেঁপে তুলে তার চারপাশ। এ ঢেউ ছুটতে ছুটতে এক সময় কিনার খুঁজে। কখনো প্রবল বেগের মাঝে বাউকুড়ানীর মতো শুরু হয়, এতে সমাবেশও ঘনায়ন ঘটে। তা থেকে রূপায়ণও শুরু হয়। সেই রূপায়ণ থেকে বিবর্তনের এক পর্যায়ে এ বিশ্ব জগতের উৎপত্তি। বর্তমানের এ বিশ্ব কাঠামো ও বস্তুর গঠন যত শক্তই মনে হোক না কেন, তার প্রতিটি কঠিন আবরণের ভেতরে সে ঢেউ বা তরঙ্গ এখনো লুকিয়ে আছে। আমরা খালি চোখে তা দেখতে না পারলেও অতিমানবগণ তা ইন্দ্রিয় চোখেই প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। হযরত ঈসা (আ) তাই জীবনে কখনো ঘর বাধেননি। তিনি সর্বত্রই শুধু ঢেউ-এর তর্জন-গর্জন শুনতে পেতেন।

আমাদের মুখের উচ্চারণ বা শব্দ প্রকৃতিতে ঢেউ-এর ন্যায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু মনের কথা প্রকৃতিতে সহসা ধ্বনিত না হলেও তার সংকেত মস্তিষ্কে আরোপিত হয় ঢেউ-এর ন্যায়। মনের শব্দ মস্তিষ্কে যেতে প্রথমে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মুখের কথা ধ্বনিত হতে মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের মুখ বসে থাকতে পারে নিশ্চুপ হয়ে কিন্তু মন কখনো সজাগ অবস্থায় ভাবনাহীন বসে থাকতে পারে না। সেসব সময় কিছু না কিছু কাজ চায়। আমাদের মনের ভাবনার দানাগুলো দেখতে না পারলেও সেগুলো অস্তিত্বহীন থাকে না। আমরা ভালো মন্দ অনেক কিছুই ভাবি। আমাদের অভাববোধ আছে। এর জন্য মনে তাড়না জাগে। আমাদের অভাববোধের তাড়না (Negative Impulse) থেকে খোদার নির্দেশে সেই সত্তা (নিজের অস্তিত্ব) থেকে নতুন জাতের উদ্ভব হয়। এর নাম Negative সত্তা।

তাছাড়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-বালাই, মৃত্যুর প্রহরী আমাদের পাশেই লেগে থাকে। সেজন্য মানুষ সবদিক থেকে পূর্ণ নয়। তার মাঝে সবসময়ই অভাব বোধ কাজ করে।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে অভাবহীন। কিন্তু স্রষ্টার কোন অভাববোধ নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-বালাই, মৃত্যু ইত্যাদি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি চির ভাবনাহীন। তবু তাঁর মাঝে প্রকাশ হওয়ার ব্যগ্রতা আছে। আছে সৃষ্টি প্রেম। তাই সৃষ্টিধর্মী প্রেম দোষের কিছু নয়। সেজন্য মনের সাথে প্রেমের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। প্রেমহীন মানুষ তাই মরুভূমির মতো। কিন্তু এ প্রেম হতে হবে সৃজনশীল, শুদ্ধ ও কু-চিন্তামুক্ত।

পরম স্রষ্টার প্রকাশ হওয়ার ব্যগ্রতার দানাগুলোই বিশ্বের আদি সত্তা। খোদার অসীম ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনার ফসল এ বিশ্ব জগৎ। এটি কোন দ্বৈব চিন্তা বা দ্বৈবক্রমে সৃষ্টি হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে, খোদার কথা বলার ব্যাপারটি আমাদের মতো নয় এবং শোনার বিষয়ও এমন নয়। এরূপ ধারণা সীমাবদ্ধতার ব্যাপার। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ঢেউ বা তরঙ্গের ন্যায় বিচ্ছুরিত হয়ে পরিকল্পনার নক্সার মতো সৃষ্টি হয়ে যায়। স্রষ্টার বেলায় বস্তু বা অন্যান্য উপাদান সৃষ্টি করতে কোন কিছুর মাধ্যম নেয়া প্রয়োজন পড়েনি, তিনি যেমন বস্তুর স্রষ্টা তেমনি তার উপাদানেরও স্রষ্টা।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার দ্বার প্রান্তে এসে আজ আমরা সেই সত্যের সন্ধান পেতে শুরু করেছি। আধুনিক বস্তুর সংজ্ঞায় এখন বস্তু কণিকার আকারেও থাকতে পারে আবার ঢেউ-এর ন্যায়ও থাকতে পারে। কালক্রমে বস্তু এখন কাল্পনিক ছায়ায় রূপ নিয়েছে। বস্তু যখন ঢেউ-এর আকারে থাকে তখনও তার মাঝে তার আদি গুণাগুণ বজায় থাকে। শোষণ ও বিকিরণের বেলায়ও বস্তুর মূল সত্তা ঢেউ বা তরঙ্গ ঝাঁকের ন্যায় চলে। বিজ্ঞানের নথিপত্রে এখন জড় আর চৈতন্য শক্তির মধ্যে খুব বেশি তফাৎ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই ধারণা শেষমেষ এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন সকল কিছু এক মহাশক্তি থেকে ফিরে এসেছে। তাঁরই প্রকাশের প্রেমবোধ থেকেই যেন এই জাগ্রত বিশ্বের সূচনা। ঢেউ থেকেই বিশ্বের যেন হলো সূচনা। ঢেউয়ে যেমন স্থির থাকা যায় না তেমনি এর সূক্ষ্ম অস্তিত্ব মনে স্থির করে নেয়া সম্ভব হয় না। তাই বিশ্বাসের মূল অনেকের হয়তো নড়বড় করতে পারে।

সৃষ্টি তার বাণিজ্য শেষ করে পূত পবিত্রভাবেই স্রষ্টার দিকে ফিরে যাবে সেটিই স্রষ্টার কামনা। কিন্তু ঢেউ-এর বেলায় যদি ফিরে যাওয়ার মতো কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে সে তো শুধু চলতেই থাকবে। তাই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা সৃষ্টির বিধানের আলোকে বৈধ। সেটি বৈধ হলেও তাকে অনুসরণ করা অন্য সৃষ্টির জন্য বৈধ নয়। পক্ষান্তরে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির সাথে আকার সৃষ্টির এক নিগূঢ় সম্পর্ক

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে। তাই দেখা প্রয়োজন এই প্রতিবন্ধকটি কি? এবং এর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক কতটুকু? তা না হলে শয়তানের (প্রতিবন্ধক) সাথে আমাদের পরিচয় উহ্য থেকে যাবে।

শয়তানের অস্তিত্ব

ভাবনাই মানুষের মনের খোরাক। এটি তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। আকাশ আর পাতালের মধ্যে যা কিছু আছে তা নিয়েই তারা চিন্তা করে। মানব মন কখনো কাজহীন বসে থাকে না। মন যখন ভাবনার আসরে বসে, তখন সেভাবে স্রষ্টা কেনইবা শয়তান সৃষ্টি করলেন? এই অভিশপ্ত শয়তান না থাকলে তো আমাদেরকে আর দোযখী হতে হতো না। খোদা কেনইবা এই শয়তান সৃষ্টি করতে গেলেন?

আমরা না বুঝে, না চিন্তা করে যতই ভাবি না কেন, শয়তানের জন্ম বা সৃষ্টি হওয়া অনর্থক নয়। শয়তান সৃষ্টি হওয়ার অনুকূলে সৃষ্টির সম্প্রসারণে ভালো-মন্দ যাচাই বাছাই করা এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়ার অন্তর্নিহিত গোপন ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে পরীক্ষা পাশের প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি। মাঠে বল খেলতে গিয়ে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি না হলে যেমন জয় পরাজয় হওয়াও চিন্তা করা যায় না। ঠিক তেমনি একথাও মনে রাখতে হবে যে, প্রতিপক্ষের নীতি কৌশল ও তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তার অনুকূলে খেলতে থাকলে জয়ের সম্ভাবনা হারাতে হবে। এ ক্ষেত্রে বরং প্রতিপক্ষের জয় অনিবার্য। পরিশেষে প্রতিপক্ষের মতোই তাকেও পুরস্কার পেতে হবে। আল্লাহ বলেছেন– "প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং দুনিয়াতে তোমাদেরকে সুখ-দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করব এবং এ ফলাফল লাভের জন্যে তোমাদেরকে আমাদের নিকটেই ফিরে আসতে হবে।" (সূরা-২১ : ৩৫)

"আল্লাহ জীবন ও মৃত্যু এজন্যে দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট।" (সূরা-৬৭ : ২)

"হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে, যেমন তোমাদের পিতামাতাকে বেহেশত হতে বের করেছিল। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ কেড়ে নেয়া হল এবং তাদের লজ্জাস্থান বে-আবরু হয়ে পড়ল।" (আল-কুরআন)

"শয়তান বলল, আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও। আল্লাহ বললেন যে, তোমার জন্য অবকাশ। শয়তান বলল, তুমি যখন আমার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছ তখন তোমার বান্দাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম হতে বিচ্যুত করবার জন্য ওৎ

www.nagorikpathagar.org

পেতে থাকব। তারপর সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান দিক, বাম দিক থেকে আক্রমণ করব। সুতরাং তুমি দেখবে তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে।

আল্লাহ পাক ইবলিসকে বললেন, এখান থেকে ঘৃণিত এবং বিতাড়িত হয়ে যা। যারা তোর অনুগত হবে তাদের সকলের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা হিজর)

সাদৃশ্য অসাদৃশ্যের গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ ব্যতীত যেমন কোন জিনিসের মান পরীক্ষা করা সম্ভব নয় তেমনি অন্ধকার ব্যতীত আলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করাও কঠিন। অপরদিকে শুধু উত্তমকে উত্তম বলে স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব নয় মন্দ ব্যতীত। সেজন্য সত্য ও উত্তমকে প্রকাশ করার জন্য অহঙ্কারী সৃষ্টি করা সৃষ্টি বিধানের আলোকে আবশ্যক ছিল। খোদার গুণাবলীতে অহংবোধ নেই। সরলতা ছাড়া গরলের কোন অস্তিত্ব নেই। অহঙ্কার অনুগত্য বিরোধী হয় এবং অহংবোধ লাগামহীন প্রবৃত্তির দাসত্বের বাহন। অহং শক্তি নিজকে ভাবে অসীম ও বুযুর্গ, কিন্তু তার মাঝে অসীমত্বের কোন বালাই নেই, নেই কোন বুযুর্গীর লেশ। তবে 'প্রবৃত্তি' সৃষ্টিকে সম্প্রসারণের উদার ভূমি। একে খোদার পথে বশ মানাতে পারলে সৃষ্টিতে উৎকর্ষতা আসে। কিন্তু শয়তানের পথে চললে, তার পরিণতি খারাপ দাঁড়ায়। শয়তান যেমন বাঁকা পথ ধরতে দ্বিধা করে না, বিপথগামীরাও তাই করে। এরা যা করে একেই মনে করে উত্তম। তারা অন্যের কথার চেয়ে নিজের কথার মাঝেই বেশি বুযুর্গী আছে মনে করে।

শয়তান যখন বাঁকা পথ ধারণ করেছিল তখন সৃষ্টির মাঝে নতুন দিগন্ত সূচিত হয়। এই শয়তান যদি প্রবৃত্তির পাগল না হতো তাহলে বিশ্বের সম্প্রসারণ ও তার উৎকর্ষতার দিগন্তপথ সূচিত হতো না। তবে এই শয়তান সৃষ্টি হওয়াতে সৃষ্টির কিছু অংশ যে বিপর্যয়শীল হবে এতেও কোন সন্দেহ নেই। ফলে শয়তান বলতে কোন কিছু আছে কিনা এ প্রশ্নের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। ধর্মের পরিসরে এ শয়তানকে আমরা যেভাবে চিনি, জানি, বিজ্ঞান ও দর্শনের পরিসরে এর কোন অস্তিত্ব আছে কি নেই, তাও চিন্তা ভাবনা করে দেখা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রেও যদি শয়তানের শয়তানী প্রমাণ হয়, তবে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ আবিষ্কার করা সহজ হবে।

এ বিশ্ব অসীম। এর কোন কিনার বা সীমানা নেই। কিনারা ব্যতীত কেউ মূলের দিকে ফিরে আসতে পারে না। কোন ঢেউ বা তরঙ্গ যদি কিনার না পায় তবে সেটি চলতেই থাকবে। শব্দের যেমন বাধা ব্যতীত প্রতিধ্বনি হয় না তেমনি বাধাহীন সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। সেজন্য একটি বাঁকা পথ

www.nagorikpathagar.org

বা কিনার সৃষ্টি করা স্রষ্টার সৃষ্টি বিধানে ভুল বলে কোন কথা নেই। এই কিনার বা বাঁকা পথ না থাকলে তরঙ্গ বা ঢেউ যেরূপ চলতে থাকে তেমনি আদমের অবস্থাও সেরূপ হতো। এখানে কিনার বা বাঁকা পথটি হলো শয়তানের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। শয়তান বাঁকা পথের অনুসারী হয়ে স্রষ্টার কাছে অবকাশ চেয়েছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল আদমের জাতকে তার আনুগত্যের ছোবল দিয়ে তার পথের অনুসারী করে নেবে। তখন আল্লাহ শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য মঞ্জুর করলেন জাহান্নাম।

খোদা আদমকে সৃষ্টি করে ফেরেশতা জাতিকে সেজদা করার হুকুম দিয়েছিলেন। এতে সকল ফেরেশতা সেজদা করলেও ফেরেশতার সরদার (জ্বীন জাতি থেকে পয়দা) আযাজীল তাঁকে সেজদা করেনি। তার সেজদা না করার কারণ ছিল অহংবোধ বা অহঙ্কার। ফলে সে খোদার নির্দেশ অবমাননাকারী হিসেবে অভিশপ্ত হলো। তখন থেকেই শয়তান, আদম ও আদমের জাতের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে লেগে আছে। আদম ও হাওয়া মানব জাতির আদি পিতা-মাতা। তাঁরা ছিলেন বেহেশতে। সেখান থেকে শয়তানের ফন্দি ফিকিরে প্রবৃত্তির দাসত্বের ছোবল খেয়ে বিতাড়িত হলেন নিম্ন জগতে। তখন থেকে এখনো আমাদের অন্তরে প্রবৃত্তির সেই ছোবল লেগে আছে। শয়তানের প্রবৃত্তি আর পশু প্রবৃত্তি একই স্তরের। মানুষের মাঝেও এই গন্ধ তখন থেকেই লাগানো। কিন্তু মানুষ যদি এ থেকে ধুঁয়ে মুছে পবিত্র হয়ে খোদায়ী প্রবৃত্তির দাসত্ব মেনে চলে তখন তার মধ্যে খোদায়ী গুণ পয়দা হয়। এতে পশু প্রবৃত্তির যাবতীয় গন্ধ, ময়লা, আবর্জনা থেকে সে পবিত্র হয়ে যায়। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির (আদম জাতের) যখন নীতিগত সম্পর্ক বজায় থাকে তখন শয়তান আদমের জাতের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এতে বরং শয়তান নিজেই জ্বলতে থাকে। কিন্তু সৃষ্টি যদি স্রষ্টার সাথে নীতিগত সম্পর্কছেদ করে, তখন ঐ সৃষ্টি থেকে পয়দা হয় শয়তানের জাত। এর ফলে শয়তানের গায়ে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। শয়তান হরহামেশা খোদার সাথে আদম ও আদমের জাতের নীতিগত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেষ্টা করে। মূলত শয়তান নিজের প্রবৃত্তির চেতনায় বিশ্বাসী। সেজন্য সে নিজের প্রবৃত্তির লালসা মিটানোতে ব্যস্ত থাকে। শয়তান চির অভিশপ্ত। আজীবন সে অনলে জ্বলবে। সে সর্বদাই লেগে আছে নারী-পুরুষ ও খোদায়ী শক্তির পেছনে। পরম করুণাময়ের অপার অসীম সৃষ্টির গোপন সাগরে শয়তান যে কোথায় কিভাবে থাকে বা আছে, সেটি বুঝা খুব কঠিন।

www.nagorikpathagar.org

আত্মার জন্য আত্মার জগত বা রূহানী জগত যেমন রয়েছে তেমনি এ দুনিয়ার জগৎ হলো জড় ও আত্মার সম্মিলিত জগৎ। শয়তান এ দুনিয়ার জগতেও আমাদের পেছনে লেগে আছে। সে শুধু আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে বেহেশত হতে নিম্ন জগতে নিয়ে এসেই ক্ষান্ত হয়ে থাকেনি। কিভাবে কোন দিক দিয়ে যে সে আমাদেরকে ছোবল দেয়, তা বুঝা বড় কঠিন। সে আমাদের পেছনে লেগে থাকাতে তার লাভ কি? নিশ্চয়ই এতে তার কোন না কোন স্বার্থ আছে। সে বাঁচার জন্যই হোক কিংবা তার দলবলের সমর্থন বৃদ্ধির জন্যই হোক, সে তার এন.জি.ও-র দপ্তর খোলা রেখেছে। স্বার্থ তো নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে সে এতো সাহায্য সহযোগিতাসহ প্রহরীর মতো লেগে থাকবে কেন? নিম্নের একটি উদাহরণ থেকে আমরা এর সত্যতার আভাষ পেতে পারি। যেমন, আমরা যদি গভীর দৃষ্টিতে একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে লক্ষ্য করি, তখন দেখতে পাব, এর ভেতরে আছে একটি Positive Phase, একটি Negative Phase ও একটি Neutral Phase। এ তিনটি Phase-এর সাথে লাগানো থাকে একটি কুণ্ডলীকৃত তার। কার্যত এ তিনটি Phase-এর সাথে কুণ্ডলীকৃত তারটি ধীর ভাবে লেগে থাকলে যখন তড়িৎ প্রবাহ-এর মধ্যে পতিত হয় তখন বাঁকা কুণ্ডলীকৃত মাধ্যমটি দিয়ে এক উজ্জ্বল সত্তার বিকিরণ হয়। কিন্তু এ কুণ্ডলীকৃত তারটি যদি একটির সাথে অথবা দু'টির সাথেও লেগে থাকে তবে এর ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল সত্তার বিকিরণ হয় না। অথচ লেগে থাকলে সেটির গা জ্বলে জ্বলে যে উজ্জ্বল সত্তা বের হয়ে আসে এর নাম আলোক। এ আলোক জড় পদার্থের মৌল আদানের গর্ভে বাস করে। তাই আলোক না হলে জড় পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার আশা করা যেত না। এখানে বাঁকা কুণ্ডলীকৃত মাধ্যমটি না থাকলেও আলোক বের হওয়ার পথ ছিল না। এই কিনার বা সীমানা না পেলে Positive Phase দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুধু চলতেই থাকত। সে কোন অবস্থাতেই Negative Phase-এর সাথে মিলিত হতে পারত না। অথবা এ System-এর বাইরে মিলিত হলে সৃষ্টির বিকাশ ঘটতো না। বিপর্যয় ও সংঘর্ষই লেগে থাকত। এই উদাহরণ থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির বিকাশের জন্য শয়তানের প্রয়োজন আছে।

আমরা যদি এ সাদৃশ্যমূলক ব্যাখ্যাটি স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের সাথে নীতিগত সম্বন্ধ অনুযায়ী সেট করি, তাহলে দেখব, জাগতিক বিশ্বের অস্তিত্ব দাঁড় করাতে শয়তানের অস্তিত্ব সৃষ্টি করা ছিল অপরিহার্য। এর সাথে সৃষ্টির উৎকর্ষতা, সৃষ্টির সম্প্রসারণ, সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়ার অতি রহস্যময় নিগূঢ় সম্পর্কযুক্ত। এ উদাহরণ থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টির অস্তিত্বের সূক্ষ্ম পর্দায় নিশ্চয়ই

www.nagorikpathagar.org

শয়তান নামের এক বাঁকা কু-মন্ত্রণাকারী বসে আছে। সে আসলেই সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে নীতিগত সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়। জড় পদার্থের পরমাণুর কাঠামোর ভেতরে শয়তানী সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এক ধরনের কণার আনাগোনা করতে দেখা যায়। বিশ্বসৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন কোথাও একে অপরের সাথে আত্মিক সু-সম্পর্ক বা দ্বন্দ্ব আছে তেমনি বস্তুতেও তাত্ত্বিক দিক থেকে সেই রূপই সুষম সম্পর্ক বা দ্বন্দ্ব বিরাজমান।

পরমাণুর ভেতরে শয়তানী সত্তার যে আনাগোনা সেটিও বস্তুতাত্ত্বিক সু-সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের আওতায় পড়ে। এ বিষয়টির একটি বাস্তব ব্যাখ্যা শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে পারে। শয়তানকে চোখে দেখা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি হাতে ধরাও সম্ভব নয়। তাই একে কিছু রূপক ও সাদৃশ্যমূলক ব্যাখ্যা দিয়েই প্রমাণ করতে হবে। তার দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীকে হাজির করে তাদের জবানি শুনেই তার খোঁজ খবর রাখতে হবে। আমাদের চারপাশে আছে বস্তু বা পদার্থ। আমাদের দেহ ভুবনটিও বস্তু বা পদার্থের সমষ্টি। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ চারটি মৌলিক কণা দিয়ে গঠিত। এ চারটি কণা হলো নিউট্রন, প্রোট্রন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো। একটি পরমাণুর ভেতরের নিউট্রন ও প্রোটনের চারপাশে ইলেকট্রন কণিকা থাকে সর্বদা ঘূর্ণায়মান। অপর দিকে নিউট্রিনো তার নিজস্ব বিপরীতমুখী বল দ্বারা অন্যান্য কণাকে তার দিকে টানতে চেষ্টা করে। পরস্পরের বিপরীতমুখী আকর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে পরমাণুর আকৃতি। আমাদের দৈহিক সত্তার মাঝে অগণিত পরমাণুর দানা ইটের সারির মতো স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। এ কাঠামোটি তেজদীপ্ত আত্মার আত্মিক ক্ষমতা বলে জীবন্ত থাকে। মূলত আত্মিক সত্তা সৃষ্টির কৌশলের সাথে দেহ সত্তা সৃষ্টির একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। আত্মা যদি কখনো রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এতে তার প্রভাব দেহের ওপরও চাপ সৃষ্টি করে। সেই সাথে দেহ যন্ত্রও বিকল হতে বাধ্য হয়। এসব যোগসূত্র ও সম্পর্ক এটাই প্রমাণ করে যে, আত্মিক সত্তার সৃষ্টিগত কৌশলের সাথে দৈহিক সত্তা সৃষ্টির সম্পর্ক না থেকে পারে না।

আত্মিক পর্যায়ে শয়তানের সাথে আদম (আ) বিবি হাওয়া ও খোদায়ী শক্তির রয়েছে বৈরী সম্পর্ক। শয়তান নীতিগতভাবেই মানব গোষ্ঠিকে তার শিষ্যত্ব বরণ করার জন্য আকর্ষণ করে বা টানে। এতে সে খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী বল প্রয়োগ করে সকলের ক্ষেত্রেই। দৈহিক সত্তার ভেতরে নিউট্রিনোর প্রসঙ্গটিও তেমনি। এখানেও নিউট্রিনো সবার বিরুদ্ধাচরণ করে। তাই শয়তানী কার্যকলাপের সাথে নিউট্রিনোর চরিত্রের সম্পর্ক আছে মনে হয়। মানব মনের

www.nagorikpathagar.org

কর্মপ্রেরণা বা অভিব্যক্তির রূপায়ণ ঘটে তার অঙ্গের মাধ্যমে। অঙ্গ যখন মনের আবদার পালন করে তখন অঙ্গের পরমাণুর গা ভেদ করে কিছু কর্মশক্তি বিকিরণ হয়। কে জানে কু-প্রবৃত্তির দাসত্বের বশে কোন কর্ম সম্পাদন করলে পরমাণুর গা ভেদ করে খারাপ কিছু তৈরী হয় কিনা?

ধর্মের ভাষায় 'গোনাহ' একটি পাপসত্তা। এর রূপ চরিত্র অনুজ্জ্বল ও দুষ্কৃতিপূর্ণ। আমাদের দেহের পরমাণু নামক বাল্বের ভেতরে নিউট্রিনোর বিধান ও চরিত্র যদি বৈদ্যুতিক বাল্বের কুণ্ডলীকৃত তারটির অনুরূপ হয় তবেই এর সাথে শয়তানের সূক্ষ্মাতীত দেহের সম্পর্ক থাকতে পারে। শয়তান যেমন মানুষের মনে ছোবল দিতে পারে তেমনি দেহের শিরা, উপশিরা দিয়েও হাঁটতে পারে। তার সূক্ষ্ম দৈহিক আবরণ কি আমাদের দেহ কোষে জাল পেতে রেখেছে কিনা, তা কেমন করে বলি। তবে সব ক্ষেত্রেই যেহেতু তিনের সাথে একের দ্বন্দ্ব বা বিপরীত সম্পর্ক আছে দেখা যায় সেহেতু নিউট্রিনো হয়তোবা দেহাবরণের মাঝে শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমরা কোন বিষয়ই চূড়ান্ত করতে পারি না। কারণ শত চেষ্টা করলেও আমাদের দেখার ও জ্ঞানের আপেক্ষিকতার মোহ দূর করা সম্ভব হয় না। তাই সকল বিষয়ের চূড়ান্ত পরিমাপ আল্লাহই ঠিক করতে পারেন। তিনিই সকল বিষয়ে হাফেজ।

এ বিশ্ব চিরন্তন নয়। এর শুরু ও শেষ আছে। বিজ্ঞানীগণের বিশ্বাস এ সুন্দর সৃষ্টি কাঠামো একদিন নিউট্রিনোর বিপরীতমুখী আকর্ষণের ফলে প্রলয়ের চেতনায় উন্মাদনা শুরু করবে। তখন শব্দবোমা বিস্ফারিত হবে। শিঙ্গার প্রচণ্ড ধ্বনিতে চারদিক কেঁপে উঠবে। পাহাড়, পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়ে যাবে। আকাশ সেদিন বিকল হয়ে পড়বে। পানিতে আগুন ধরে যাবে। অতঃপর সকল কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে রেণু রেণু হয়ে পড়বে। কিন্তু কোন কিছুই শেষ হয়ে যাবে না। পানি থেকে বাষ্প যেমন আকাশে উড়ে বেড়ায় তেমনি হয়তো এ বিশ্বের অবস্থা আরও রেণু-রেণুতে পরিণত হবে। তারপর সেই সুপ্ত বীজতলা থেকেই নতুন বিশ্ব গজিয়ে উঠবে। আজ পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, রোগ-বালাই-এর উপাদান এক সাথে বা পাশাপাশি চরিত্র নিয়ে একই ঘরে বসবাস করে। কিন্তু বর্তমান প্রকৃতির নিয়ম-নীতি অচল হলেও সেদিন এর কোনটিই ধ্বংস হবে না। বরং ভালো জায়গায় ভালো চলে যাবে আর মন্দ ও কষ্টের জায়গায় শুধু মন্দ ও কষ্টরাই থাকবে। সেদিন শয়তান ও তার দলবলকে দুষ্কৃতির রাজ্য আকর্ষণ করে উদরে টেনে নেবে।

www.nagorikpathagar.org

সেদিনের বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের যেমন বাস্তব ধারণা নেই তেমনি বিশ্বের আদি অবস্থা কেমন ছিল তাও আমরা বলতে পারি না। অথচ আমাদের মন আদি গোড়া খোঁজার উস্তাদ। আমরা অনেক সময় অনেক কথা ভাবি যার কোন আদি বা শেষ থাকে না। একথা জানা থাকা সত্ত্বেও কেন জানি আমাদের মনে উদয় হয় আল্লাহর আগে কি ছিল? কিন্তু যার আদি বা শেষ নেই সেখানে কিনার খোঁজাও বোকামীর লক্ষণ। তবে সসীমের (মানুষের) মনে এ প্রশ্নও আল্লাহকে অসীম প্রমাণ করে।

আল্লাহ্ই অনাদি সত্তা

দুই বা ততোধিক মানুষ যদি একত্রে দৌড় শুরু করে তখন কে আগে, কে পরে তা বলা সম্ভব। পৃথিবীতে সন্তানের জন্মের আগে পিতা-মাতার জন্ম হয়। তাদের আগে তাদের পিতা-মাতার জন্ম হয়। এভাবে চলতে চলতে তার একটা আদি বা শেষ পাওয়া যায়। কিন্তু সকল আদির আগে কে বা কি ছিল, এ ধরনের প্রশ্ন করলে তার কোন উত্তর দেয়ার থাকে না। এ ক্ষেত্রে বরং সমাধান হবে সকল আদিরই এক ও অভিন্ন চিরন্তন মূল অনাদি বলতে এক পরমসত্তা রয়েছে। যার আগে কল্পনা করার কিছু নেই। তবু আমাদের মন অনন্ত অরণ্যের সীমাহীন শূন্য সাগরে হারিয়ে যেতে যেতে তারও কিনার পাওয়ার চেষ্টা করে। অথচ এসব চেষ্টা, তদ্বীরের কোন অনন্ত নেই, শেষ নেই। যার শেষ নেই, সেখানে অসীম বিরাজ করে। অসীমকে না জানতে পারলে মানুষের ভাবনার সীমা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ সসীম হলেও তার ভাবনার ডানা থাকে অসীমের দিকে প্রসারিত। মানুষের এই চেতনাবোধ নিজ জাতি সত্তার প্রকৃতির বিধানের রহস্যময় লীলাখেলা। এই শক্তিই অসীমকে পাওয়ার রাস্তা ধরিয়ে দেয়। সেজন্য মানুষের মনে আল্লাহ আছেন কি নেই, কিংবা তাঁর আগে বা পরে কি ছিল, এসব অন্তহীন রহস্যের কথা বা প্রশ্নের উদয় হয়। এই জিজ্ঞাসা মানুষের প্রকৃতি সুলভ স্বভাব। মানুষ যে প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রকৃতি স্রষ্টার কুদরতে গড়া। এর মধ্যে দৈবের কোন হাত নেই, ডারউইনের বিবর্তন নীতির কোন লেশ নেই। কুরআন মাজীদে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

"যে প্রকৃতির উপর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সেটিই আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি।" (আল-কুরআন)

আল্লাহর প্রকৃতির সাজানো স্বভাব থেকেই আমরা পেয়েছি অজানাকে জানার স্পৃহা, প্রভুপ্রীতি, আশার অসীমত্ব, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি। সেজন্য

www.nagorikpathagar.org

মানুষ হিসেবে আমরা অসীমকে জানতে চাই। তাঁর ঠিকানা খুঁজি। অসীম পর্যন্ত ভোগ করতে চাই। চাই সাগরের মতো কূলহীন যৌবন। চাই প্রেম-ভালোবাসার অসীম দরিয়ায় আজীবন সাঁতার কাঁটতে। চাই না কখনো বার্ধক্য কিংবা রোগ ব্যাধি। চাই অসীম সুখ, পরম শান্তি। সুস্থ বিবেকে চাই প্রভুর পদতলে আপাদ মস্তক অবনত রাখতে। সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য জানার ইচ্ছা এবং তার সঠিক সন্ধান পাওয়ার মাঝে মানব জীবনের পরম সুখ-শান্তি, আনন্দ-ভালোবাসা সবই নিহিত।

শিশু যখন দোলনার জীবন পাড়ি দিয়ে বয়সের তরী বেয়ে যৌবনের দিকে এগুতে থাকে তখন তার মনের নিভৃতকুঞ্জে এক অজানা প্রশ্ন এসে ভিড় করে। সেভাবে এই সুন্দর পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র, এই আকাশ কে বানাল? ভাবনার অসীম সাগরে যেখানেই ঠাঁই পাওয়ার জন্য নোঙ্গর করা যায়, সেখানেই অনেক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব পথের সাদৃশ্যহীন, অযৌক্তিক মতাদর্শ তার প্রশ্নের সামাধানকে আরও ভারী করে ফেলে। তখন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির তাড়নায় অনেকের আরও জানার স্পৃহা জাগে। সেই স্পৃহা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মনের আঙ্গিনা প্লাবিত করে। তার কলকল রব বেতার তরঙ্গের মতো মনের নিভৃতে সত্যের সন্ধান দ্বিতে থাকে। এই পথ ধরে এগুতে থাকলেই এক সময় স্রষ্টার পরিচয় জানা হয়। তাঁর নৈকট্য, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার স্পর্শে মন হয় উদার। ফলে মানবিক ক্রিয়াকাণ্ড হয় আর্দশিক। তাই নৈকট্য-প্রীতি মানুষের সহজাত স্বভাব। সেজন্য স্বামী চায় স্ত্রীর ভালোবাসা, স্ত্রীও চায় স্বামীর আদর। সন্তান চায় পিতা-মাতার স্নেহ। প্রজা চায় রাজার করুণা। রাজা চেষ্টা করে প্রজার শান্তির পথ আবিষ্কার করার। এসবই মূল স্বভাবের অংশ। কিন্তু তার আসল কাজ হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক বের করে মুক্তির পথ তালাশ করা।

যারা প্রকৃতপক্ষেই সঠিক পথের সন্ধান পান তারা স্রষ্টার মারেফাত (তত্ত্ব জ্ঞান) লাভ করেন। কিন্তু এরপরও অনেকের জানার স্পৃহা ফুরাতে চায় না। আরও জানতে চায়, আরও বুঝতে চায়। এভাবে আরও জানতে গিয়ে অনেকের মাথায় জাগে এক অদ্ভুত চিন্তা। এই চিন্তার ফাঁদে পড়লে মানুষ অসীমের কিনার না পেয়ে নিজেই হয়ে যায় বন্দি। কিন্তু মানুষের স্বভাব বন্দিশালা মেনে নিতে চায় না। তাকে সেখান থেকে বের হতে হবে, কে যেন বারবার তাগাদা করে। সময় অসময় এই চিন্তার বোঝা মাথায় ভাবনার পাহাড় তুলে দেয়। সে ভাবনা আর কিছু নয়, এ যেন এক কিনারাহীন সাগর। তবু মানুষ কেন জানি তা জেনেও তার কিনার খোঁজে, ভাবে আল্লাহর আগে কি ছিল?

www.nagorikpathagar.org

মানুষের মনে কেন এই চিন্তার উদয় হয়? কেনই বা মানুষ মাকড়সার মতো ছোট্ট একটি পরিসরে বাস করে একের পরে আরও কিনার খোঁজে? সে আর এক রহস্যের কথা। কেউ যদি প্রশ্ন করে এক কোটির আগের সংখ্যাটি কতো? যে কেউ এক কোটি থেকে এক বাদ দিয়ে তার উত্তর দিতে পারবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে তার আগে কি ছিল জিজ্ঞেস করা হলে প্রতিবারই এক বাদ দিয়ে তার উত্তর দেয়া যাবে। কিন্তু শেষাবধি একের মাথায় এসে জিজ্ঞেস করা হলে এর তো আর সংখ্যার মানে (মূল্যশীল) কোন উত্তর দেয়া যাবে না। কেন দেওয়া যাবে না, সেকথা আমাদের অজানা নয়। আমরা জানি একের আগে কোন মূল্যশীল সংখ্যা নেই। তাই 'এক' হলো সকল মৌলিক সংখ্যার আদিমূল। এই 'এক' কোন যোগফল বা সমষ্টির ধার-ধারে না। আবার 'এক' (১) কে ভগ্নাংশের আকারে প্রকাশ করলেও তার কোন মৌলিকত্ব থাকে না। এরূপ চিন্তা করাও অযৌক্তিক। তবু এরপরও কেন জানি আমরা ভাবি। অথচ এই ভাবনার যেখানে শেষ সেখানে পাওয়া যায় শূন্য (০) কে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই শূন্যের কোন Value নেই। নেই এর কোন কার্য-কারণ ভিত্তি।

একটি শূন্য যেমন মূল্যহীন তেমনি কোটি শূন্যও মূল্যহীন। অর্থাৎ শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসা অবাস্তব। এর কোন মৌলিকত্ব নেই। কারণ ০ (শূন্য) কে ভাঙ্গলে যেমন তার ভেতরে একের (১) অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি ০ + ১ = ১, এই এক (১) ভাঙ্গলেও (০) শূন্যের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। তাকে যত ভগ্নাংশেই রূপান্তরিত করা হোক না কেন, এক (১) এর ভেতর থেকে শূন্যকে আর প্রসব করানো সম্ভব নয়। কিন্তু এক (১) থেকে যদি দুই (২) সংখ্যাটি অস্তিত্ব লাভ করে, তাহলে তার মাঝে একের মৌলিকত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে।

যেমন ২ = ১ + ১। পক্ষান্তরে এক (১) যদি নিজের মৌলিকত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগত অস্তিত্ব ঠিক রেখে নিজের বুৎপত্তি ক্ষমতা বলে অনস্তিত্বের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের সৃষ্টির সূচনা করতে পারে তাহলেই সেটি হবে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা।

কিন্তু সেই 'এক'ও হতে হবে নিরাকার ও চিরঞ্জীব। কারণ এক যদি আকারশীল হয় তাহলে তার পক্ষে নিজের আকার ঠিক রেখে দ্বিতীয় আকার সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব, তেমনি এতে প্রজ্ঞার পরিচয় থাকে না। আমরা যদি আকারের ধারণায় মনে করি, এই বিশ্বের পরম সত্তা সূর্যের মতো। তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে, আকারের মাঝে তো গতি বিরাজ করে তাহলে এই গতির স্রষ্টা কে? একটি গাড়ি স্থির থাকলে তার কোন চালক ও তেল-মবিল প্রয়োজন হয় না। যখন গতিশীল হয় তখনই তার চালক ও খাদ্যের দরকার হয়। প্রত্যেক আকারের ভেতর নিত্যই

www.nagorikpathagar.org

গতির খেলা চলছে। যে জিনিস গতিশীল সে জিনিস ক্ষয়শীল। গতিশীল জিনিসের মাঝে-ক্ষয় বৃদ্ধি, ঘুম-নিদ্রা-বিশ্রাম ইত্যাদি সবই থাকে। সেদিক থেকে সূর্য তার শক্তি ক্রমে ক্রমে বিকিরণ করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তাই স্রষ্টার বেলায় এরূপ গুণ থাকা যুক্তিহীন। আল্লাহ্ অবয়বহীন ও চিরঞ্জীব। তাঁর বেলায় ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কোন উপমাই চলে না। মৃত্যু, ক্ষুধা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু গতিশীল আকারধারী জিনিসের বেলায় অবয়বহীন ও চিরঞ্জীবি হওয়া তার সত্তাধীন নয়। অর্থাৎ গতিশীল জিনিসের স্থায়িত্ব তার নিজের হাতে নয় কিংবা এককভাবে সে কোন জিনিসের স্রষ্টাও হতে পারে না। সকল ক্ষেত্রে সে মুখাপেক্ষী থাকে। বরঞ্চ এসব জিনিসের একজন স্রষ্টা ও চালক থাকতে হবে। তাই সূর্যের মতো জিনিস কেন, কোন গতিশীল সত্তাই স্রষ্টা হওয়ার দাবী করতে পারবে না। কেউ এরূপ চিন্তা করলে তা হবে যুক্তিহীন। যিনি গতিশীলও নন, আকারশীলও নন, তিনি চিরঞ্জীব ও অবয়বহীন, তিনিই এই গতির জগতের স্রষ্টা ও চালক। পাক কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ সূর্য সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন চাঁদ ও তারা। আর এসবই আইনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা-৭ : ৫৪)

বিশ্বের সকল আকারশীল জিনিস মাত্রিক বস্তু। আকারের প্রশ্ন আসলেই তার কিনার থাকে, তাকে ছোঁয়া যায়, স্পর্শ করা যায়, ওজন করা যায়। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, উচ্চতা ও ওজন মাপা যায়। তার সাদৃশ্যও থাকে। এক মুষ্টি খামিরকে না ভেঙ্গে যেমন দুই বা ততোধিক কিছু বানানো সম্ভব নয় তেমনি– স্রষ্টা আকারশীল হলে তার পূর্বের আকার ঠিক রেখে অন্য আকার সৃষ্টি করারও সীমাবদ্ধতা এবং পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকে। এসব যুক্তি প্রমাণের সিদ্ধান্ত হলো বিশ্বের আদি সত্তা ছিল নিরাকার ও স্থির। অপরদিকে নিরাকারের কোন মাত্রা থাকে না। মাত্রাহীন সত্তা একের অধিক হতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদির মাত্রা বা কিনার আছে। যেগুলোর কিনার আছে সেটি হয় আকারশীল। অন্যদিকে আকারশীল জিনিস ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু যে সত্তার কিনার নেই, সে সত্তা নিরাকার থাকে বলে সেই সত্তা একের অধিক হতে পারে না। কারণ কিনার ছাড়া কোন জিনিসকে পার্থক্য করা সম্ভব নয় বিধায় একাধিক্য প্রমাণ করা যায় না। সে সত্তা একাধিক্যও হয় না। অতঃপর এ ব্যাখ্যা বিশ্বের 'অনাদি সত্তাকে' নিরাকার ও একক বলে প্রমাণ করে। মূলত নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহই কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীত নিজ ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে এই অস্তিত্বশীল বস্তু জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এর মূল উপাদান অনস্তিত্ব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অনস্তিত্ব জগতের কোন আকার আকৃতি নেই। এ জগৎ ও তার বাসিন্দারা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে বলেই তাদের মনে অনেক সমস্যা বা প্রশ্ন উদয় হয়। আমরা ভাবি এ বিশ্বের প্রাকৃতিক উপাদান কোত্থেকে এলো? এর মনোরম শোভা, বিচিত্র রূপ, গন্ধ ইত্যাদি আমাদেরকে কোন সময় ভাবনাহীন বসে থাকতে দেয় না। মিস্ত্রি কাঠ, লোহা ব্যতীত চেয়ার টেবিল বানাতে পারে না। কুমার মাটি ছাড়া হাঁড়ি তৈরী করতে পারে না। শিল্পী তুলি আর রঙ ব্যতীত ছবি আঁকতে পারে না। সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনবোধ হয়। কিন্তু স্রষ্টার বেলায় কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। তিনি মুখাপেক্ষীহীন।

মূলত তিনি এই উপাদান কোথা হতেও আমদানী করে আনেননি। এই উপাদান পরম সত্তার অভিব্যক্তির বিচ্ছুরিত রূপ। নিরাকারের অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। তবু আমাদের মনে স্রষ্টার অস্তিত্বের (আকারতুল্য) যে ধারণা আসে তা মূলত জড়ত্বের গুণ। কারণ প্রতিটি জড় সত্তার কিনার থাকে বিধায় সে আগে পরের চিন্তা করে। আসলেই কিনার বিশিষ্ট রেখার আগে-পরে কিছু আছে বা ছিল বিধায় কল্পনা করার থাকে। অথচ যার কিনার আছে সে জিনিসের পূর্ণতা নেই। সে কারণে সে শুধু ভাবতেই থাকে।

আমাদের এই জ্ঞান ইউক্লিডের জ্যামিতিক ধারণার মতো। তিনি মনে করতেন একটি সরলরেখা দ্বারা কোন স্থানকে আবদ্ধ করা যায় না। অথচ দেখা যায় একটি রেখা পূর্ণতা লাভ করলে সেটি একটি বিন্দুতেই মিলিত হয়। তখন পুরো স্থানটি গোলক আকৃতি ধারণ করে। সেজন্য পরিপূর্ণ বিশ্বের কোন কিনার নেই, তাতে সরলরেখা টানা যায় না। ফলে গোলক প্রকৃতির বিশ্বে স্রষ্টার আগে-পরে কি ছিল তা ভাবাই অবাস্তব। এরপরও যদি কেউ মনে করে এক এর আগে শূন্য ছিল। তখনও প্রশ্ন দেখা দিবে শূন্য থেকে 'এক' আসলো কি করে? আমার বিশ্বাস এর কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। আগেই বলেছি শূন্য হলো মূল্যহীন ও অসার। এর কোন কার্যকারণ ভিত্তি নেই। সে কারণে আল্লাহর আগে কি ছিল সে ধারণা পরিত্যাগ করে, স্বীকার করতে হবে এই বিশ্বে অনাদি হতে মুখাপেক্ষীহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ যিনি বিরাজমান ছিলেন, তিনি এক আল্লাহ।

সূরা ইখলাছে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"বল (হে মুহাম্মাদ) তিনি আল্লাহ যিনি এক ও একক। আল্লাহ কারো উপর নির্ভরশীল নন, সমস্ত কিছু তাঁর উপর নির্ভরশীল, তিনি জন্ম কাউকে দেন না; জন্ম গ্রহণও করেন না, তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই।" (সূরা আল ইখলাস : ১-৪)

www.nagorikpathagar.org

তিনি বস্তু বা পদার্থ নন। তিনি নিরাকার ও চিরঞ্জীব। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি শরীরিও নন। বস্তু তাঁর অস্তিত্বের কোন বাস্তব রূপ নয়। এ বিশ্বভুবনে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সকল কিছুই তাঁর ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ বা অভিব্যক্তির ফল। তাঁর ইচ্ছা শক্তির বিচ্ছুরিত সত্তাই 'নূর'। এই 'নূর' প্রকাশ হওয়ার আগে বিশ্ব ছিল অনস্তিত্বশীল। তখন এক আল্লাহর অধীনেই ছিলএ বিশ্বমণ্ডল। বস্তু ও তার উপাদান স্রষ্টার অভিব্যক্তির ফল। তাঁর অপার মহিমায় স্থির বিশ্বে 'নূরের' ঢেউ জাগে। এ থেকেই এই বিশ্বের অঙ্কুর গজায়, বিকাশ শুরু হয়। স্রষ্টার মহামহিমায় বিবর্তনের ধারায় এর মাঝেই প্রাণ মননশীল চৈতন্য শক্তির আবির্ভাব হয়। সেই বিবর্তন উদ্দেশ্যমুখী চিন্তার ফল। জড়সত্তা ও প্রাণসত্তার সমন্বয় সৃষ্টির পূর্ণতার বহির্প্রকাশ। সৃষ্টিতে সৃষ্টিধর্মী চেতনার গুণাগুণ তৈরী করার জন্য স্রষ্টার এই প্রচেষ্টা। সে সূত্রেই মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি।

মহা প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন– "সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে পরিমাণে ও অনুপাতে।" (সূরা ৫৪ : ৫৪)

"আল্লাহই প্রত্যেক জিনিসকে এর আকার ও প্রকৃতি দান করেছেন।" (সূরা ২০ : ৫০)

জগতের সকল কিছুতে যখন নিঝুম অবস্থা বিরাজ করছিল তখন আকার, গতি, দৃশ্য, অদৃশ্য উপাদানের তৈরী জগৎ বলতে কোন কিছুই ছিল না। সে অবস্থায়, নিরাকার, চিরঞ্জীব, একক ও অদ্বিতীয় মহামহিয়ান পরম দয়ালু আল্লাহই ছিলেন সেই অসীম রাজ্যের মালিক। তিনি সৃষ্টিজাত নন কিংবা দৈবক্রমেও তিনি আবির্ভূত হননি। সেই সাথে এ সৃষ্টি জগৎ কোন দৈব ঘটনা থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি। তখন জগৎ ও দুনিয়ায় সৃষ্টির কোন উপাদান আদি হতে মওজুদ ছিল না। বিশ্বের সকল পদার্থ ও শক্তি কোন দৈব ঘটনা থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি হয়নি এবং পদার্থের আদি মৌল ও তার গতি চিরন্তন নয়।

পক্ষান্তরে বিশ্বের মোট শক্তিরও নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। এ বিশ্ব সবর্দাই সম্প্রসারণশীল, কিন্তু এর নিত্য নতুন চাহিদা কোন মওজুদ ভাণ্ডার থেকে পূরণ করা হয় না। সৃষ্টির অভাববোধ স্রষ্টার নির্দেশেই পূর্ণ হয়। স্রষ্টার নির্দেশ নূরের শ্রেণীভুক্ত। সেজন্য সৃষ্টির সম্প্রসারণের উপাদান কোথাও হতে আমদানী করতে হয় না। সময় ও আকারের (বস্তুর) কোন বাস্তব উপাদান নেই। গতি ও ঢেউ-এর মৌলিক সত্তা। কিন্তু বিশ্বে আদি অবস্থায় গতি দিয়ে ছেড়ে দেয়ার মতো কোন উপাদানও ছিল না। এই উপাদান নিরাকার আল্লাহর সৃষ্টি প্রেমের জাগ্রত রূপ, তাঁর অভিব্যক্তির প্রকাশ।

www.nagorikpathagar.org

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) লিখেছেন 'ইসলামী মতে আল্লাহ নিরাকার অর্থাৎ অবয়বহীন। তিনি কোন বস্তু বা পদার্থরূপে নিজকে ব্যক্ত করেন না। এই বিশ্ব তাঁর সত্তার বাস্তব প্রকাশ নয়। তা শুধু তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। কাজেই ইসলামে প্যানথিজমের (Pantheism) স্থান নেই। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইসলামের আল্লাহকে কার্পেন্টার হড বলে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু কার্পেন্টার বস্তু গড়ে কতকগুলো উপাদান দ্বারা।' যার স্রষ্টা সে নিজে নয়। ইসলামের আল্লাহ শুধু স্রষ্টা নন। তিনি বস্তুর যাবতীয় উপাদানেরও স্রষ্টা। যখন জগৎ বলতে কোথাও কিছুই ছিল না সেই নিগূঢ় অনস্তিত্ব বা শূন্যতা থেকে তিনি সবকিছুর বিকাশ ঘটালেন, তাঁর বিরাট ইচ্ছাশক্তি দ্বারা। তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন শুধু ইচ্ছা করেন, 'হও' এমনি তা গঠিত হয় : 'কুন ফাইয়াকুন'। এই গঠনের অর্থ অনস্তিত্ব জগৎ থেকে অস্তিত্বের জগতের রূপ লাভ করা। (ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা)

বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা ও তার আদি অবস্থা কেমন ছিল এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের কোন সর্বজনগ্রাহ্য অভিমত নেই। তবে যেগুলো আছে সেগুলোও অনুমান ভিত্তিক, কল্পনায় সাজানো। আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে-সুদূর অতীতে এই বিশ্বের পদার্থ ও শক্তি অতি উচ্চ অভ্যন্তরীণ চাপে ও তাপে একটি ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ ছিল। এই আবদ্ধ ভর-শক্তি প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ চাপের দরুন এক প্রচণ্ড আদি বিস্ফোরণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তখন থেকেই বিশ্বের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ফলে সেই থেকে তা সম্প্রসারণ লাভ হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই। কারণ তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা যায় প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্বের এই পদার্থ ও শক্তি এলো কোত্থেকে? পজেটিভ ও নেগেটিভ আদান সৃষ্টি হলো কিভাবে? বিজ্ঞানীগণ এর উত্তর দিতে অপারগ। তবে তাদের ধারণা থেকে বুঝা যায় স্থান, কাল ও বস্তু স্বাধীন অস্তিত্ব বিশিষ্ট্য এবং তা পূর্ব থেকে কোথাও ছিল। কিন্তু বস্তু যে মাত্রিক জিনিস, স্থান কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত, ফলে এর স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। কারণ বস্তুর আকার ও গতির সম্বন্ধ চিরন্তন নয়। চিরন্তন হলেই নিরাকার ও একক হতে হবে। এরূপ হলে তার আগে পরে কল্পনা করার কিছু থাকবে না। কিন্তু বস্তুর আকার থাকায় তা অনন্ত অসীম নয়। সে সূত্র থেকেই এক অনন্ত অসীম নিরাকার ও চিরঞ্জীব মহা শক্তিমানকেই আমরা আল্লাহ বলি। সুতরাং আল্লাহর আগে কি ছিল তা ভাবার কোন হেতু নেই। এরূপ চিন্তা করাও অবাস্তব।

আল্লাহকে বাস্তবে দেখতে পারি না বলে অনেক অবাস্তব চিন্তা এসে মনে ভিড় করে। যুক্তি প্রমাণের কাছে অনেক সময় অনেক অবাস্তব ভাবনাও কেটে যায়। আল্লাহ নিরাকার তা চিরন্তন সত্য। কিন্তু আল্লাহকে দেখতে পাওয়া কি সম্ভব?

www.nagorikpathagar.org

সত্যি কথা বলতে কোন বাধা নেই, মানা নেই। তাই বলতে হচ্ছে আল্লাহ্‌র যেহেতু কোন বাড়ি-ঘর নেই অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু আমাদের মতো বাড়ি-ঘর নিয়ে বাস করেন না, সুতরাং তাঁকে দেখা খুব রহস্যময়। পৃথিবীর বেলায় তিনি রহস্যময়। কারণ তাঁকে দেখে এখানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব যে দেখা যাওয়ার মতো তা বাস্তবে প্রমাণ করা কঠিন কিছু নয়। মহাপ্রভু কাল হাশরে বেহেশতবাসীদের সামনে তাঁর নূরের পর্দা উন্মোচন করে দেবেন। সেদিন বেহেশতবাসীগণ খোদার পরম সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে খানাপিনা ছেড়ে বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে কাটিয়ে দিবেন এক মহাযুগ। তাই আল্লাহ অদেখার কিছু নয়। পৃথিবীতেই শুধু তাঁকে দেখা কঠিন।

আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব?

আল্লাহকে দেখা যাবে কি যাবে না এরূপ চিন্তা অবশ্যই মানুষের মনে জাগতে পারে। কোন অবুঝ শিশু যদি পিতার কাছে প্রশ্ন করে, বাবা বাঘ দেখতে কেমন? পিতার পক্ষে এর সাদৃশ্যমূলক উত্তর হবে, বাঘ দেখতে অনেকটা আমাদের পোষা বিড়ালটির মতো। কিন্তু ঐ ছেলে যদি প্রশ্ন করে, বাবা বাতাস দেখতে কেমন? এখন কিন্তু পিতার পক্ষে উত্তর দেয়ার মতো সাদৃশ্যের কোন উপাদান পৃথিবীতে নেই। বাতাস পদার্থ হলেও একে খালি চোখে দেখা যায় না। ফলে একেও আমাদের দৃষ্টিতে নিরাকার মনে হয়।

মানুষ যখন নিরাকার আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে তখন তার ধ্যানে নিরাকারের অস্তিত্ব হয়তো আকারতুল্যই মনে হয়, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন ভাসে। এরূপ হওয়া জড়ত্বের গুণ। কিন্তু নিরাকার আল্লাহ এসব গুণ থেকেও মুক্ত। আমাদের ধ্যানে নিরাকারের অস্তিত্ব যতই অস্তিত্বহীন মনে হোক না কেন, তবু আল্লাহর কুদরতি রূপ অদেখার কিছু নয়। আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং জড়ত্ব বোধের জন্য নিরাকারের রূপ ও তাঁর বাহ্যিক দর্শনীয় অস্তিত্ব এবং রূপ-প্রকৃতি বুঝা খুব কঠিন। তাছাড়া আল্লাহর সাদৃশ্যমূলক কোন অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে না থাকায় তাঁর রূপ সম্পর্কে বর্ণনা করা অন্ধের হাতি দেখার মতো মনে হবে। এতে করে হাজার জনের কাছে হাজার রকম রূপ ও গঠন দেখা দেওয়ার সম্ভবনা থাকবে। সেদিক চিন্তা করেই আল্লাহ্‌র রূপ গঠন নিয়ে চিন্তা করার কোন যুক্তিই আসে না। এরূপ চিন্তা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে আল্লাহকে দেখতে কেমন একথা বলা না গেলেও তিনি যে দর্শনীয় হবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর দর্শনীয় হওয়ার বিষয়টি বাস্তবেই প্রমাণ করার মতো।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট কোন না কোন কাজ আছে, যেমন চোখ আমাদের দেখার কাজ সমাধা করে। তেমনি কান সামাধা করে শোনার কাজ। কিন্তু প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কাজের আছে সীমাবদ্ধতা। সেজন্য চোখ অনেক দূরের জিনিস, আড়ালের জিনিস, অন্ধকারের জিনিস দেখতে পারে না। কোন জিনিস থেকে আলোক-প্রতিবিম্ব ফিরে এসে চোখে না পড়লে চোখ থাকা সত্ত্বেও আমরা ঐ জিনিস দেখতে পারি না।

অনুরূপ আমাদের জ্ঞানেরও একটা সীমা আছে। এরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে কোনদিকেই আমরা পূর্ণ নই। মূলত যে জিনিসের পূর্ণতা নেই, তার বেলায় যেমন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনি এ কারণে পরিপূর্ণভাবে কোন কিছু দেখাও সম্ভব নয়। এ কারণেই মানুষ সসীম! সসীমের ক্ষেত্রে দেখার ও শোনার যে সীমানা দেয়া আছে, সেই সীমানা কিছুটা হলেও চেষ্টার মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব। জ্ঞানী ও অতি মানবগণ সে সীমা অতিক্রম করে থাকেন। তাদের বেলায় উঁচু নিচু সবই সমান। কিন্তু মূর্খের বেলায় এবং অল্প জ্ঞানীর বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এরা অসীম পর্যন্ত চিন্তা করলে উঁচু হতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। আসলে অসীম পর্যন্ত দেখতে হলে শ্রম দিয়ে কৌশলী হতে হয়, ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। হৃদয়ের আরশির উপরের কালো পর্দাটি ঘষে ঘষে তুলে নিতে হয়। তারপর দেখলে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে অতি মানবদের বেলায় অনেক কিছু দেখা ও বুঝার সীমাবদ্ধতা থাকে না। সেজন্য বলা আছে, সব ক্ষেত্রে জ্ঞানের মাত্রা অনুযায়ী স্রষ্টার মারেফাত (তত্ত্ব জ্ঞান) নিয়ে কথা বলতে হয়। এ বিশ্বের প্রতিপালক নিরাকার। তাঁর কোন আকার নেই। তিনি জড়ত্বের গুণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ জড় পদার্থ ব্যতীত কোন কিছুর আকার হয় না।

এখন প্রশ্ন হলো, নিরাকার আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে কি? এর উত্তর তালাশ করতে গিয়ে একজন হিন্দু ভদ্র লোকের কথা মনে পড়ে গেল (বর্তমানে তিনি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী নয়)। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইসলাম ধর্মে বলা আছে আল্লাহ নিরাকার, আবার বলা হয় বেহেশতে আল্লাহকে দেখা যাবে, এ কেমন কথা?

আমি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে আকার, নিরাকারের পার্থক্য এবং তার সাথে গতির সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছিলাম। তার সারমর্ম হলো এরূপ, যে জিনিসের আকার আছে, সেটি থাকে গতিশীল। এর ভেতরে, বাইরে সবদিকেই থাকে গতি। গতিশীল জিনিসের অভাববোধ থাকে। এর মাঝে থাকে মৃত্যু, ক্ষুধা, বিশ্রামের প্রবণতা। কিন্তু আল্লাহর বেলায় এসব কোন কিছুরই বালাই নেই।

www.nagorikpathagar.org

এরূপ গুণ থাকলে তিনি স্রষ্টা হতে পারতেন না। তাই তিনি গতিশীলও নন, ক্ষণস্থায়ীও নন। সে কারণেই তিনি নিরাকার। তবে তিনি নিরাকার হলেও তাঁকে দেখা যাবে, এ কথা ষোল আনাই সত্য। সেদিন হিন্দু লোকটির সাথে গতি ও আকার সম্পর্কে কথা বর্ণনা করতে গিয়ে, যে উদাহরণটি দিয়েছিলাম তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আমরা জানি, চন্দ্র, সূর্য পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যে অবিরত সন্তরণ করে বেড়াচ্ছে। এমনকি নিউট্রন ও প্রোটনের চারদিকে ঘুরছে ইলেকট্রন কণিকা। এতে পরমাণুর অস্তিত্ব যেমন টিকে আছে তেমনি মহাশূন্যের গ্যালাক্সি ও তারকার বহরগুলো টিকে রয়েছে। এদের মাথায় গতির বেরাম আছে বলে তারা টিকে আছে।

পক্ষান্তরে এদের যদি গতি না থাকে তাহলে তাদেরকে তো আর মহাশূন্যে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব নয়। গতি হারালেই এদের ধ্বংস নেমে আসবে। কিন্তু এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নয়। এ অবস্থায়ও এদের অস্তিত্ব বলতে একটা কিছু থাকবে। এখানে গতি ও আকারের নিবিড় সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যে জিনিসের গতি নেই সেখানে কোন আকার থাকতে পারে না। গতিশীল বস্তুর ক্ষয় আছে, সেটি পরিবর্তনশীল। এর বেলায় ঘুম-নিদ্রা, খাওয়া-দাওয়া, পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশনের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু আল্লাহ এসব গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সেদিক থেকে প্রমাণ হয় খোদার অস্তিত্বে গতি নেই। তিনি চিরন্তন ও স্থির। স্থিরতার সম্পর্কেই তিনি নিরাকার। কিন্তু তিনি যতো নিরাকারই হোন না কেন, তবু তিনি অদেখার কিছু নয়।

আলোক, বাতাসসহ মহাশূন্যের পাতলা মিহি চাঁদোয়াটি আমাদের দৃষ্টিতে নিরাকার মনে হয়। কিন্তু এদের অন্তর রাজ্যেও গতি আছে। ফলে স্রষ্টা এ রূপ অস্তিত্ব থেকেও মুক্ত। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা আমাদের কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ অসীমের সৃষ্টিকে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, এ থেকেই বুঝা যায় সৃষ্টিকর্তা অদেখার কিছু নয়। সত্যি করে বলতে কি, নিরাকার কথাটি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। কারণ আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতার জন্য আমরা মনে করি নিরাকারের মাঝে কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিন্তু আলোক, বাতাস, ইত্যাদি তো খোদার সৃষ্টি। সেগুলো যদি আমাদের দৃষ্টিতে নিরাকার হয়েও অস্তিত্ব থাকতে পারে, তবে খোদার অস্তিত্ব না থাকার তো কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

পৃথিবীতে এমন এক নিরাকার জিনিসের অস্তিত্ব কঠিন ঢাকনার মতো মনে হয় যার কিছু দূর পর্যন্ত রয়েছে বায়ুর উপাদান। আর তার উপরেরটা বলতে গেলে

www.nagorikpathagar.org

ফাঁকা। কিন্তু এই ফাঁকা জায়গাটা কি আসলেই শূন্য? না এর ভেতরেও কোন কিছু আছে? মাটি নেই, একথা বলা যাবে কিন্তু আসমান নেই, একথা বলা কঠিন। এই আসমান কখনো নীল, কখনো কালো, কিংবা সাদা, কখনো বা লাল রংগের দেখা যায়। নীল দেখা যায় গ্যাসের কণা হতে ছোট মানের আলোর ঢেউ ঠিকরে পড়ে বলে। লাল দেখা যায় বড় মাপের আলোর ঢেউ ধুলো কণা থেকে ঠিকরে আসে বলে। কালো দেখায় মেঘের ভেতর দিয়ে সূর্য রশ্মি ঠিকরে আসতে পারে না বলে। আবার রাতেও দেখা যায় কালো। আসমানকে যত রঙ বেরংয়েই দেখিনা কেন, সেটিতে যে কোন ছিদ্র বা ফাঁকা নেই একথা সত্য। এই আসমান চারদিক থেকে ছামিয়ানার মতো পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় এই ছামিয়ানার কঠিন প্রাচীর ভেদ করে ওপরে ওঠা যাবে না। আমাদের চারদিকে সেটিকে এতো কাছে মনে হয় যেন দূরে কোথাও লেগে আছে। আসলে কি তা সত্য? বাস্তবে আমরা সেটিকে যেমন মনে করি, আসলে সেটি এমন নয়। একে ছেদ করে যেমন ওপরে ওঠা যায় তেমনি নিচেও নামা যায়। আবার আলোর বেগে সাত বছরের জন্য রকেট যাত্রায় বের হলেও সেটির কূল কিনার পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ একে দেখতে কত সুন্দর, কত সুরম্য মনে হয়। যা ভাবতে অবাক লাগে। এই আসমান সৃষ্টিকর্তার অনুপম সৃষ্টি। তিনিই নিজ ক্ষমতায় একে সৃষ্টি করেছেন। "আর আমি আসমানকে ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছি এবং আমি বিশাল ক্ষমতার অধিকারী।" (সূরা-৫১ : ৪৭)

মহামহিয়ানের অসীম ক্ষমতার এই কুদরতি নিদর্শন অশরীরি নিরাকার হলেও তার রূপ-শোভা, ফাটলহীন, ছিদ্রহীন কাঠামো (পৃথিবীর চারপাশে বেষ্টিত চাঁদোয়াখানি) আমাদেরকে কতই না অভিভূত করে। একে না ধরা যায়, না স্পর্শ করা যায়। এর না আছে আকার আকৃতি, না আছে ছিদ্র করার মতো কোন শরীর। তবু একে আমাদের দেখতে তো কোন অসুবিধা হয় না। এর ওপরের ফাঁকা জায়গাটিতে অবশ্যই কিছু না কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। সেই অদৃশ্য সৃষ্টিও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরূপ অশরীরি সৃষ্টি হতেও মুক্ত। তবে এখানে যে জিনিসটি বিশ্বাসে আনার উপাদান তা হলো এরূপ নিরাকার জিনিসটিকে যেহেতু দেখা যায়, এর সুন্দর ও মনোরম একটা অস্তিত্ব ভাসে, সুতরাং খোদা নিরাকার ও অশরীরি হলেও তাঁর কুদরতি রূপ বেহেশতবাসীদের দেখতে অসুবিধা হবে না।

এ আলোচনার ফাঁকে আল্লাহকে কেন এ পৃথিবীতে থেকে দেখা যায় না, সেদিকে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন এ

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীবাসীর পক্ষে স্রষ্টাকে সরাসরি দেখা সম্ভব হলেই তো সকল ঝামেলার অবসান হয়ে যেত, অর্থাৎ আজ যারা খোদাকে অস্বীকার করে কিংবা সন্দেহ করে তারা যদি আল্লাহকে দেখতে পেত, তার কথা শুনতে পারতো তবে তো এরা ঈমানদার হয়ে যেত। একথা আমাদের জন্য ভাবা যেমন সহজ কিন্তু আল্লাহকে এ পৃথিবীতে থেকে সরাসরি দেখে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে তত সহজ নয়।

হযরত মূসা (আ) এর মতো নবীর পক্ষে যেখানে স্রষ্টার কিঞ্চিৎ নূরের ঝলক দেখে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি, সেখানে আমাদের মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে কি টিকে থাকা সম্ভব? এটি যেমন একটি কারণ অপরদিকে আর একটি অন্তর্নিহিত কারণ হলো, স্রষ্টা সৃষ্টির শাখা প্রশাখার প্রান্তে এসে দেখা দেয়ার মাঝেও রয়েছে সমস্যা। মানব আত্মা যেমন দেহের শিরা-উপশিরায় ঢুকে না, তেমনি স্রষ্টার বেলায় সৃষ্টির প্রান্তে আসাও কোন যৌক্তিকতা নেই। আত্মার শাসন কার্য অনুসরণ করে দেহ যেমন তার আনুগত্যশীল থাকে তেমনি সৃষ্টির বেলায় জগতের সুশৃঙ্খলতা দেখে, শুনে, অনুভব করে তার আনুগত্য মেনে চলা প্রয়োজন।

অন্যদিকে গতির সীমানার ভেতরে 'স্থিতিমান' প্রবেশ করাও বিপর্যয়ের ব্যাপার। কারণ পূর্বেই বলেছি, বিশ্ব হলো গতিশীল জগৎ আর স্রষ্টা হলেন চিরন্তন ও স্থির। ফলে স্রষ্টা গতির আঙ্গিনায় প্রবেশ করা যেমন সমস্যার ব্যাপার, তেমনি এরূপ কল্পনা করাও যুক্তিহীন। কারণ গতির ভেতরে 'স্থিতিমান' ঢুকলেই তার কোন কিছু টিকে থাকবে না। একটি চলন্ত গাড়ির সাথে স্থির কোন কিছুর স্পর্শ বা ছোঁয়া লাগলে যেমন সংঘর্ষ হয়, তেমনি গতির রাজ্যে আল্লাহ দেখা দিলে সবই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সে কারণেই পৃথিবীর দৃষ্টি সীমার মধ্যে খোদাকে পাওয়া সম্ভব নয়। এসব কারণেই খোদা পৃথিবীর নিকটে এসে দেখা দেন না।

প্রত্যেক আকারশীল জিনিসের মধ্যে গতি থাকে এবং তার পাশাপাশি এর কিনার থাকে। অর্থাৎ আকার হলেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা থাকবে। কিন্তু নিরাকারের বেলায় এর একটিও প্রয়োজন নেই। সেজন্য নিরাকার যদি অসীম হয় তাহলে তাঁর রূপ ও গঠন হয় অশরীরি (জড় কাঠামোহীন)। যেমন আসমান দৃশ্যত আকারশীল মনে হলেও এর কোন স্পর্শনীয় কাঠামো নেই। তেমনি নিরাকার অসীম হলে এর কোন স্পর্শনীয় কাঠামো থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ অসীম ও নিরাকার। আমাদের ইন্দ্রিয় চোখে আসমানের অশরীরি অস্তিত্ব যেমন শরীরি মনে হয় তেমনি আমরা যখন আল্লাহর অস্তিত্ব ধ্যান করি তখন হয় তাঁর অস্তিত্ব শরীরি মনে করি কিংবা তাঁর অস্তিত্ব আছে বলে ভাবতে পারি না। এরূপ হওয়ার কারণ হলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের ধাঁ ধাঁ, অথচ এরূপ শরীরি অস্তিত্ব কোন কঠিন বা

www.nagorikpathagar.org

শক্ত কিছু নয়। আমাদের দৃষ্টিতে এটি ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার প্রাচীর মনে হলেও এখানেই আল্লাহর কুদরতের জ্ঞানভাণ্ডার লুকায়িত।

খোদা আসমান জমিনের ভেতরের সকল নিরাকার (অদৃশ্য) সৃষ্টি থেকেও মুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে যেসব উদাহরণ দেয়া হয়েছে তা শুধু আল্লাহর অস্তিত্বকে উপস্থাপন করার স্বার্থেই। যে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য সৃষ্টি এই নিরাকার আসমানকে দেখতে এতো সুন্দর লাগে সেই আল্লাহ যে কতো অসীম সুন্দর তা কল্পনাই করা যায় না। সে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সম্পর্কে ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেছেন– "তিনি আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন প্রভু নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং স্বশক্তিতে (কারও ওপর নির্ভর ব্যতিরেকে) বিদ্যমান। অন্য সমস্ত অস্তিত্ব তাঁরই ওপর নির্ভরশীল। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করে না। যা কিছু বিরাজমান আসমান জমীনে সমস্ত তাঁরই। কে আছে এমন যে (তাঁর অনুমতি ব্যতীত) তাঁর নিকট অন্য কারও জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম? তিনি (আল্লাহ) জানেন, তাদের সম্মুখে কি আছে এবং পশ্চাতে কি আছে। তাঁর জ্ঞানের কণিকামাত্রও (তিনি অনুগ্রহ করে যেটুকু জানান তা ছাড়া) কেউ জানতে পারে না। তাঁর সিংহাসন (অবধানতা) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীব্যাপী আছে। এই ভূলোক ও দ্যুলোকের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে তাঁর ক্লান্তি আসে না। তিনি সমস্ত কিছু হতে উন্নত ও মহান।" (সূরা-২ : ২৫৫)

পরম দয়ালু চিরঞ্জীব বিশ্ব প্রতিপালক তাঁর নেক বান্দাদের সামনে একদিন ওপার জগতে যে দেখা দিবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আজ যারা জড় জগতের খাঁচার ভেতরে থেকে আল্লাহকে না দেখে ডিগবাজী দেয়া শুরু করছে, তাদের জ্ঞান শূন্য বিবেকের সামনে সেদিন পরকালের যাবতীয় দৃশ্য স্বচ্ছ হয়ে সূর্যের আলোর মতো ভাসবে, সেদিন তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে না। আল্লাহর আরশের জ্যোতি তারা পাবে না। সেদিন তারা অন্ধকারের অতল সাগরে তলিয়ে হাবুডুবু খাবে। তখন তাদের হুঁশ নামের চেতনার যন্ত্রটি হৃদয় জুড়ে তুফান তুলবে কিন্তু তখন কোন ফল হবে না।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ যে পরকালে দেখা দেবেন তার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হলো– "দিনে যখন আকাশে মেঘ থাকে না তখন তোমরা সূর্য দেখ কী? আর রাত্রিতে যখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে, তখন চাঁদ দেখ কী? নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুকে অতিসত্ত্বর দেখতে পাবে। এমনকি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তাঁর প্রভু সম্বোধন করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, হে আমার

www.nagorikpathagar.org

বান্দা! "তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার কর? সে বলবে. "হে আমার প্রভু! আপনি কী আমাকে ক্ষমা করেন নাই?" তখন তিনি বলবেন, "আমার ক্ষমার ফলেই তুমি এই পর্যায়ে পৌছেছ।" আহমদ এ'টি আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।"

"যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদিগকে আরও বেশী কিছু দান করি? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চোহারাগুলোকে উজ্জ্বল করে দেন নাই? আপনি কি আমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করান নাই এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন নাই? তখন আল্লাহ তাঁর হিজাব (আলোর পর্দা) খুলে দিবেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করার চাইতে অধিকতর কোন প্রিয় বস্তু দেয়া হবে না"। তিরমিযী ও মুসলিম এটি সুহাইব (রা)-এর সূত্রে সংগ্রহ করছেন।

আল্লাহর দর্শন পাওয়া পৃথিবীর বেলায় সম্ভব না হলেও পরকালে জান্নাতবাসীগণ পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় পরিষ্কার ও সন্দেহাতীতভাবে দেখতে পাবেন। তিনি নিরাকার ও অশরীরি হলেও অদেখার কোন সত্তা নন। যেদিন জান্নাতবাসীদের সামনে তিনি নূরের পর্দা খুলে দিবেন, সেদিন জান্নাতীগণ বেহেশতের যাবতীয় নিয়ামতের কথা ভুলে যাবেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকট হতে আত্মগোপন করবেন। তখন শুধু তাঁর আলো ও বরকত তাদের ওপর এবং তাদের বাসভবনের ওপর অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতাসীন। তাঁর বেলায় সীমাবদ্ধতার কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। এ বিশ্ব জগতে এমন কোন রেনু দানা নেই, যার খবর তিনি রাখেন না। সকল কিছু তাঁর ক্ষমতার শিকলে বন্দি। তিনি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকলেও নিমিষেই সকল কিছুর খবর পান। আল্লাহ কি করে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে খবর রাখেন সে আর এক সূক্ষ্ম স্নায়ুবিক বিধান। এ বিধানের কার্য ব্যবস্থা এতো কঠিন ও গতিময় যার সম্পর্কে না জানলে, স্টাডি না করলে কিছুই বুঝে আসবে না।

আল্লাহ্ কি করে সৃষ্টিকুলের খরব রাখেন

আল্লাহর রাজ্যের সীমানা কতদূর বিস্তৃত, এ সম্পর্কে আমাদের কোন সঠিক ধারণা নেই। কোটি কোটি আলোকবর্ষকে পারসেকের পরিমাপে এনেও সেই বিশাল রাজ্যের কিনার পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এক আল্লাহর হাতেই সেই বিশাল রাজ্যের দায়িত্ব ভার। তিনি এর লালনকর্তা, পালনকর্তা। তাঁর রাজ্যের এমন কোন উপাদান নেই যার খবর তিনি রাখেন না। সমুদ্রের তলদেশের সূক্ষ্মাতীত একটি কণার খবরও তাঁর দৃষ্টির বাইরে নেই। তাঁর সৃষ্টিতে এমন কোন দৃশ্য আর অদৃশ্য

www.nagorikpathagar.org

সত্তা নেই যার সম্পর্কে খবর নেয়া আল্লাহর পক্ষে কঠিন কিছু। আমরা সীমাবদ্ধ পরিসরে বাস করে যখন আল্লাহর রাজ্য শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাবি তখন মনে মনে চিন্তা করি, এতো বিশাল রাজ্যের সকল সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ কি করে খবর রাখেন? বলা হয় আল্লাহর সৃষ্টিতে এমন কোন সত্তা নেই, যে সত্তা তাঁর হুকুম ছাড়া চলতে পারে। মাটি ভেদ করে যে বীজ গজায় সেগুলোও তাঁর হুকুম নিয়ে অঙ্কুরিত হয়। নর্দমার একটি সূক্ষ্ম কীট সম্পর্কেও তাঁর খবর থাকে। আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে এসব কথা শুনে বস্তুবাদীরা উপহাস করে বলে, নিরাকার এক আল্লাহর পক্ষে কি করে এতো হাজার হাজার সৃষ্টিকুলের খবর রাখা সম্ভব? তারা মনে করে এসব অবাস্তব চিন্তা ছাড়া কিছু নয়।

মানুষ দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে চিত্তের শান্তির জন্য। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে জড়বাদীরা আসলেই মূর্খ ও জড়তার শিকলে বন্দি। তারা জড়তার মোহে পড়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। এই অবিশ্বাস তাদের জড়তার বেরাম।

পক্ষান্তরে তারা নিজের আত্মা সম্পর্কেও অজ্ঞ। তাদের জানা উচিত, চোখ দিয়েতো আর পিঠ, নাক, মুখ, কান পেটের নাড়ীভুড়ি দেখা যায় না, তাই বলে কি সেসবের খবর আত্মার থাকে না? নিশ্চয়ই এগুলোর প্রতিটি রেণুকণাও তার অজ্ঞাতে কাজ করে না।

বস্তুবাদীরা নিজেকে মনে করে প্রকৃতির সৃষ্টি সজীব মেশিন। এই মেশিন বস্তুর উন্নতর প্রজন্মের বিকাশ। আসলে তারা বস্তুর বাইরে কিছুই দেখতে পারে না। মূলত তারা প্রাণমনহীন বস্তুকেই সবকিছুর 'আদি কারণ' বলে মনে করে। ফলে বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা আছে বলে তারা বিশ্বাস করে না। এ শ্রেণীর লোককে বলা হয় নাস্তিক। তাছাড়া কিছু লোক আছে সন্দেহবাদী। তারা মনে করে আল্লাহ থাকলেই কি, অথবা না থাকলেই বা কী? এতে জীবনের মঙ্গল বা অমঙ্গলের কিছু আসে যায় না। কিন্তু উভয়ের ধারণা যে একদিন চরম ক্ষতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে তা তারা চিন্তাও করে না। আমি পাপ-পুণ্যের সৃষ্টি রহস্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে একত্ববাদের ঈমানী শক্তি ব্যতীত ভালো পুণ্যসত্তা সৃষ্টি হয় না। সেজন্য আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিশ্বাসের সাথে কর্মের সম্পর্ক জড়িত থাকায় এর প্রতিফলেরও গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এরা কেন অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদী হলো, তার মূল শিকড় তালাশ করতে গিয়ে দেখা যায় এরা আসলেই আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান। তারা মনে করে বিশ্বাসীগণ যে আত্মবিশ্বাসে বলেন তাদের আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন, আসলে এগুলো তাদের কল্পনা বৈ অন্য কিছু নয়। এসব কি করে সম্ভব?

www.nagorikpathagar.org

অথচ আমার দৃষ্টিতে তারা যদি একবার নিজকে চেনার চেষ্টা করতো এবং নিজের দেহ-রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খরব নিতো, তাহলেই আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে পারত। পক্ষান্তরে আল্লাহর ক্ষমতার সঠিক পরিমাপ যারা করতে পারে তারা অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদী হয় না। আত্মা ও দৈহিক গঠনের কারুকার্যের সম্পর্ক তলিয়ে দেখলে সন্দেহবাদীদের সন্দেহ আর নাস্তিকদের ফালতু চিন্তার জবাব অনায়াসেই দেয়া সম্ভব। আমি এক সন্দেহবাদীর কথায় যখন ভাবনায় পড়েছিলাম, তখন সত্যের এক সন্ধান পেলাম। সন্দেহবাদীর কথা ছিল, মরলে পরে কি হবে তা কী কেউ দেখে এসেছে? চাঁদটা যদি সাঁঝে ঢেকে যায় তা কি কেউ দেখতে পারে? রাতে চুরি করলাম, সাক্ষী নেই, আলো নেই, চুরিরও খবর হলো না, তার জবাব খোদা নেবে কী করে? আরও অনেক প্রশ্ন।

সাধারণভাবে সেদিন জবাব দিয়েছিলাম আল্লাহ সব দেখেন, শুনেন। তারপর তার কথা ছিল দু'চোখে আল্লাহ সব দেখেন কি করে? দু'কানে সব শুনেন কি করে? আসলে আল্লাহ যে আমাদের মতো ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখেনও না, শুনেনও না, সে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান ছিল না। এরপর থেকে আমারও স্বপ্ন ছিল প্রশ্নটির আরও সুন্দরভাবে জবাব দেয়া উচিত। কিন্তু আমার তখন এর চেয়ে ভালো কোন ধারণা ছিল না। যাহোক হঠাৎ একদিন একখানা ধর্মীয় বই পড়তে পড়তে একজন মনীষীর উক্তি আমার দুর্বল মনে রেখাপাত করে।

তিনি বলেছেন, "যে নিজেকে চিনতে পেরেছেন সে আল্লাহ তা'আল্লাহকে চিনতে পেরেছেন।"

"যে ব্যক্তি নিজ অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব জানতে পেরেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অপার মহিমা এবং অসীম ক্ষমতার সন্ধান লাভ করতে পেরেছেন।"

এই বিশ্বের লালনকর্তা, পালনকর্তার ঘোষণা– "আমি তাদেরকে বাহ্যিক জগতে এবং তাদের (অর্থাৎ মানুষের) দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকি? যার ফলে সত্যের গূঢ়তত্ত্ব তাদের নিকট প্রকাশিত হবে।"

(সূরা হামীম আস-সিজদাহ, রুকূ : ৬)

আমরা জানি না, বুঝি না, কোথায় যে আমাদের দেহ ও আত্মার মাঝে খোদার ক্ষমার নিদর্শন রয়েছে। আমাদের আত্মার রাজ্য হলো দেহ। সে এটি শাসন করে। আত্মা ও দেহ, এ দু'য়ের পাশাপাশি সম্পর্কের সাথে যেহেতু খোদার ক্ষমতার নিদর্শন অনুভব করা সম্ভব সুতরাং সে সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করতে বাধা থাকার কথা নয়। তবে একথা সত্য যে, বিষয়টি একটু সতর্কতার সাথে তুলে ধরতে হবে। অন্যথায় বুদ্ধির তারতম্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

দেহ ও আত্মার সম্পর্ক খুব নিবিড়। আত্মার কথা ব্যতীত দেহ এক চুল নড়ে না। দেহ আত্মার এমনি অনুগত ভৃত্য যা কল্পনাই করা যায় না। এর কোন অংশে যদি একটু চুলকানিও অনুভব করে, তবু সে তার প্রভুর (আত্মার) নির্দেশ ব্যতীত চুলকায় না। পক্ষান্তরে এর কোথাও যদি কোন রোগ, ব্যাধি, কিংবা যন্ত্রণা দেখা দেয় তখন সে অংশ তার প্রভুর দরবারে আরজি পেশ করে। গভীর ঘুমেও যদি তার কোন কষ্ট দেখা দেয় তৎক্ষণাৎ সে তার প্রভুর কাছে নালিশ করে। টেলিফোনের সংকেতের মতো ঢেউ-এর বেগে সংকেতগুলো তার আত্মার দরবারে পৌঁছে। সাথে সাথে আত্মা বাহাদুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ পাঠায়। আত্মা ও দেহের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ুমণ্ডলী। আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যনীতির সাথে মনের যেমন সম্পর্ক তেমনি বিশ্ব প্রকৃতির অদৃশ্য কার্যনীতির সাথে বিশ্ব বিধাতার অনুরূপ সম্পর্ক বিরাজমান। প্রকৃতির কার্যনীতির নিয়ন্ত্রণভার আরশের ওপর। অপর দিকে 'আরশ আল্লাহর ক্ষমতাধীন। আল্লাহর 'আরশের কার্যব্যবস্থা মানুষের মস্তিষ্কের কার্যনীতির অনুরূপ। আমরা নিজেদের মস্তিষ্কের কার্যনীতি সম্পর্কের কিছু জ্ঞান নিতে পারলে মহাপ্রভু কি করে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে খবর রাখেন তা বুঝে আসবে।

আমাদের কেন ক্ষুধা লাগে? ক্ষুধা লাগলে কেন আমরা খেতে চাই? আবার খেলে পরে কেনই বা ক্ষুধা কমে যায়? কে এসব নিয়ন্ত্রণ করে? কিভাবে করে? সে সম্পর্কে হয়ত আমরা অনেকেই অজ্ঞ। ক্ষুধা লাগলে আমরা অভাববোধ করি। এটিই এর প্রমাণ। কারণ ক্ষুধা দেখা যাওয়ার কোন বস্তু নয়। জীব দেহের অতি নিখুঁত জৈবিক প্রক্রিয়া সেই অভাববোধ সৃষ্টি করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে খাবার খাওয়ার সময় হলে পেট থেকে প্রথমে একটি Afferent Impulse সরাসরি আমাদের মস্তিষ্ক আসে। একে অন্তর্মুখী তাড়না বলা হয়। মস্তিষ্ক এটি Receive করে মনকে জানিয়ে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে মন, মস্তিষ্কের যে স্থানটুকু খাদ্য খাওয়ার চাহিদা সৃষ্টি করে তাকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য Order দিয়ে দেয়। ফলে ঐ স্থান থেকে পাকস্থলীর দিকে Efferent Impulse (বহির্মুখী তাড়না) প্রেরিত হয়। অতঃপর পাকস্থলী এ নির্দেশ পেয়ে খাদ্য রস নিঃসরণ করতে থাকে। এ থেকে শুরু হয় পেট-জ্বালা বা ক্ষুধার তাড়না। আমাদের অজান্তেই এতো সব সংকেত আদান-প্রদান হতে থাকে। খাদ্য খাওয়ার এই নিখুঁত পদ্ধতি সম্পর্কে মনে হয়, আমাদের কোন খবর নেই; কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয়। কারণ মনের নিয়ন্ত্রণাধীনেই মস্তিষ্ক কাজ করে। মানব দেহের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্ক মনের হয়ে সব দেখাশোনা করে। তবে সকল অবস্থাতেই সে

www.nagorikpathagar.org

(মস্তিষ্ক) মনের নির্দেশ (অনুমতি) নিয়ে নেয়। পেট যখন ভরে যায় তখন আর ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু পেট ইচ্ছা করে নিজে নিজে খাওয়ার স্পৃহা নিস্তেজ করে দিতে পারে না। এর জন্যও সে মস্তিষ্কের কাছে সংকেত পাঠায়। তারপর মস্তিষ্ক অনুরূপভাবে খাওয়ার চাহিদা কমিয়ে দেয়।

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে (হাত, পা, নাক, কান, চোখ) sensory nerve মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে নিয়ে আসে। আমাদের অজান্তে মশা যদি শরীর থেকে রক্ত চুষে খেতে থাকে, তখন ঐ জায়গা থেকে Afferent Impulse (অন্তর্মুখী তাড়না) নামের লাল সংকেত চলে আসে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক মনের সায় নিয়ে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে করে দেখা যায় শরীরের এমন কোন কোষ নেই যার খবর আমার মনের অধীন হয়ে মস্তিষ্ক না রাখে। কোন কারণে যদি মস্তিষ্ক দেহ রাজ্যের কোন স্থানের খবর না রাখে, তবে ঐ স্থানের উপর দিয়ে কোন বিপর্যয় ঘটলে নিজের কোন খবরই থাকবে না। মূলত মস্তিষ্ক নিজে থেকে কিছুই করে না। সে সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থায় মনের হুকুম তামিল করে।

আমাদের দৈহিক জড় রাজ্যটি আমাদের মস্তিষ্কের সত্তাধীন এবং মস্তিষ্ক মনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক হলো সমস্ত অঙ্গের নাভীমূল এবং মন তার শাসক। মনের শাসন ব্যবস্থা দেহের প্রতিটি রেণু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মন যাকে দিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করে তার নাম স্নায়ুমণ্ডলী। এই স্নায়ুমণ্ডলীর মূল দপ্তর (মস্তিষ্ক) পরিচালনা করে মন। সেখান থেকেই প্রতিটি অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেহ ভুবনে এমন কাজ নেই, যার খবর মন রাখে না। এর কর্ম ব্যবস্থা এতো তড়িৎ ঘটে, যা কল্পনাও করা যায় না। আমরা অনেক সময় কর্ম থেকে নির্দেশকে আলাদা করে দেখতে পারি না, সেজন্য কর্মের বাইরে আমরা আর কিছু চিন্তা করি না। কোন কোন ক্ষেত্রে মনের নির্দেশ যে প্রয়োজন হয় তা হয়ত আমরা অনুভব করে থাকি। প্রস্রাব, পায়খানার বেগ হলে আমরা বুঝি অঙ্গ নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না। অন্যান্য বেলায় আমার বুঝতে না পারলেও সেখানে একই ব্যবস্থায় কর্ম সম্পাদন হয়।

মানুষ অসীম নয়। সে নিজে যেমন সসীম তেমনি তার জ্ঞানের সীমাও সসীম এবং আপেক্ষিক। এই সসীম প্রাণীর সামান্য দেহ রাজ্যের সকল ক্রিয়া কর্ম-ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তা মনের খেয়ালেই মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। আসলে কোন কাজই মনের ইচ্ছার বিপরীতে হয় না। আমাদের 'মন' নামের অচিন পাখিটি অদৃশ্য সত্তা। আর মস্তিষ্ক-এর সংকেত বহন করে। এর মাধ্যমেই দেহের সকল কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহ মনের সত্তাধীন নয় এবং

www.nagorikpathagar.org

মস্তিষ্কও তার সত্তাধীন নয়। কার্যত মস্তিষ্ক দেহের সত্তাধীন। মন মস্তিষ্কের সত্তাধীন না হয়ে সে দেহের সত্তা দিয়েই তাকে শাসন করে। আমাদের অঙ্গ রাজ্য আর মনের কার্যব্যবস্থা বুঝে আসলে, এর সাথে বিশ্ব বিধাতার বিশ্ব শাসনের কর্মকাণ্ড বুঝে আসার কথা। একে অল্প কথায় একজন মনীষী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি সে সত্য উপলব্ধি করেই বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের রহস্য জানতে পেরেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অপার মহিমা এবং অসীম ক্ষমতার সন্ধান লাভ করতে পেরেছেন।"

আমাদের মনের কার্য ক্ষমতার সাথে, স্রষ্টার অসীম কার্যব্যবস্থা ও তাঁর ক্ষমতার নির্দেশনা আংশিক হলেও সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিশ্বের সকল সৃষ্টিকুল আল্লাহ পাকের সৃষ্টি সত্তার বহির্ভূত নয়। এগুলো তাঁর সৃষ্টিসত্তার বহির্ভূত হলে, বিশ্বের সম্প্রসারণের বেলায় সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন আসতো। অপরদিকে আল্লাহর পক্ষে এ বিশাল সৃষ্টির প্রতিটি রেণুকণার খবর রাখাও সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন দেখা দিত। এতে স্রষ্টার বড়ত্ব বা শানের খেলাপ হতো। যেহেতু এ বিশ্বের প্রতিটি স্থানে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর ক্ষমতা মওজুদ থাকে, সুতরাং সমগ্র বিশ্বই তাঁর সৃষ্টি সত্তাধীন এবং তার মালিকানাধীন। সেজন্যই সৃষ্টির প্রতিটি সত্তাই তাঁর পরিবারতুল্য।

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

"তাঁর সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। ঐসবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোন কাজ নয় যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনিই এক মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা।" (আল-কুরআন)

"তারপর 'আরশকে আল্লাহ নিজ আধিপত্যের অধীন করলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারুরূপে চলতে লাগল। তিনিই সকল কাজের সুব্যবস্থা করে থাকেন।" (আল-কুরআন)

"এখন এসব লোক কি আল্লাহর অনুগত্য করার পন্থা (আল্লাহর দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অধীনে আছে।" (আল-কুরআন)

আমাদের দেহরাজ্যের প্রতিটি দপ্তরের কাজ কর্মের খবর মনের ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তা যেমন মনের হয়ে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তেমনি এ বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি দপ্তর ও তার ভেতরে বাইরে যা কিছু আছে এসবই 'মহামনের' (আল্লাহর) মালিকানাধীন 'আরশের নিয়ন্ত্রণাধীন চলে। এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে, সেসবই মানব মনের শাসনাধীন দেহরাজ্যের গণ্ডির

www.nagorikpathagar.org

মতোই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কব্জায় বন্দি। তাই এর প্রতিটি রেণুকণা ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক খোদার দেখার বাইরে থাকে না। তার প্রতিটি রেণুকণার খবর রাখা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কার্যত এর কোন কিছুই আল্লাহর হুকুম ব্যতীত চলতে পারে না।

আমাদের দেহের কার্যভার যেমন মস্তিষ্ক তার স্নায়ুকাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে, এর খোঁজ খবর রাখে, তেমনি এ বিশাল বিশ্ব-জগতের কার্যভার আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন 'আরশ ও তার শাখা প্রশাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আল্লাহর 'আরশ ও তার শাখা-প্রশাখা আমাদের স্নায়ুব্যবস্থার অনুরূপই ধরে নেয়া যায়। সমস্ত জড়সত্তার অন্তর মূল পর্যন্ত তা বিস্তৃত। কিন্তু সে কাঠামো এতোই সূক্ষ্ম, যা যান্ত্রিক কোন কলকব্জায় ধরা পড়ে না। এই অদৃশ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টির সকল খবরাখবর এতো তড়িৎ বেগে আদান-প্রদান হয় যা কল্পনা করার মতো নয়। এর গতি আলোর গতি বেগের চেয়েও অধিক গতিময়। যখন সৃষ্টিসত্তাতে অভাব বোধের তাড়না (Negative Impulse) সৃষ্টি হয় তখন ঐ তাড়না অন্তর্মুখী (Afferent) ধাওয়া করে, এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহরই নির্দেশে 'আরশ থেকে Afferent Impulse সৃষ্টির কাছে ফিরে আসে। এই নির্দেশ পেয়েই সৃষ্টি তার কার্য সম্পাদন করে।

মানুষের দেহ রাজ্যের সকল ক্রিয়াকলাপ Sensory and motor nerve-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। Motor nerve (মস্তিষ্ক হতে ইন্দ্রিয়ের দিকে অনুভূতি বহনকারী নার্ভ) বহির্মুখী (Efferent Impulse) তাড়না বহন করে। আর Sensory nerve (ইন্দ্রিয় হতে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহনকারী নার্ভ) Afferent (অন্তর্মুখী) Impulse বহন করে। এই System-এর মাধ্যমে যেমন মন দেহের খবরাখবর রাখে তেমনি এই বিশাল সৃষ্টির খবরাখবর আল্লাহ অনুরূপ এক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে থাকেন।

বিশ্ব-প্রভুর সৃষ্টি সত্তার মাঝে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদের মূল ভিত্তি রচনা করে। যেমন আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সকল কিছুর কর্মের আদেশ দাতা তিনি নিজেই। যাদের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা আছে, তাদের কর্ম আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হলেও কর্মের স্বাধীনতা আছে বলে উদ্যোক্তা নিজেই তার কর্মফল ভোগ করবে। এতে সুবিধা কিংবা অসুবধিা হলেও তার জন্য আল্লাহর কিছু যায় আসে না। এখানে আল্লাহর বেলায় পক্ষপাতিত্বের কোন অজুহাত আসার কোন সুযোগ নেই। কারণ সুখ-দুঃখ ভোগ করার বিষয়টি তার কর্মের প্রতিদান। এতে আল্লাহর কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। কারণ কষ্টবোধ

www.nagorikpathagar.org

হওয়া শুধু একাধিক্যের বেলায়ই প্রযোজ্য। অর্থাৎ একাধিক্যের বেলায় এক সত্তা অন্য আর এক বৈরীসত্তা দিয়ে কষ্ট পেতে পারে। কিন্তু একক ও অনাধিক্যের বেলায় সকল কিছুই তাঁর মালিকানাধীন। এ বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহর রাজ্য ব্যতীত আর কারও রাজ্য নেই। তাই কষ্টের বা বৈরী উপকরণ অন্য কোন রাজ্য হতে এখানে আসার প্রশ্নই আসে না। অতএব আল্লাহর বড়ত্বই অসীম।

উপরে উল্লিখিত একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি বলেছি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আমাদের দেহ রাজ্যে যা কিছু ঘটে সকল কিছুই আমাদের মনের নির্দেশে ঘটে। আল্লাহ পাকের বিশ্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বেলায়ও সেকথাটি প্রযোজ্য। এখানে অনিচ্ছা কথাটি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এ অনিচ্ছা কথাটির তাৎপর্য হলো এরূপ যেমন– আমার ইচ্ছা নেই হাতটিকে নাড়াই কিন্তু যখন একটি মশা আমার অজান্তে কোথাও রক্ত চুষতে থাকে তখন বাধ্য হয়ে আমি ঐ স্থানের অভাব বোধের তাড়না (সেখানের Afferent Impulse) পেয়ে হাতকে অনিচ্ছাতেও ঐ স্থানের মশা তাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকি। এ কাজে আমার ইচ্ছা না থাকলেও ঐ স্থানের সাড়া পেয়ে তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেই হয়। এখানে কাজটি মনের ইচ্ছার বিপরীত হলেও ঐ অঙ্গ মনের নির্দেশ ব্যতীত কাজ করতে পারে নাই। একেই বলা হয় অনিচ্ছায় হলেও সে মনের নির্দেশ নিয়ে চলে। মনস্তত্ব বিজ্ঞানে এ ধরনের আচরণকে Reflex বা প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

এ উদাহরণ মানুষকে দিয়ে দেয়া হলো, অথচ যে আল্লাহ এতো বিশাল সংসার নিয়ে আছেন, তাঁর বেলায় কি সৃষ্টিকুল তাঁর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তার নির্দেশ না নিয়ে চলতে পারবে? আল্লাহ যত অসীম তাঁর মহিমাও তত অসীম। তিনি অভাবহীন, মুখাপেক্ষিহীন। সকল বস্তুর অস্তিত্ব তাঁর মহিমা বা ইচ্ছার অধীন। তিনি কোন স্থান-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা গোটা আসমান-যমীন বেষ্টন করে রয়েছে। কেউ ইচ্ছা করেও তাঁর রাজ্যের বাইরে যেতে পারবে না। কারণ সকল রাজ্যই তাঁর। আমার পা কিংবা হাত যেমন অন্যায় করে পালিয়ে যেতে পারে না বা রাগ করে দেহ থেকে খসে অন্যত্র যেতে পারে না, তেমনি আল্লাহর রাজ্যের কোন কিছুই এখান থেকে বের হতে পারবে না। এ জগতে যাদের একাধিক্য অঙ্গ আছে তারা ইচ্ছা করলে একটি অঙ্গ ফেলে দিয়েও চলতে পারবে। কারণ একাধিক্যের বেলায় তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু অনাধিক্যের বেলায় এর কোনটিও অন্য কোথাও ফেলে দেওয়া যায় না। আল্লাহর রাজ্য ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাজ্য না থাকায় তা সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

এ বিশ্ব জগতের অদৃশ্য মহামস্তিষ্কের নাম 'আরশ। এই 'আরশ স্রষ্টার ক্ষমতাধীন। সকল সৃষ্টিকুল সেই 'আরশের নিম্নে অবিস্থত। এর শিকড় সৃষ্টির কোণায় কোণায় পর্যন্ত বিস্তৃত। ফেরেশতাগণ আল্লাহর 'আরশ বহনকারী। কিন্তু আল্লাহর 'আরশ কোন বস্তু নয় এবং তিনি নিজেও কোন শরীরি নন। আল্লাহর 'আরশ সংরক্ষণ থাকেন না, তবু 'আরশ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। আ'রশের বৈশিষ্ট্য আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয়। তবু এ বৈশিষ্ট্য তাঁর নির্দেশ পালন করে। মানব আত্মা যেমন মস্তিষ্কে প্রবৃষ্ট কিংবা আরোহিত না হয়ে দেহের সকল খবরাখবর রাখতে পারে তেমনি আল্লাহ 'আরশে আরোহিত না হয়েও এ বিশাল সৃষ্টির খবর নিতে পারেন। আল্লাহর 'আরশের বিস্তৃতি ফেরেশতা জাতির মাধ্যমে সৃষ্টির কোণায় কোণায় অবস্থিত। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"তারপর 'আরশকে আল্লাহ নিজ আধিপত্যের অধীন করলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারুরূপে চলতে লাগল। তিনিই সকল কাজের সুব্যবস্থা করে থাকেন।" (আল-কুরআন)

এ বিশাল সৃষ্টি জগতটি যে আল্লাহ একটি সুচারু পন্থায় বিজ্ঞানময় কৌশলের মাধ্যমে পরিচালনা করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর রাজ্য-শাসন ব্যবস্থার কৌশলের মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য ভাবনার খোরাক আছে। আছে আলো ও সত্যের সন্ধান পাওয়ার অসীম সম্ভাবনা ও রহমত। এই রহমতের দরিয়ায় সাঁতার দিতে হলে সঠিক পথে খোদার মহিমার নিদর্শন দেখে তাঁর আনুগত্যশীল হয়ে চলতে হবে। অতঃপর স্বীকার করতে হবে, সৃষ্টির অতল গহ্বরের একটি প্রাণহীন কণারও খবর রাখা আল্লাহর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

আল্লাহর রাজ্যশাসন ব্যবস্থার নমুনা

খোদার রাজ্যের কোন কূল নেই, কিনার নেই। সে জগৎ অসীম আর অসীম। অসীম জগতের বিশালত্বের মাঝে আমাদের সৌরগজৎ একটি বিন্দুর পরিমাণও নয়। বলতে গেলে সেই অসীমত্বের মাঝে আমাদের উপস্থিতিও কোন ধর্তব্যের কিছু নয়। এর চেয়ে যদি আরও নগণ্য কিছু থাকে, তার কাজকর্ম, চলাফেরা, ঘুম-নিদ্রা সবই আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। দিনে আমরা কি করি, রাতে কি করবো, আগামী দিন কি হবে, গত রাত দিন কি করেছি, এসব তাঁর অজানা থাকে না। ভালো আর মন্দ যে যাই করুক না কেন, সকল কর্মই তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কেউ করতে পারে না।

আমরা স্রষ্টাকে যতদূরেই ভাবি না কেন, সৃষ্টির সাথে তাঁর এক নিবিড় সম্পর্ক

www.nagorikpathagar.org

আছে। সেই সম্পর্ক খুব রহস্যময়। আমাদের আত্মা দেহের প্রভু। সেটি যেমন আত্মার ক্ষমতার বাইরের কিছু নয়। তেমনি এই বিশাল সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর (আল্লাহর) ক্ষমতার বাইরে নেই। আগুন, পানি, বায়ু, মাটি আর অদৃশ্য সত্তা বলতে যা কিছু আছে, সেসবের ভেতরেও খোদার ক্ষমতার জাল বিস্তার করা আছে। এই জালের মিহি সূতা দিয়ে সৃষ্টির সকল খবরাখবর আদান প্রদান হয়।

আমাদের আত্মার সাথে মস্তিষ্কের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। মন যেখানেই যেতে চায় দেহ তাকে সেখানেই নিয়ে চলে। মনের ইচ্ছা ব্যতীত সে এক চুলও নড়তে পারে না। প্রথমে মনের ইচ্ছা শক্তির উদ্দীপনা মস্তিষ্কে আসে। মস্তিষ্কের ঐ উদ্দীপনা অঙ্গকে তৈরী করে মনের নির্দেশ পালন করতে হয়। অপরদিকে অঙ্গের অভাব বোধের প্রেরণা পেয়ে মনও তার কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়। এভাবে যেমন দেহের সাথে মনের সম্পর্ক বজায় থাকে তেমনি মন এই পদ্ধতির মাধ্যমে তার পুরো দেহরাজ্য শাসন করে। এই শাসন কার্য পরিচালনার জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থান থেকে এক এক রকমের সৈনিক (দূত) ছুটে যায় অঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। আবার নিম্ন অঞ্চল থেকেও সৈনিকরা খবর নিয়ে ছুটে আসে মস্তিষ্ক নামক মূল সচিবালয়ে। ঐ সচিবালয়ে নিয়োজিত মন্ত্রীগণ তখন খবর রিলে করে রাজার (আত্মার) নিকট। দেহের আত্মা বা রাজাই হলো মূল, তার মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই। কিন্তু দেহ নামের খোলসটি তার অবর্তমানে বাঁচতে পারে না।

দেহ আত্মার প্রকাশের আবরণ। এই আবরণটা ছাড়াও আত্মা চলতে পারে। তবে বাহন ব্যতীত সবার পক্ষে চলা কঠিন। আত্মা এ বাহনটিকে দিয়ে যখন কাজ করায় তখন সে দেহের আনুগত্যে কিছু সংখ্যক ভৃত্য দিয়ে একে কর্মতৎপর রাখে। এ দূত বা ভৃত্যগুলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই দূতগুলো বের হয়। প্রত্যেকের আবার নির্ধারিত উপদপ্তর প্রধান নিযুক্ত থাকে। আবার দেহের প্রান্ত ভাগ থেকে যেসব দূত খবর নিয়ে আসে তাদেরও বিভিন্ন নাম আছে। এরা সবাই দেহের বিশেষ শৈল্পিক সত্তা। এদের দিয়েই মন দেহরাজ্যটি শাসন করে। কিন্তু যে বিষয়টি ধর্তব্য তা হলো মন দেহের সত্তাধীন না হয়েও সে দেহের অনুগত ভৃত্য দিয়ে একে শাসন করে। তাছাড়া মন কোন সময় দেহ ও দেহের শৈল্পিক (মস্তিষ্কের) সত্তার ভেতর প্রবেশ করে না। তবু দেহ তার শাসন মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

আমাদের জড় মূর্তিটির (দেহের) আকার আয়তন ও ওজন আছে। এটি অবিভাজ্য নয়। কিন্তু মন অদৃশ্য ও অবিভাজ্য। তথাপি দেহ মনের শাসন মেনে

www.nagorikpathagar.org

চলে। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তার আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকে। না মেনে যাবেই বা কোথায়? কারণ এর পুরো রাজ্য জুড়েই মনের ক্ষমতা রয়েছে বিদ্যমান। অর্থাৎ মনের শাসন ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রে দেহের প্রতিটি স্থানে, প্রতি মুহূর্তেই মওজুদ থাকে। ক্ষণিকের জন্যও তার অবর্তমান হয় না। সজাগ অবস্থায় যেমন দেহের প্রতি তার নজর থাকে তেমনি গভীর ঘুমেও তা তার দৃষ্টির বাইরে থাকে না। কার্যত মনের কখনো ঘুমের প্রয়োজন হয় না। ঘুম, নিদ্রা, আহার, বিশ্রাম দেহের চাহিদা। এর সাথে মনের স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত কোন সম্পর্ক নেই। মন কখনো একে ছেড়ে আড়ালে থাকে না। মৃত্যু না হলে যতই দূরে থাক না কেন সেখান থেকে সে দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখে। তবে মন দেহ ছাড়াও আড়ালে থাকতে পারে। এতে মনের কিছুই অসুবিধা হয় না। বরং দেহ মনের অনুপস্থিতে পঁচে গলে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়।

বিশ্বপ্রভুর রাজ্যে যা কিছু দেখা যায়, আর যা দেখা যায় না এসব কিছুতেই আল্লাহর ক্ষমতা বর্তমান যা আমাদের দেহ ও আত্মার সম্পর্কের মতো বেষ্টন করে রয়েছে। পুরো রাজ্যটিই যেন তাঁর প্রকাশের আবরণ। তাঁর শৈল্পিক ক্ষমতার প্রকাশ। এর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে আর কাহারও রাজ্য নেই। মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ 'তাআলা এই বিশাল সৃষ্টি, সৃষ্টি জগতের মূল সত্তার অংশ বিশেষ দিয়েই একে নিজ ক্ষমতার মধ্যে বন্দি রেখেছেন। তাঁর ক্ষমতার জালের মধ্যেই সকল কিছু বন্দি। কোথাও ভিন্ন কোন স্বৈরশাসন নেই। কিংবা ক্ষমতা-শূন্য স্থান নেই। এ বিশাল জগৎ আল্লাহ পাকের আরশের সত্তাধীন এবং 'আরশ তাঁর ক্ষমতাধীন। 'আরশও যেমন তাঁর সৃষ্টি, তেমনি এ জড় জগতও তাঁর সৃষ্টি। সেই 'আরশের রজ্জু সৃষ্টির কোণায় কোণায় অবস্থিত। ফেরেশতাগণ আরশের রজ্জু ধরে সৃষ্টির অন্তর মূল পর্যন্ত ঘিরে আছে। আল্লাহ কখনো আরশে আরোহিত হন না আবার প্রবৃষ্টও হন না। তিনি বস্তুজাতও নন আবার শরীরিও নন। সকল সৃষ্টি তাঁর অস্তিত্বের কোন অংশ নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হতে পারে, যেমন আমরা মনে করতে পারি, আমাদের এ দেহটা আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সমষ্টিগত রূপ। তবে এ বিশাল জগৎ কী আল্লাহর অঙ্গ-প্রতঙ্গের রূপ? এ ধরনের ধারণা করা নেহায়েত অমূলক। কারণ আমরা যে দেহটাকে আমি বলে সম্বোধন করে থাকি আসলে ঐ দেহটি আমি বলে কিছু নয়। মূলত আমিই অন্য জিনিস। কারণ দেহ হলো আত্মার প্রকাশের আবরণ। তাই বিশ্ব রাজ্যটি প্রভুর প্রকাশের আবরণ মাত্র। তিনি নিজকে প্রকাশ করার জন্যেই এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। একটি মানুষের দৈহিক স্থূল মূর্তিটির মধ্যে যত ঘাত-প্রতিঘাত আসুক না কেন মন তার সম্পূর্ণ খবর রাখে।

www.nagorikpathagar.org

যেখানে যাই ঘটুক না কেন তিনি তার খবর রাখেন। কিভাবে খবর রাখেন সে বিষয়টি পূর্বেই বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন– "আমি ছিলাম গুপ্তধন, যখন প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন সৃষ্টি করলাম এ বিশ্ব জগৎ।"

এ বিশ্ব-জগতের কোথাও তিনি আরোহিত হন না, আবার প্রবৃষ্টও হন না। প্রথমে আমাদের মস্তিষ্কের ন্যায় তাঁর নির্দেশ 'আরশ বহন করে। তারপর সে নির্দেশের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সেখান থেকে তা রিলে হয় জড় জগতের দিকে। এ সকল নির্দেশ বহন করে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহর কিছু বিশেষ দূত নিয়োজিত রয়েছে। এদেরকেই বলা হয় ফেরেশতা। কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী যে ধরনের ফেরেশতা আসার কথা সে ধরনের ফেরেশতাই নির্দেশ পালন করে। আবার কিছু সংখ্যক ফেরেশতা আছে নিম্ন জগতে, তাঁরাও নিম্ন জগতের সংবাদ নিয়ে যায় আরশে। পবিত্র কুরআনুল মাজীদে আল্লাহ বলেন–

"তিনি মানুষকে (আদমকে) নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করেছেন।"

এ বাণীর সারমর্ম এই নয় যে, মানুষের জড় দেহের অনুরূপ আল্লাহর কোন জড় দেহ আছে। এ বাণীর প্রকৃত সারমর্ম হলো দু'রকম, যেমন আল্লাহর সৃষ্টি জগতের শাসন ব্যবস্থার নমুনা মানুষের (মনের) দেহ রাজ্যটির শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। অপরদিকে আল্লাহ যেমন ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতাশীল এবং তাঁর প্রেম ও সৃষ্টিধর্মী গুণ আছে তেমনি মানুষেরও অনুরূপ কিঞ্চিৎ গুণ আছে।

আমাদের জড় দেহের হৃৎপিণ্ড নামক এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আত্মা বাস করে বলে অনুমান করা হয়। আত্মা দেহটি শাসন করে স্নায়ুমণ্ডলী দিয়ে। এর মূল দপ্তর মস্তিষ্ক। এ মূল দপ্তরসহ তার সকল সাবস্টেশন, যোগাযোগের সকল পথ সবই আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ পুরো সিস্টেমটি আত্মার অধীনস্থ হয়ে কাজ করে। এর কাজের কৌশল অতি নিখুঁতভাবে তড়িৎ সম্পন্ন হয়। মনের সংকেত (Impulse) মস্তিষ্ক হয়ে, সেখান থেকে নিউরন হতে নিউরন হয়ে চলে যায় Nerve ending-এ। এ সময় স্নায়ুতন্ত্রের Neurone-এর কার্যকরী কোষ হতে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ঐ স্থানে নিঃসৃত হয়, যা কার্য সম্পাদন করার জন্য ঐ স্থানের মূল অঙ্গকে উদ্দীপনা যোগায়। এই প্রক্রিয়ায় মন দেহরাজ্যটি শাসন করে। মনের দেহরাজ্য শাসন ব্যবস্থার সাথে মহাপ্রভুর এ বিশাল জগতশাসন ব্যবস্থার কৌশল অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। দেহ রাজ্যের মূল দপ্তর হলো মাথা বা মস্তিষ্ক। তেমনি এ বিশাল জগতের মহামস্তিষ্ক হলো 'আরশ। এ 'আরশের শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি জগতের নিম্নাংশ পর্যন্ত ছাড়ানো। আমাদের দেহ রাজ্যের স্নায়ুতন্ত্রের মতোই এর সূক্ষ্ম জাল সর্বত্রই ছড়ানো।

www.nagorikpathagar.org

এখানে পার্থক্য হলো এতোটুকু, যেমন আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর মূল দপ্তরসহ এর সকল শাখা-প্রশাখা হলো দৃশ্যমান কিন্তু নিরাকার আল্লাহর সৃষ্টি জগতের স্নায়ুমণ্ডলী হলো অদৃশ্য। এই অদৃশ্য স্নায়ুমণ্ডলী ফেরেশতাদের দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। জড় সত্তার কার্যব্যবস্থার জন্য মনের মধ্যে যখন অভাববোধের তাড়না (Negative Impulse) সৃষ্টি হয় তখন ঐ তাড়না আলোর চেয়েও অসীম বেগে সৃষ্টি জগতের প্রধান দপ্তরের দিকে ছুটে যায়। এটি হলো Afferent Impulse (অন্তর্মুখী তাড়না)। এর প্রধান দপ্তরের নামই হলো 'আরশ। তারপর সেখান থেকে ছুটে আসে কর্মের নির্দেশ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টিকূলের প্রতিটি কর্ম সম্পাদন হয়।

অপরদিকে মহাপ্রভুর ইচ্ছার প্রেক্ষিতে 'আরশ থেকে যে Impulse আসে, একে বলা যায় Negative Impulse। তাই এই বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর অজানা থাকে না। অদেখা থাকে না, অবাধ্য হয়ে কেউ কাজ করতে পারে না। এ ব্যবস্থার কোন কিছুই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না বলে আমাদের বোধগম্য হয় না।

আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে যেমন বিভন্ন স্টেশন (Junction) থাকে, যার নাম Ganglion। আবার দু'টি স্টেশন এর সংযোগকারী পথকে বলা হয় synapse অনুরূপভাবে এই বিশ্ব-জগতের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্টেশন। এর নাম মঞ্জিল বা ছাদ এবং একটি মঞ্জিল হতে অপর মঞ্জিলের মধ্যবর্তী স্থান হলো আসমান। এটি আমার দর্শন-মনের অনুমান। আল্লাহ হাফেজ। তিনিই তা ভাল জানেন। সৃষ্টিকে জানা, বুঝার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর বড়ত্ব জানা বুঝা যায়। তাই আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে এক মিনিট চিন্তা করা সারারাত নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। গভীর ধ্যানে যখন মহাপ্রভুর কুদরতের সাগরের দিকে নজর দেয়া যায় তখন দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার পায়ের ধ্বনিও তাঁর অজানা থাকে না। মহাপ্রভুর অসীম স্নায়ুমণ্ডলীর নিখুঁত ব্যবস্থার মাধ্যমেই সে খবর তাঁর কাছে পৌছে। এ জগতময় যা কিছু ঘটে, সবই এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। মানুষের একটি অঙ্গ যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় তবে ঐ স্থানের স্নায়ু ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। এতে তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ব্যাহত হয়। জীবনের গতি থেমে যায়। সে অলস ও অকর্মন্য হয়ে পড়ে। এই জগতের গতি ও তার সৃজনশীলতা একথাই প্রমাণ করে যে, এটি যেমন স্নায়ু ব্যবস্থাহীন নয় তেমনি তা বিকলাঙ্গও নয়। এটি সচল ও মহানিয়ন্ত্রকের অধীন। এ জগতের অনুরূপ দৃশ্য দেখে মনে হয়, এই জগৎ মৃত নয় বরং জীবিত। এ জগতের আড়ালে থেকে যিনি একে জীবিত রেখেছেন তিনিই 'আল্লাহ'।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ আছেন বলেই এ জগৎ জীবিত আছে। এ জগতের কাঠামো আছে বলেই এর কোন কিছুই আল্লাহর জানার বাইরে থাকে না। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁর আদেশ নিয়েই এর কার্যব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তাই সমুদ্রের অতল পানির নিচের একটি সূক্ষ্ম প্রাণীর খবরও তাঁর অজানা থাকে না। মহামস্তিষ্ক বা 'আরশের বিস্তৃত পরিসীমার মধ্যে থেকে এ বিশাল জগতের কার্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য (বিভিন্ন অঞ্চল থেকে) ভিন্ন ভিন্ন দূত প্রেরিত হয়। তাদের নাম, কাজ-কর্ম ও ক্ষমতার সীমা দেয়া আছে। এরা প্রভুর অনুগত ভৃত্য। যখন যা আদেশ করা হয় তা তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাই এই জগৎ কখনো বিকল হয় না, থেমে থাকে না।

আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার খুবই ক্ষুদ্র। তাই আখ আর মরিচের খাদ্য মান কেন এমন হলো সেটিই বলতে পারি না। সেই তুলনায় এই বিশাল জগৎ তো অসীম। এ অসীম জগৎ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে যখন জ্ঞানের ভাণ্ডার খালি হয়ে যায় তখন এমনিতেই নিদ্রা আসতে থাকে। কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি জানার স্পৃহায় নিদ্রাকে দেয় বনবাস। যাঁরা যুগে যুগে নিদ্রার সাথে বিরহ করে খোদার কুদরতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা অনেকেই সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করতে পেরেছেন। এক কালের যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞান সাধক ইমাম গাজ্জালী (র) বলেছেন, "প্রত্যেক ইচ্ছার প্রভাব যেমন প্রথমে আমাদের মনে আরম্ভ হয়ে, ক্রমে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গে বিস্তারিত হয়, তেমনি জড় জগতের প্রতিটি কার্য ও ঘটনার মূল আল্লাহর ইচ্ছা 'আরশে সূত্রপাত হয়।" (সৌভাগ্যের পরশ মনি-৬১) আল্লাহ বলেন– "তারপর 'আরশকে আল্লাহ নিজ আধিপত্যের অধীন করলে জাগতিক কার্যাবলী সুচারুরূপে চলতে লাগল।" (আল-কুরআন)

আমাদের দেহ রাজ্যের ওপর মনের যে শাসন ক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তার সাথে আল্লাহর রাজ্যশাসন ব্যবস্থার যে উপমা তুলে ধরা হলো, তা নিতান্তই দুর্বল ও কিঞ্চিত উপলব্ধি মাত্র। কারণ পরম করুণাময়ের রাজ্য শাসন ব্যবস্থার উপমা তুলে ধরার মতো আর কোন রাজ্য না থাকায়, এর বিকল্প কিছু চিন্তা করা যায় না। তবে আমাদের দেহ রাজ্যের সাথে আল্লাহর রাজ্য শাসন ব্যবস্থার অনেকাংশে মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে। তাছাড়া আমাদের জ্ঞান ও বোধশক্তির মধ্যে তা তুলে ধরা অনেকাংশে বোধগম্য। অন্যথায় তা বুঝাই কষ্টকর হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ বিশ্ব আল্লাহ্‌র কোন বাহ্যিক রূপ, কাঠামো নয়। এ জগৎ তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ চিত্র। এর সকল কিছুই তাঁর পোষ্য বা ক্ষমতাধীন। তাঁর নির্দেশ 'আরশ বহন করে। অতঃপর সেখান থেকে বিভিন্ন মঞ্জিল হয়ে তারপর

www.nagorikpathagar.org

আসমান হয়ে যমীনে পৌঁছে। কিন্তু আল্লাহর 'আরশ, কুর্সী, লওহ, কলম, আসমান, যমীন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির Impulse-ই নূর। তাই আল্লাহর অভিব্যক্তিই এই বিশাল জগতের অস্তিত্বের কারণ। যখন আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না তখন এ বিশ্বের বস্তু ও তার উপাদান কোন গোপন ভান্ডারে মওজুদ ছিল না। আল্লাহর প্রকাশ হওয়ার অভিব্যক্তির বিচ্ছুরিত সত্তাই হলো নূর। সেই নূরের উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তনের সার্থক রূপ হলো এই জড় জগৎ। এই জগতের কার্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে নূরের তৈরী ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। তাঁরা অদৃশ্য। এঁদের কোন আকার, আকৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, বিজ্ঞানের এ দিকে কোন নজর নেই। কিন্তু ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব যতই রহস্যময় মনে হোক না কেন, সূক্ষ্ম চিন্তা করলে এদেরও বিজ্ঞানভিত্তিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি সঠিক ধারণা পাওয়া যায় তবে আল্লাহর রাজ্যশাসন ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছতা লাভ করা সম্ভব।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফেরেশতার অস্তিত্ব

ফেরেশতা হলো আল্লাহ 'তাআলার সৃষ্ট অদৃশ্য ভৃত্য। এরা আল্লাহর হুকুমে বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। গায়েব বা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে আমরা একেবারেই অন্ধ। যিনি একমাত্র আলেমুল গায়েব, তিনি সে জগৎ সম্পর্কে জানেন, শুনেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই হলেন আলেমুল গায়েব। তাই অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে খবর রাখা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। দ্বীন ইসলামের মূল শর্ত হলো অদৃশ্যে বিশ্বাস করা। অদৃশ্য জিনিস দেখেই বিশ্বাস করতে হবে সেটি ঈমানের শর্ত নয়। কারণ অদৃশ্য জিনিস দেখা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। তাই আল্লাহ যে জিনিস বিশ্বাস করতে বলেছেন তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা অপরিহার্য। ফেরেশতা জাতি অদৃশ্য জগতে বিরাজ করে। এদের অস্তিত্বে বিশ্বাসীগণ না দেখেই দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ সমাজে এমনও অনেক লোক আছে যারা অদৃশ্যের কোন কিছুই বিশ্বাস করতে নারাজ। এ ছাড়াও আর একদল আছে সন্দেহবাদী। না দেখে যারা বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের কথা হলো বিজ্ঞানের যুগে অনুমানের ওপর অন্ধ বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। বিশ্বাসের জন্য সকল কিছু বিজ্ঞানের তত্ত্ব নির্ভর হতে হবে। অন্যথায় সে বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। অপরদিকে সন্দেহবাদীদের ধারণা হলো অদৃশ্য সত্তা থাকতেও পারে, নাও থাকতে

www.nagorikpathagar.org

পারে। এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণের কিছু আশা করা যায় না।

যে জিনিস দেখা মানুষের দৃষ্টি ক্ষমতার বহির্ভূত সে সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব দেয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছতে হলে প্রথমে অনুমানকে ধার নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। বিজ্ঞান যে একেবারে কল্পনা আর অনুমান থেকে মুক্ত তা কেউ বুকে টোকা দিয়ে বলতে পারবে না। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই অনুমানকে হাতিয়ার না করে কোন তত্ত্বকে বিজ্ঞানীগণ সঠিকভাবে সংজ্ঞা দিতে পারেনি। কারণ 'মনে করি' কিংবা 'ধরি' এরূপ কল্পনার ভিত্তি ধার করে বিজ্ঞান শুরু থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন সিঁড়ি পার হয়ে এত দূর অগ্রসর হতে পেরেছে। রোবটের যুগেও বিজ্ঞান অনুমানের ওপর ভিত্তি করে চলা বাদ দিতে পারেনি। তাই অনুমানের কাঁধে ভর না করে বিজ্ঞানের পথ চলা যেমন কঠিন তেমনি অনুমানকে অবিশ্বাস করাও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অপাংক্তেয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের কণা তত্ত্ব, ঢেউ তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, পরমাণুবাদ, এসবই অনুমানের ওপর ভর করেই অগ্রসর হয়েছে। বিজ্ঞান যে অনুমানকে ধার নিয়ে পথ চলে, প্রকৃতপক্ষে এই অনুমান সত্য হওয়ার মূলে কিছু অকাট্য যুক্তিনির্ভর বাহন তার মধ্যে লুকায়িত থাকে। যার ফলে সেই অনুমানের বস্তুটি পরবর্তীতে সত্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়। যখন আমরা অনুমানের ওপর নির্ভর করি তখন একে যেমন ইন্দ্রিয় চোখে দেখা সম্ভব হয় না, তেমনি এর বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ বের করা জ্ঞানে ধরে না। জ্ঞানের আপেক্ষিকতার জন্য তার মূল কারণ বের করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যারা না দেখে বিশ্বাস করতে রাজি নয়, তারা মূলত এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করেন। আমরা যেসব জিনিস দেখতে পারব, কিংবা সকল কিছুর যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে পারব, একথা ভাবা মোটেও উচিত নয়। কারণ জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। তাই অনুমানকে যদি যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে তা বিশ্বাস করতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার কথা নয়।

কর্মের প্রথম শর্ত হলো বিশ্বাস। একজন লোক যদি বিশ্বাস করে, এক মাস চাকরি করলে সে বেতন ভাতা পাবে, তবে সে কাজে লেগে থাকবে। কিন্তু তার যদি এ সন্দেহ থাকে যে, বেতন ভাতা পাওয়া যাবে না, তাহলে সে কাজ করবে না। তবে একথাও সত্য, কাজ না করে কেউ মজুরী পাওয়ারও আসা করতে পারে না। সেজন্য বিশ্বাসকে যাচাই করতে হলে একাগ্রচিত্তে কর্মে লেগে থাকতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আমরা যদি ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব বিশ্বাসের বেলায় বিজ্ঞানের অনুমান নির্ভর বাহনের মতো অবলম্বন ধার করে অগ্রসর হতে থাকি তখন ঐ বিশ্বাস যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের কতিপয় মূলনীতির ওপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের মূল শর্ত হওয়ায়, এই বিশ্বাসের সাথে কর্ম সম্পর্কিত। কেউ যদি বলে ঐ রাস্তায় রাতে ডাকাত থাকে, যারা একথা বিশ্বাস করবে তারা এই পথে না গিয়ে হয়ত অন্য পথে যাবে, নতুবা রাতের বেলায় ঐ রাস্তা দিয়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না তারা এপথে যাবেই। বিশ্বাসের সাথে কর্ম যখন এক হয় তখন বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বা উপাদান দেখা না গেলেও যদি এই ধারণার মাধ্যমে সাময়িকভাবে এ দুনিয়াতেই কিছু সুফল লাভ পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝতে হবে বিশ্বাসের উপাদান অদৃশ্য হলেও তার অস্তিত্ব বিরাজমান।

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীর কর্ম যদি দুনিয়ার জীবনেই কুফল বয়ে আনে তবে বুঝতে হবে তাদের অবাধ্যতা ও কর্ম ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। কার্যত দুনিয়ার জীবনেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর কাজকর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ চরিত্রের ভালো-মন্দ গুণাগুণ এবং তার সুফল-কুফল আকাশ-পাতাল ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়। এতে বিশ্বাসের গুরুত্বের সাথে কর্মের শর্ত একথাই প্রমাণ করে যে, এ জড় জগতের আঁড়ালে ফেরেশতা জাতির পদাচরণ বিরাজমান।

আমরা আল্লাহ্‌কে নিরাকার হিসেবে বিশ্বাস করি। তিনি এ জাহানের প্রভু বা সৃষ্টিকর্তা। কেন আমরা না দেখে তাঁকে বিশ্বাস করি? এর মূল কারণ হলো এই বিশ্বাসের পেছনে অগণিত যুক্তি আছে। এসব যুক্তি এমন অকাট্য বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যা বাদ দিলে মানুষের বিবেক বুদ্ধির অসারতা প্রমাণ হয়ে যায়। বিবেক বুদ্ধি দিয়েই মানুষ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। যে সত্য ভুলের ঊর্ধ্বে সেখানেই মানুষের বিশ্বাস নোঙ্গর করে। দুনিয়ার যমীনে মানব জাতির পদাচরণ থেকে নিয়ে মানুষ এ বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি না তা খুঁজে ফিরেছে। দিনে সূর্যকে দেখে মনে করেছে এটিই বিশ্বের প্রতিপালক। কিন্তু যখন সূর্য ডুবে গেল তখন চাঁদকে আকাশে দেখে ভেবেছে এটিই খোদা। আবার যখন চাঁদ, সূর্যকেও আকাশে দেখে নাই তখন তাদের ভুল ভেঙ্গেছে। এভাবে সন্ধান করতে করতে এক সময় আদি থেকে শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে যখন ঠেকে গেল, তখন দেখল এর আর কোন আদি থাকতে পারে না। তখন ভাবল, এই বিশ্বে অনাদি হতে যিনি বিরাজ করছিলেন তিনিই এক আল্লাহ।

পক্ষান্তরে শূন্য থেকে এ বিশ্ব সৃষ্টি হওয়া অবাস্তব। কিন্তু অদ্বিতীয় একের বেলায়

www.nagorikpathagar.org

কিনার বা মাত্রা থাকে না বলেই তিনি নিরাকার। কারণ কিনারের প্রশ্ন আসলেই একাধিক্য প্রমাণ হয়ে যাবে। যিনি এই বিশ্বের সচলতা বজায় রেখেছেন তিনিই আল্লাহ, 'খালিক'। বিজ্ঞানের বেলায় যখন সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সেখানে বিজ্ঞান ধার করেছে বাহনের। এই বাহনগুলো হলো 'মনে করি', কিংবা 'ধরি' অথবা কোন ধ্রুব সংখ্যা। এর ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কার্যত প্রথম বাহনকেই যদি অস্বীকার করা হয়, তবে সম্পূর্ণ তত্ত্ব বা সূত্রই ভুল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এসব তত্ত্ব বা সূত্রের সুফল দেখে কেউ এর বাহনকে অস্বীকার করে না।

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং দ্বীন ইসলামের কতিপয় মূলনীতির ওপর দৃঢ় আস্থা রেখে কর্মের মাধ্যমে তার শর্ত পূরণ করলে যে সুফল পাওয়া যায়, এর ওপর ভিত্তি করে কোন লোক এই সত্যের বিপক্ষে বাহাছ করতে পারবে না। কিন্তু এরপরও যারা সে সত্যের বিপক্ষে পথ ধারণ করে আমি এদেরকে জ্ঞান শূন্য জড় বস্তুই মনে করি।

বর্তমান চন্দ্রবিজয়ের যুগেও মানুষ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনকে অবজ্ঞা, অবহেলার বিষয় মনে করে না। আমার মতে বিজ্ঞান যেখানে অচল সেখানেই দর্শনের সার্থকতা ও মূল্য বেশি। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে অনেক সময় মৃত্যু পথযাত্রীদেরকে বার বার চোখ ঢাকতে দেখা যায়। কেন তারা চোখ ঢাকে তা আমরা ধরতে পারি না। নিশ্চয়ই তাদের চোখের সামনে তখন কিছু অদৃশ্য সত্তা মূর্তিমান হয়ে দেখা দেয়। পাশে বসে আত্মীয়-স্বজনরা তা অনুমান করতে না পারলেও সে তা দেখে থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এক ফেরেশতা ('মৃত্যু দূত') প্রাণ কেড়ে নেয়। প্রাণ কেড়ে নেয়ার সময় সে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির কাছে আসে। তখন হয়ত সে তাকে লক্ষ্য করে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার চন্দ্র জয় করতে পারলেও মৃত প্রায় ব্যক্তির চোখের সামনে কি ভাসে তার সন্ধান এটি দিতে ব্যর্থ। আসলেই বিজ্ঞানযন্ত্রে তা ধরা পড়ার কথাও নয়। কিন্তু দর্শনের যুক্তির মাধ্যমে আজ বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সেই ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন কিছু নয়। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে জানার জন্য আকাশেও ঘুরতে হবে না, পাতালেও নামতে হবে না। নিজের দেহ রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্তর চোখে সন্ধান করতে পারলেই সৃষ্টি সম্পর্কে জানা যাবে বলে পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয়া আছে।

মহাজ্ঞানভাণ্ডার কুরআনুল মাজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন– "আমি তাদেরকে বাহ্যিক জগতে এবং তাদের (অর্থাৎ মানুষের) দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকি। যার ফলে সত্যের গূঢ় তত্ত্ব তাদের নিকট প্রকাশিত হবে।" (সূরা হামীম আস সাজদা, পারা-২৫, রুকূ : ৬)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে নিজ অনুরূপে সৃষ্টি করেছেন।" (আল-কুরআন)

"তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন, তুমি কি তা দেখ না।" (আল-কুরআন)

পরম কুশলী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার বাণী আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বুঝা খুব কঠিন। আমাদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও বুযুর্গ তাঁরা এ থেকে অনেক সত্য খুঁজে পেয়েছেন। সেজন্যই বুযুর্গগণ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে, সে তার প্রভু আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পেরেছে।" এ বিষয়টি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। যেহেতু নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই সৃষ্টির গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়ার মতো ইঙ্গিত দেয়া আছে, তাই ফেরেশতা সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়ার আশায় আকাশে কিংবা পাতালে না ঘুরে নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ফেরেশতা হলো আল্লাহর আদেশ নির্দেশ পালনকারী দূত। এ বিশ্ব মুলুক আল্লাহর রাজ্য। এ জগৎ আল্লাহর প্রকাশের আবরণ। এর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তাঁর কিছু কর্মচারী প্রয়োজন। প্রয়োজন অতি আজ্ঞাবহ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ভৃত্যের। বিশ্ব ব্যবস্থার কাজের ধারা ও তার প্রকৃতি এক রকম নয়। সেই সাথে সবার বেলায় একই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এদিকে কাজের ভিন্নতা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ক্ষমতার প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য এই দূতগণ এক রকম নয়। এদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও সার্বিক প্রকৃতি যেমন ভিন্ন তেমনি তাদের আঞ্চলিক দপ্তর ভিন্ন। তার মাঝে ভিন্ন দপ্তর থেকেই বিশ্ব ব্যবস্থার ভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য পালিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব ব্যবস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ড মানব প্রকৃতির স্থূল দেহ রাজ্যটির শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। মানব আত্মা দেহরাজ্য শাসন করার জন্য যেমন বাইরে থেকে কোন কর্মচারী আমদানী বা নিয়োগ দিতে হয় না তেমনি এ বিশাল বিশ্ব কাঠামো শাসন করার জন্য আল্লাহও বাইরে থেকে কোন কর্মচারী নিয়োগ করেননি। মানব দেহের মূল সচিবালয় যেমন মস্তিষ্ক তেমনি বিশ্ব প্রকৃতির মূল সচিবালয় আল্লাহর 'আরশ। মস্তিষ্ককে ঘিরে তার যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে– এগুলোকে বলা হয় স্নায়ুমণ্ডলী। তেমনি এ বিশাল জগতেরও রয়েছে এক অদৃশ্য স্নায়ুমণ্ডলী। এই স্নায়ুমণ্ডলীর সকল কার্যধারা যেমন মনের অধীন, অনুরূপভাবে বলা যায় বিশ্বের মহাস্নায়ুব্যবস্থা আল্লাহর অধীন। আমাদের কাজের প্রকৃতি প্রথমে

www.nagorikpathagar.org

যেমন স্মৃতিতে অঙ্কিত হয় তেমনি আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব 'আরশে পতিত হয় এবং তাঁর ইচ্ছার অভিব্যক্তির প্রতিচ্ছবি লওহে মাহফুজে অঙ্কিত হয়।

আমাদের দৈহিক কাঠামোর মধ্যে এমন কতক দূত আছে যারা স্নায়ুমণ্ডলীতে বিরাজ করে। এসব দূত আমাদের মনের নির্দেশ সরাসরি সংশ্লিষ্ট অঙ্গে রিলে করে। মনে যখন কোন কাজের প্রেরণা বা অনুভূতি জাগে তখন ইচ্ছার প্রভাব মস্তিষ্কে আরোপিত হয়। তখন মনের ইচ্ছার প্রকৃতি অনুযায়ী মস্তিষ্ক হতে এক ধরনের প্রবাহ বা সংকেত কার্য সম্পাদনকারী অঙ্গের অগ্রভাগের দিকে চলে যায়। ঐ সংকেত পেয়ে তৎক্ষণাৎ কার্য সম্পাদনকারী অঙ্গের অগ্রভাগের স্নায়ুর কোষ থেকে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বা জৈবরস নিঃসৃত হয়। এই জৈবরসের উদ্দীপনাতে অঙ্গটি কাজ করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে অঙ্গ প্রতঙ্গের অগ্রভাগ থেকেও এক ধরনের দূত অঙ্গের অভাববোধের সংকেত নিয়ে মস্তিষ্কে ছুটে আসে। তারপর সেটি রিলে হয় মনের কাছে। এতে মন তার প্রয়োজন মেটানোর আবদার পালন করে। তড়িৎ প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ দেয়া তার নীতি বিরুদ্ধ নয়। বরং পরোক্ষভাবে দেহ তার অনুগত থাকায় তার আবদার রাখে। অন্যথায় দেহের যে কোন অংশ অভাবের তাড়নায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যাবে।

আমাদের 'মন' নামক শাসকের নির্দেশে মস্তিষ্ক হতে যে সংকেত বের হয়ে আসে তা কি? মূলত এটি এক ধরনের Impulse বা চেতনা শক্তি। তার প্রকৃতি ঢেউ সাদৃশ্য, এতে মনের অভিব্যক্তি ভরা থাকে। তাই সেটি মনের ইচ্ছা শক্তি বা অভিব্যক্তির প্রতিধ্বনি বা নির্দেশ। আসলে মনের চেতনা শক্তি বা ঢেউ-এর কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর কাজের প্রকৃতি নির্ভর করে। পরিশেষে এর ক্রিয়া ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী মূল স্নায়ুমণ্ডলীর অগ্রভাগের কোষ থেকে যে রাসায়নিক শক্তি বা জৈব রস নিঃসৃত হয় এটিই দেহের সংশ্লিষ্ট অংশকে কাজ করাতে সাহায্য করে। মানব দেহের এই রাসায়নিক শক্তির নাম Nor-adrinaline এবং Acetailcholine (Ach) অন্যতম। এগুলো কাজের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলীকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন Para sympathetic এবং sympathetic। এর মধ্যে Para sympathetic স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হলো Imspiratory Impulse (উত্তেজনাকর তাড়না) প্রেরণ করা এবং Sympathetic স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হলো Inhibitory Impulse প্রেরণ করা। একটি অঙ্গকে উত্তেজিত করে অন্যটি নিবৃত্ত করে। আমাদের দেহের শৈল্পিক সত্তার মধ্যে Nervous system-এর কাজ খুব জটিল।

www.nagorikpathagar.org

তবু তা দেহেরই অংশ। এটি মনের অংশ নয়। তাই এটি অদৃশ্য নয়। অন্যদিকে Nerve ending (স্নায়ুর অগ্রভাগ) থেকে যে জৈবরস নিঃসরণ হয় সেগুলোরও যেমন অস্তিত্ব আছে তেমনি এর প্রকৃতিগত অস্তিত্বও অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের আত্মার শাসিত দেহরাজ্যটি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা এই বিশাল বিশ্ব-জগতের শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। আত্মার নির্দেশ পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলে পৌছতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, একে সময়ের শিকল দ্বারা পরিমাপ করা খুব কঠিন। তেমনিভাবে এই বিশ্ব-জাহানের প্রভুর নির্দেশ প্রতিটি জড় আর অজড় সত্তাতে পৌছতে কোন বিলম্ব হয় না। একটাও সময়ের শিকল দ্বারা পরিমাপ করা কঠিন।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এ বিশাল সৃষ্টি জগতের একটি মহাস্নায়ুমণ্ডলী আছে। সে স্নায়ুমণ্ডলীর শৈল্পিক সত্তা অদৃশ্য। এটি ফেরেশতা জাতির মাধ্যমে সৃষ্টির অন্তর-মূল পর্যন্ত বিস্তৃত। মহাপ্রভু আল্লাহর নির্দেশ এই মহাস্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমেই প্রেরিত হয়। প্রথমে এই নির্দেশ আমাদের মস্তিষ্কের মতোই আল্লাহর 'আরশ বহন করে। তারপর সেখান থেকেই তা ছুটে যায় সৃষ্টির বিভিন্ন অংশে। এই নির্দেশ কাজের উদ্দীপনা দিতে বা নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে। মূলত এই নির্দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী মহা স্নায়ুমণ্ডলীর প্রান্তভাগ বা অগ্রভাগে এসে যে সত্তা রূপ নেয়, সে সত্তাই হলো প্রধান প্রধান ফেরেশতা। এদের অস্তিত্ব জড় প্রকৃতির বাইরে। তাই আমরা একে দেখি না। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষণে সেই পরপারের যাত্রী তার অস্তিত্ব দেখে চোখ ঢাকে। তখন তার সবকিছু অবশ হয়ে যাওয়ার ফলে সে জড় প্রকৃতির জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাই তার সামনে ঐ সত্তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট মনে হয়।

আমাদের মনের নির্দেশের পিঠে চড়ে যে অভিব্যক্তি অঙ্গ প্রতঙ্গের দিকে ছুটে আসে একে তথ্যকণাও বলা যায়। এই তথ্যকণা ঝাকুনি বা তরঙ্গের মতোই। আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা হলো, বস্তু, কণার আকারেও থাকতে পারে আবার ঢেউ-এর আকারেও থাকতে পারে। আমরা নিজেদের দেহের ভেতরে যেমন এই তরঙ্গের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি না, তেমনি অন্যের দিকে লক্ষ্য করেও তার কোন লক্ষণ বুঝি না। কিন্তু কাজের প্রেরণা পাই বলেই তার অস্তিত্ব স্বীকার না করে পারি না। তবে স্নায়ুর অগ্রভাগে এসে ঐ সত্তার উদ্দীপনাতে যে উত্তেজনাকারী সত্তা নিঃসরণ হয় তার অস্তিত্ব দেহকোষের অন্যত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো স্থায়ীভাবে কখনো দেহকোষের অগ্রভাগে মওজুদ থাকে না। মনের নির্দেশের ঝাকুনির মাধ্যমে সেটি বের হয়। সেদিক থেকে মহাপ্রভুর নির্দেশ অতি

www.nagorikpathagar.org

সূক্ষ্ম ধরনের এক পরম সত্তা। তাঁর নির্দেশের ঝাকুনি থেকে কার্য সম্পাদনের জন্য যে সত্তা রূপ ধারণ করে, তাও খুব সূক্ষ্ম জিনিস। এদের অস্তিত্বও যত্রতত্র মওজুদ থাকে না। প্রয়োজনের সময় তা অস্তিত্ব ধারণ করে আবার মিলিয়ে যায়। যার ক্ষেত্রে এবং যেখানে সে অস্তিত্ব লাভ করে, সে-ই শুধু বিশেষ মুহূর্তে তাঁর অস্তিত্ব টের পায়।

এ বিশ্ব-জাহানের অদৃশ্য স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফেরেশতাগণের কাফেলায় গাঁথা। তাঁর নির্দেশের অস্তিত্ব ফেরেশতাতুল্য। পক্ষান্তরে এই নির্দেশের ফলে যে সত্তা মূর্তি ধারণ করে এরাও ফেরেশতা। এরা কার্য সম্পাদনকারী দূত বা সৈনিক। অর্থাৎ মহা প্রভুর ইচ্ছার প্রভাব যে সত্তার ওপর আরোপিত হয়, এর ফলে ঐ সত্তা থেকে যে নতুন সত্তা অস্তিত্ব লাভ করে, তার নামই ফেরেশতা। বিশ্ব প্রভুর স্নায়ুমণ্ডলীর সকল কিছুই অদৃশ্য বলে এর কোন অংশই আমরা দেখি না। কার্যত তা দেখার কথাও নয়। যারা অতি মানব তাঁরাই শুধু এদের অস্তিত্ব দেখে থাকেন। কিন্তু না দেখলেই যে বিশ্বাস করা যাবে না এমন তো কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

আমাদের দেহের স্নায়ু ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা দিলে দেখা যায় পুরো সিস্টেমটিও ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে, হাঁটা চলা সম্ভব হয় না, পথ চলার গতি থেমে যায়, শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকে না। যদি এ বিশ্ব-জগতের কোন স্নায়ু ব্যবস্থা না থাকতো তবে এটির গতি এবং অস্তিত্বও অনেক আগেই যথাক্রমে মন্থর ও নির্জীব হয়ে পড়ত। তখন আর পাখিরা গান গাইত না, আকাশে চাঁদ-সূর্যের উদয় হতো না। সুদূর আকাশে তারার মেলা বসত না। বস্তু স্বীয় মূর্তিমান অবস্থায় টিকে থাকতে পারত না। যারা পৃথিবীর অদৃশ্য স্নায়ু ব্যবস্থার কথা, ফেরেশতার কথা অস্বীকার করে তারা যদি একটি প্যারালাইসিস রোগীর দিকে লক্ষ্য করে আকাশের দিকে তাকায়, তবে এর সত্যতা স্বীকার না করে উপায় থাকবে না। কেননা এ বিশ্বের কোন স্নায়ুমণ্ডলী না থাকলে এই আকাশ ও জমিন বিচলিত হয়ে পড়ত। আল্লাহ বলেন– "তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর অফুরন্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত তোমাদের ওপর পূর্ণ করে রেখেছেন। অথচ একদল লোক কোনরূপ জ্ঞান, হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনকারী পুস্তক ব্যতিরেকেই আল্লাহর বিষয়ে ঝগড়া করে।" (সূরা-৩১ : ২০)

www.nagorikpathagar.org

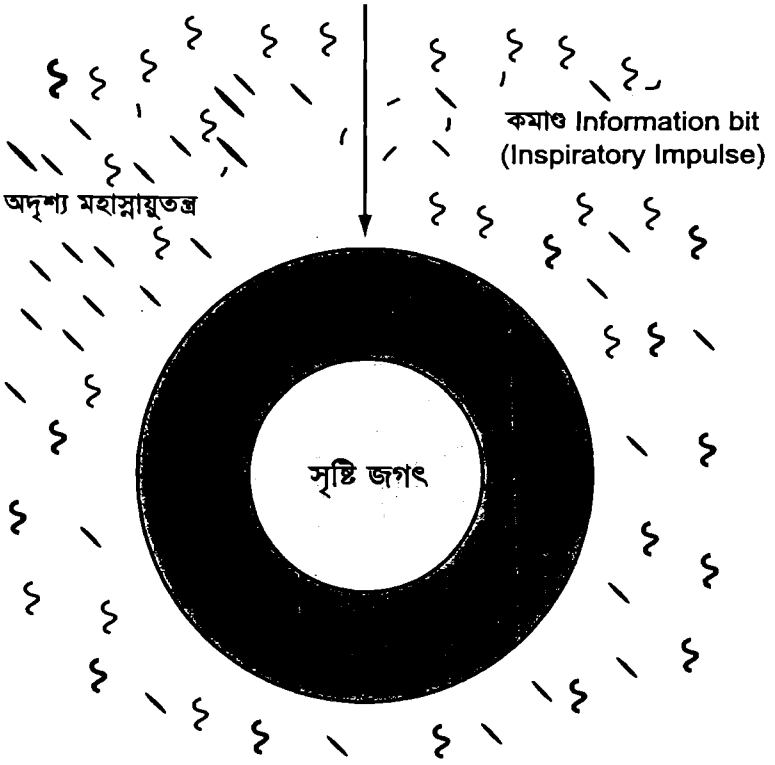

[ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গুণহীন স্রষ্টার "কমাণ্ড তথ্য কাঠামোই" হলো ফেরেশতা।]

www.nagorikpathagar.org

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন যেন তারা বিচলিত না হয়।" (সূরা-৩৫ : ৪১)

"ফেরেশতাগণ ও আত্মা সেদিন তাঁর দিকে অধিরোহণ করবে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।" (সূরা-৭০ : ৪)

ঈমান বিল গায়েব কথাটির অর্থ, অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু অনেক সময় ধরা, ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তবে বিশ্বাসের সাথে কর্মের সম্পর্ক ঠিক থাকলে, এক সময় বিশ্বাসের বিষয়বস্তু অদৃশ্য হলেও তার গুপ্ত সন্ধান ও অস্তিত্ব জ্ঞান অতিইন্দ্রিয় স্তর থেকে ইন্দ্রিয়ের স্তরে নেমে আসে। তাই ঈমান বা বিশ্বাস ব্যতীত সত্যের নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন।

মৃত্যু কি? এ সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে, আমাদের মস্তিষ্কের Inhibitory Impulse-এর কার্য ব্যবস্থার সাথে বিশ্ব প্রভুর স্নায়ু ব্যবস্থার আজরাইল (আ)-এর কার্য নীতির যোগসূত্র রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্কের প্রেরিত Inhibitory Impulse দেহের অনেক অংশকে সাময়িকভাবে কর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখে। অর্থাৎ মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি শরীরের কোন অংশ দুর্ঘটনায় পড়ে যায়, তখন মন থেকে যে নির্দেশ পাঠানো হয় এর নাম Inhibitory Impulse। এর মাধ্যমে Nerve ending (স্নায়ুর প্রান্তিকভাগ) থেকে যে রাসায়নিক রস বা জৈব রস নিঃসৃত হয়, সেটিই শরীরের দুর্ঘটনা কবলিত অংশকে ঐ স্থান থেকে সরিয়ে আনে বা নিবৃত্ত করে।

আমাদের দেহে জৈব শক্তির কাজ সাময়িকভাবে স্থায়ী থাকে। পুনরায় যখন ঐ অংশের স্বাভাবিক কাজকর্ম করার প্রয়োজন হয়, তখন Inspiratory Impulse তাতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এতে ঐ অংশটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। শরীরের ঐ অংশে এই দু'ধরনের শক্তির ক্রিয়া অতি কাছাকাছি ব্যবধানের মধ্যে ঘটে বলে এতে তার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু নিবৃত্ত করার পর যদি উদ্দীপনা সৃষ্টি করার শক্তি অচল হয়ে যেত তবে ঐ অংশ চিরদিনের জন্যেই অচল হয়ে পড়তো।

মহাপ্রভুর বিশ্ব-জাহানের অদৃশ্য স্নায়ুমণ্ডলীর Inhibitory Impulse-এর ক্রিয়ায় যে অদৃশ্য সত্তা মূর্তিধারণ করে দুনিয়ার জীবনের ব্যস্ততম প্রাণীর প্রাণ বায়ু বের করে নিয়ে, তাকে স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে কিছু সময়ের জন্য নিবৃত্ত রাখে, একে আমরা মৃত্যু হিসেবে গণ্য করলেও আসলে এ মৃত্যু চিরমৃত্যু নয়। এ মৃত্যু একটা কালের বিশ্রাম। পূর্বের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে (মৃত্যু কি?) উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

আমরা যখন খেতে খেতে পেট ভর্তি করে ফেলি তখন পেট থেকেই না খাওয়ার

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মস্তিষ্কে সংকেত পাঠানো হয়। এ কাজটি একটি System-এর মাধ্যমে ঘটে। এই System টিকে বলা হয় Feed back mechanism। এ ব্যবস্থাপনায় খাওয়ার তৃপ্তি নিবৃত্ত হয়ে যায়। এতে খাওয়ার কাজ সাময়িক সময়ের জন্য নিবৃত্ত (বন্ধ) থাকে। যখন দুনিয়ায় কারও আয়ু শেষ হয়ে যায় তখন Feed back mechanism-এর ন্যায় অনুরূপভাবে Life back mechanism এর ক্রিয়া শুরু হয়। এতে মহা স্নায়ুব্যবস্থার Inhibitory Impulse-এর কাজ শুরু হয়ে যায়, ফলে যার আয়ু থাকে না; তার কাজকর্ম সাময়িকের জন্য বন্ধ থাকে। কিন্তু এই সাময়িক সময়ের জন্য আত্মার অবর্তমানের ফলে তার বাহন (দেহ) পচে গলে নিজ অস্তিত্বের গুণগত কাঠামো নিয়ে অদৃশ্য অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। তারপর কালের ব্যবধানে যখন আবার Inspiratory Impulse-এর সাড়া পাবে তখন দেহের ঐ অদৃশ্য সত্তাগুলো নিয়ে আত্মা আবার অস্তিত্ব ধারণ করবে। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কার্যধারা এরূপই ঘটবে বলে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। আসল সত্য যিনি এর পুরো খবর রাখেন, তিনিই ভালো জানেন। আমরা শুধু জানার জন্য, বুঝার জন্য, পরম স্রষ্টার মহা সৃষ্টির কার্যাবলী আমাদের অস্তিত্বের (দেহের) অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্বের কার্যাবলীর সাথে মিলিয়ে একটা মহাসত্যের কিনার খোঁজার চেষ্টা করছি। এর থেকে গায়েবের অস্তিত্ব স্বীকার করার মতো অনেক যুক্তি নির্ভর বাহন ও বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে মহাপ্রভুর বিশ্বশাসন ব্যবস্থার নিগূঢ় রহস্য আঁচ করতে পারব, এটিই ধারণা।

এই বিশ্বাস একটা জটিল বিষয়ের অনুভূতি বা সত্যের সাক্ষী মাত্র। এর কোন হাত, পা কিংবা কোন কাঠামো নেই। ব্যথার অনুভূতি যেমন দেখা যায় না, ধরা যায় না তবু যেমন ব্যথিতের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝতে পারি, তেমনি এই বিশ্বাসের উপাদান হিসেবে এই জড় জগতের সকল কাঠামো দেখে তা স্বীকার করতে হবে, বুঝতে হবে, মানতে হবে, এই বিশ্বের একজন চালক আছেন। তিনিই তাঁর অদৃশ্য দূতগণের মাধ্যমে একে পরিচালনা করেন। এদের কোন ইচ্ছা বা নিজস্ব কর্মক্ষমতা নেই। এরা শুধু খোদার নির্দেশ পালন করে। এদের কোন বেতন ভাতার প্রয়োজন নেই। খানাপিনার দরকার পড়ে না। তারা ঘুম-নিদ্রা-আরাম-আয়েশের মুখাপেক্ষী নয়। আমাদের আত্মা যে দেহরাজ্য শাসন করে সেটি যদি বর্তমান কাঠামোর ন্যায় না হয়ে আরও বৃহৎ হতো, তবু আত্মার পক্ষে তার খরব নেয়া কঠিন কিছু ছিল না। এ বিশ্বের যিনি শাসক তিনি অসীম ও অতিশয় পরাক্রমশালী, তাই তাঁর বেলায় এর খবর রাখা অসম্ভব কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.org

কোন জিনিসকে বিশ্বাস করতে হলে সে জিনিসের অনুভূতি বা সত্যের সাক্ষী ঠিক করার জন্য প্রথমেই কোন না কোন মাধ্যম বা গাইড লাইন অনুসরণ করে, ঐ বিশ্বাসের পক্ষ ঠিক করতে হয়। তা না হলে যত তন্ত্র মন্ত্র দিয়েই বুঝানো হোক না কেন সঠিক বুঝ সৃষ্টি হবে না। শিং মাছের কাঁটার দংশনের ব্যথা যে পায়নি, সে যেমন শিং মাছের দংশনের ব্যথা কেমন তা বুঝবে না। সেজন্য প্রত্যেক জিনিসের ব্যথা কিংবা স্বাদ বুঝতে হলে তার একটা ন্যূনতম অনুভূতি বা বিশ্বাস মনে প্রাণে ধারণ করতে হয়। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। সেজন্য এদের কার্যাবলীর কোন ধারণা আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না।

কুরআন এমনি এক মোজেজার বস্তু, যা বিশ্বাস করে পথ চলতে থাকলে, শেষ পর্যন্ত গায়েবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করার মতো এমন এক সুমতি ও অনুভূতি মনে স্থির হয়, যা থেকে সেই মহাসত্যের পরিচয়ের সুন্দর চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়। তখন সেই অনুভূতি বা সত্যের সাক্ষীই হবে বিশ্বাসের উপাদান। ইলমে মারেফাত বা তত্ত্ব জ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি সেটিও এক ধরনের সজাগ অনুভূতি। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে অনেক ত্যাগ, অনেক সাধনার প্রয়োজন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্বাস ঠিক না করে এর জটিল বিষয় বুঝা খুব কঠিন।

এ জগতে আল্লাহ তা'আলার অনেক নেক বান্দার মধ্যে ইমাম গাজ্জালী (রহ) ফেরেশতাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য লিখে গেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মানুষের প্রত্যেক কার্যের প্রথমে তার ইচ্ছা যেমন মনে উদয় হয় তদ্রূপ আল্লাহর প্রত্যেক কার্যের আরম্ভ ও তাঁর ইচ্ছা বা অভিপ্রায় মনের মধ্যে উদয় হয়ে থাকে। দেখার ইচ্ছা যেমন প্রথমে তোমার মনে উদয় হয়ে ক্রমে তৎপথে অন্যান্য স্থানে পৌছে, সেরূপ আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে 'আরশে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে অন্যান্য স্থানে পৌছে থাকে। তেজস্ব সাদৃশ্য যে সূক্ষ্ম পদার্থ তোমার ইচ্ছার প্রভাবকে হৃৎপিণ্ড থেকে স্নায়ু পথে মস্তিষ্কে পৌঁছিয়ে থাকে। তাকে যেমন জীবনী শক্তি বলা হয় তদ্রূপ আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাবকে যে পরমশক্তি 'আরশ হতে কুর্সী পর্যন্ত পৌছিয়ে থাকে তাকে ফেরেশতা ও রুহুল কুদ্দুস বলে।

হৃৎপিণ্ডের প্রভাব যেমন মস্তিষ্কে সংক্রামিত হয় তেমনি আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব প্রথমে 'আরশে উৎপন্ন হয়ে পরে কুর্সীতে বিস্তৃত হয় বলে কুর্সী 'আরশের আজ্ঞাধীন। মানুষ যে কাজ করতে ইচ্ছা করে তার ছবি পূর্ব হতেই মস্তিষ্কের খেয়াল কুঠুরীতে অঙ্কিত থাকে এবং পরে তদানুযায়ী কার্য সম্পাদন হয়। যে বিসমিল্লাহ শব্দটি লেখা তোমার উদ্দেশ্যে ছিল, তার ছবি পূর্ব হতেই তোমার মস্তিষ্কে অঙ্কিত ছিল। লেখা হয়ে গেলে দেখা যায় যে, লিখন মস্তিষ্ক অঙ্কিত ছবির

www.nagorikpathagar.org

ন্যায়ই হয়ে থাকে। এই প্রকারে যা কিছু এ জগতে প্রকাশ পায় তার ছবিও পূর্ব হতেই লওহে মাহফুজে অঙ্কিত থাকে। যে সূক্ষ্ম শক্তি তোমার মস্তিষ্কে থেকে স্নায়ুসমূহকে আলোড়িত করে এবং তৎসাহায্যে হাতের আঙ্গুলী ও অবশেষে কলম পরিচালিত করে, তদ্রূপ এক প্রকার শক্তি 'আরশ ও কুর্সীতে অবস্থিত থেকে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে পরিচালিত করে এবং এদের প্রভাব নিম্ন জগৎ পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রকৃতিকে আলোড়িত করে। শেষোক্ত শক্তিকে ফেরেশতা বলে। (কিমিয়ায়ে সা'আদত)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফেরেশতা জাতি তাঁর নূরের তৈরী। পৃথিবীর মানুষ আলোক পর্যন্ত সূক্ষ্ম সত্তাকে দেখতে পারে। কিন্তু নূর দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। নূর এবং আলোক যদি এক জিনিস হতো তবে নূর দেখাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো। এই নূর যেহেতু আমরা দেখতে পারি না সুতরাং নূর ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। অতএব প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে নূর কী? এই নূর সম্পর্কে সঠিক ধারণা না নিতে পারলে ফেরেশতা সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান পরিষ্কার হবে না। অতঃপর নূরের ধারণাই আমাদেরকে ফেরেশতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারে।

নূর কি এবং তা কিভাবে পয়দা হলো

এ বিশ্ব জগৎ চিরন্তন নয়। চিরন্তন ছিলও না। এতে যা কিছু আছে তার উপাদানও অনন্তকাল থেকে কোথাও মওজুদ ছিল না। এমন এক সময় ছিল যখন না ছিল চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী, না ছিল অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র কিংবা আকাশমণ্ডল। এ রূপ শূন্য আর শূন্য অস্তিত্বের থেকেই এই বিশ্ব ও তার সকল কিছু জন্ম হয়েছে। সেই শূন্য পরিবেশে সর্বত্রই পরমস্থিতি বিরাজিত ছিল। এরূপ অনন্ত শূন্য পরিবেশে অনন্তকাল থেকে যিনি বিরাজমান ছিলেন, তিনিই এই সুন্দর সুশৃঙ্খল জগতের সৃষ্টিকর্তা। এ বিশ্বে এখন আর কোথাও শূন্য পরিবেশ নেই। তবে কোথা থেকে এল এই জগতের সকল কিছু? আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টি কোত্থেকে হবে? আলো নেই অন্ধকার দূর হবে কিভাবে? কিন্তু সে সময় কোন কিছু না থাকলেও বিশ্বের পরম সত্তা (আল্লাহ) বলে একজন তো অবশ্যই ছিলেন। তিনি নিজকে প্রকাশ করার ইচ্ছায় ছয় দিবসে এ জগতের সকল কিছু সৃষ্টি করলেন। অথচ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত কোথাও যখন কোন কিছু ছিল না, তখন তিনি এর উপাদান কোত্থেকে আনলেন? এসব প্রশ্ন সাধারণ মানুষকে বিব্রত করতে পারে। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন এর উপাদানও আদি থেকে বিরাজমান ছিল। খোদা একেই শুধু পরিকল্পনা মাফিক সাজিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

পক্ষান্তরে কেউ মনে করে এর উপাদান শূন্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এদের কেচ্ছা কাহিনীর কোন যুক্তি নেই। এদের ভাবনার বিষয়বস্তু নিজেদের কল্পনার ফসল হলেও ধর্মীয় বিধানে এর কোন গুরুত্ব বা স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। ধর্মের মূল ব্যাখ্যা হলো, খোদা এ জগৎ সৃষ্টি করার আগে "নূর" সৃষ্টি করেছেন। এই নূর থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে জানতে গিয়ে প্রশ্ন আসে, যেখানে কোন কিছুই ছিল না, সেই শূন্য পরিবেশে আল্লাহ কিভাবে, কিসের মাধ্যমে, 'নূর' সৃষ্টি করলেন? এবং এই নূর কি জিনিস?

সহীহ হাদীসে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন–

"আমি আল্লাহর নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হতে সৃষ্ট।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন–

"আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা আমার নূর।"

রাসূল (সা)-এর এসব হাদীস থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, পরোক্ষভাবে এ জগতের সকল কিছু আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদিতে যখন কোন কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথমে নূর সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এতেও মূল প্রশ্নের সমাধা হয় না। কারণ অনেকে মনে করেন 'নূর' আল্লাহর বাহ্যিক সত্তা। আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে নূরের আবরণ রয়েছে। এ ধরনের চিন্তা অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসারই বহিরপ্রকাশ। বাস্তবের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যদি 'নূর' কোত্থেকে এলো, কিভাবে এলো, এর বাস্তব একটা সমাধান পাই, তাহলে 'নূর' যে কি জিনিস তা উপলব্ধি করতে পারব।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে গিয়ে শুধু বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়। অর্থাৎ 'কুন ফাইয়াকুনে'র মাধ্যমে সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। এ ক্ষেত্রে বাইরের কোন উপাদানের সংযোজন, সংমিশ্রণ প্রয়োজন হয় না। অনস্তিত্বময় এক শূন্য পরিবেশেই তা পয়দা হয়ে যায়। তবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নতুন যা অস্তিত্ব লাভ করে এর ভেতরটা শূন্য থাকে না। এর উপাদান স্রষ্টার অভিব্যক্তি থেকেই বিচ্ছুরিত হয়ে আসে। সেজন্য শূন্যে কিছু জন্ম হলেও তা শূন্য থাকে না। একে টুকরো টুকরো করে যতই গভীরে যাওয়া যায় সেখানেও শূন্য বলতে কিছু পাওয়া যায় না। তাই প্রশ্ন জাগতে পারে এই উপাদান আসল কিভাবে এবং কোত্থেকে? 'কুন ফাইয়াকুনে'র মাধ্যমে যখন সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে সুতরাং এর মধ্যেই দেখা প্রয়োজন কিছু আছে কিনা। মূলত পরম দয়ালু ও মহান দাতার ইচ্ছা বা অভিব্যক্তির বিচ্ছুরিত সত্তার মাঝেই সৃষ্টির অস্তিত্বের মূল উপাদান চলে আসে।

www.nagorikpathagar.org

রাজমিস্ত্রি যেভাবে ইট, বালি, সিমেন্টের মিশ্রণে দালান তৈরী করে, মহাপ্রভুর সৃষ্টি কৌশল এমন নয়। বরং তিনি অনস্তিত্বের মাঝেই অস্তিত্ব দাঁড় করান।

আমরা যখন হাত দিয়ে কোন কিছু লেখার চিন্তা করি তখন এর চিত্র আগেই মনে মনে স্থির করি। তারপর লেখার কাজ শুরু করলে ঐ জিনিসটিই প্রকাশ পায়। তেমনি আল্লাহর মানসে সৃষ্টির যে পরিকল্পনা ছিল, সেটি যখন বিচ্ছুরিত হয়ে প্রকাশ হলো তখন সৃষ্টির আদি উপাদান অস্তিত্ব লাভ করলো। আমাদের মনের ইচ্ছার প্রভাব মস্তিষ্কে আরোপিত হয় Impulse বা ঢেউ এর ন্যায়। তদ্রূপ আল্লাহর ইচ্ছার প্রভাব প্রাথমিক অবস্থায় কি পরমস্থিতির সাগরে ঢেউ জাগিয়ে তুলেছিল? এই সূক্ষ্ম তাড়না বা চৈতন্যশক্তি কি ঢেউ সাদৃশ্য? যার ভাঁজে ভাঁজে মহাপ্রভুর অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম ছাপ লেগে ছিল?

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে–

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হলো কলম। তৎপর বললেন লিখ"। কলম বলল, "হে আমার প্রভু কি লিখব? আল্লাহ বললেন, তকদীর লেখ– যা ছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা ঘটতে থাকবে।"

আকাশে মেঘমালা থাকলে বৃষ্টি একদিন হবেই, মাটি সিক্ত হলে বীজ গজাবেই। তরুলতায় প্রকৃতি ভরে উঠবে। ফুলফল হবে, বীজ হবে। তা থেকে আবার গাছ উঠবে। এমনিভাবে পরমস্থিতির সাগরে সৃষ্টির অস্তিত্বের আদি উপাদান প্রকাশ হওয়ায়, তা থেকে এ জগৎ উত্তরোত্তর নতুন সাজে ভরে উঠল, যেভাবে স্রষ্টা সাজাতে চাইলেন এটিকে। এই বিশ্ব পরিকল্পনাহীন, দৈবক্রমে সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে, অনেক বিবর্তন-আবর্তন, অনেক ধাপ, অনেক প্রক্রিয়ার পথ মাড়াই দিয়েই এটি চূড়ান্ত স্তরে এসে পৌঁছেছে। কত যুগ, কত কাল যে এতে লেগেছে সে হিসাব আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

প্রাথমিক অবস্থায় পরমস্থিতিময় শূন্যস্থান ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভরে গিয়েছিল। বর্তমানের বিজ্ঞানও ঢেউ চলার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন অনুভব করে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, মাধ্যম ব্যতীত ঢেউ চলতে পারে না। কিন্তু সেই শূন্য স্থানে কিভাবে ঢেউ ছড়িয়েছিল, তা আমাদের মগজে ধরে না বলে আমাদের মাঝে অনেকেই বিশ্বের আদি ভর-শক্তি Constant ও চিরন্তন মনে করেন। কিন্তু শূন্য স্থানটিকে যদি পরম সত্তার নিথর রাজ্য মনে করি অর্থাৎ পরম স্থিতির রাজ্যটি যদি তাঁর অধীনস্থ হয়, তবে এতে ঢেউ উঠা বা গতি জাগা অসম্ভব কিছু নয়। পরম সত্তার প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছাতে তা গতি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, এতে কোন সন্দেহ নেই।

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুকে এখন আর শক্ত কিছু মনে করে না। এখন বস্তু হলো তরঙ্গের পুটলি। সেদিক থেকে, আলোকও ইলেকট্রন তরঙ্গের পুটলি জাতীয় জিনিস। কিন্তু সব যদি তরঙ্গ হয় তাহলে এই তরঙ্গ এলো কোত্থেকে? বিজ্ঞান এর কি উত্তর দিবে তা বলতে পারি না। তবে একথা সত্য যে তরঙ্গ বা ঢেউ সৃষ্টি হওয়ার জন্য যেমন বাহ্যিক কারণ থাকে, তেমনি এর একজন কর্তা বা স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন। একথার সামাধান পেতে হলে বাধ্য হয়ে ধর্মের বন্ধনে এসে বিশ্বাস করতে হবে, এ জগৎ দৈবক্রমে জেগে উঠেনি। এ বিশ্বের অসীম শূন্যমণ্ডল অনাদিকাল থেকে পরম সত্তার অধীনেই ছিল। তিনি যখন গুপ্ত না থেকে প্রকাশ হতে চাইলেন, তখনি এ জগৎ তরঙ্গময় হয়ে উঠলো। তা থেকেই আজকের এই বিশ্ব।

আজকের বিজ্ঞানের যুগে বেতার তরঙ্গ ও টিভির বিদর্শন বিন্দু (তরঙ্গ) হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও অন্য রাজ্যের আকাশ পথে উড়ে এসে প্রচার যন্ত্র বা গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই যন্ত্রে এসে তরঙ্গের বাস্তব রূপের প্রকাশ হয়। এগুলো শূন্য সাগরে (যাকে আমরা শূন্য বলি) ঢেউ খেলে খেলে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে আসে। আমাদের সামনে দিয়ে ভেসে গেলেও আমরা তা দেখি না। এই সূক্ষ্ম ঢেউ এর ভাঁজে ভাঁজে কত বিচিত্র কথা, কত দৃশ্য যে লেগে থাকে তা কল্পনাই করা যায় না। এসব তরঙ্গের গায়ে থাকে সুখের চিত্র, থাকে দুঃখের ছাপ, থাকে রঙ বেরংয়ের বিরহ, বেদনা আর আহাজারীর ছবি। কিন্তু গ্রাহক যন্ত্রে ধরা না পড়া পর্যন্ত তার বাস্তব রূপের প্রকাশ হয় না। অথচ ঐ তরঙ্গের ভাঁজের মধ্যেই বাস্তবের কর্মলিপির ছোবল লেগে থাকে। প্রেরক যন্ত্রের চার দেয়ালের ভেতর থেকে যেরূপ দৃশ্যের প্রতিবিম্ব প্রেরিত হয়, সেটিই এসে গ্রাহক যন্ত্রের পর্দায় ধরা পড়ে। গ্রাহক যন্ত্র ইচ্ছা করে এর কোন কিছু পরিবর্তন করতে পারে না।

দুনিয়ার এই যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রেরক যন্ত্রের সাথে শুধু গ্রাহক যন্ত্রের সম্পর্ক থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রেরক যন্ত্র হতে গ্রাহক যন্ত্রে কোন খবর প্রেরণ হয় না। কিন্তু স্রষ্টা আর সৃষ্টির সম্পর্ক ভিন্ন। অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে যেমন খবর রিলে হয় স্রষ্টার দিকে তেমনি স্রষ্টা থেকেও সৃষ্টি পায় কার্যব্যবস্থার আদেশ-নির্দেশ।

যখন সৃষ্টি বলতে কোন কিছুই ছিল না, না বস্তু, না তরঙ্গের পুটলি, না তরঙ্গ– তখন যে কর্তা বা স্রষ্টা হতে তরঙ্গের জোয়ার উঠে তাঁর নাম দার্শনিকদের ভাষায় পরম সত্তা। সেই মহান সত্তার নাম আল্লাহ। তাঁর নূর বলতে এমন কিছু নয় যে, এই নূর নামের কোন মৌলিক জিনিস তাঁর সত্তায় ছিল। অপরদিকে তাঁর 'কুন' বলা মানবীয় ইন্দ্রিয়ের ভাষার শব্দের সাথে সম্পর্কিত নয়। তিনি দেখেন, শুনেন–

www.nagorikpathagar.org

একথাগুলোও আমাদের ইন্দ্রিয়ের দেখা ও শুনার সাথে সম্পর্কিত নয়। আমাদের মনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় অঙ্গের গতিশীল কার্যব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু অঙ্গে যে শক্তি গতি সৃষ্টি করে তার নাম চৈতন্য শক্তি বা তেজ তরঙ্গ। সেভাবে বিচার করলে দেখা যাবে সৃষ্টির আদি সত্তা কোথাও মওজুদ ছিল না। স্রষ্টার প্রকাশের ব্যগ্রতার তেজ তরঙ্গ সৃষ্টির আদি সত্তা।

আমরা নূরের যে আভিধানিক অর্থ পাই তাতে লেখা আছে নূর অর্থ আলোক বা জ্যোতি। কিন্তু নিখুঁতভাবে বিচার করলে দেখা যাবে 'নূর' আলোক বা জ্যোতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত নয়। এর কারণ হলো আলোকের দ্বৈত প্রকৃতি আছে কিন্তু নূরের বেলায় এরূপ গুণ থাকার প্রশ্নই আসে না। নূরের তৈরী ফেরেশতাগণ দ্বৈত রূপের সাথে সম্পর্কিত নয়। তাঁরা পুরুষও নয়, নারীও নয়। সেজন্য নূর ও আলোক একই বৈশিষ্ট্যের হতে পারে না। তবে একথা স্বীকার্য যে, নূরের উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আলোকের জন্ম হয়েছে। আলোকের উৎস বা জন্ম দৈবক্রমে ঘটেনি। এতে রয়েছে স্রষ্টার পরিকল্পনাময় বিধান। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানতে জানতে যত মূলের দিকে অগ্রসর হব, সেখানে গিয়ে পাব সৃষ্টির অস্তিত্বের আদি সত্তাতে রয়েছে পরম সত্তার অভিব্যক্তির ছোঁয়া। এই সত্তা স্রষ্টার এরাদার বিচ্ছুরিত চৈতন্যশক্তি। তাই সৃষ্টির আদি সত্তা কোথাও মওজুদ ছিল না। এই সত্তা সৃষ্টি করতে আল্লাহর পক্ষে কারও সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। তিনিই খালিক ও মালিক, তিনিই পরম স্রষ্টা যিনি অনস্তিত্বের মাঝে অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন।

মহাকরুণাময়, পরম কৌশলী আল্লাহ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করবেন এটিই ছিল তাঁর পরম বাসনা। সেজন্য সৃষ্টির প্রতি ছিল তাঁর অগাধ প্রেম, ভালোবাসা ও করুণা। আল্লাহর প্রেম সাগর করুণার আতিশয্যে ভরপুর। তাঁর সৃষ্টি প্রেমের কুদরতি ছোঁয়ায় ঐ 'নূর' হতে তেজোদীপ্ত যে সত্তা সৃষ্টি হলো, তা দিয়ে সৃষ্টির 'আরশ, কুর্সী, লওহ, কলম, আসমান, জমীন, ফেরেশতাকুল পয়দা হলো। আকাশের মেঘমালা শীতল বায়ুর স্পর্শে বৃষ্টিরূপে নেমে আসল। এর স্পর্শে মরু ভূমিও সবুজে ভরে উঠল। অসীম শূন্যে যে নূর ছড়িয়ে ছিল, সেখানটিতে আল্লাহর কুদরতি প্রেম দৃষ্টি পড়ে তাতে 'আরশ কুর্সী ইত্যাদি সৃষ্টি হলো।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এখানেই থেমে যায়নি। তিনি সৃষ্টি প্রেমের ব্যগ্রতার কামনায় নিজের অনুরূপ প্রেমবৃত্তি বোধসম্পন্ন সত্তা সৃষ্টির বাসনায় সৃষ্টির প্রতি কুদরতি প্রেম খেলা শুরু করলে সে নূর থেকে আবির্ভূত হয় নতুন এক জাতির। এই জাত

www.nagorikpathagar.org

আদম বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা। সে নির্বোধ নয়, প্রেমহীন নয়। সে ভাবতে পারে। কল্পনা করতে পারে। নিজের অভাবের তাড়না প্রকাশ করতে পারে, এ জাতিও ফেরেশতাদের মতো নূরের তৈরী। তবে আদম জাতের বৈশিষ্ট্য ফেরেশতাদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। কারণ এ জাতির অভাববোধ আছে, আছে স্বাধীন চিন্তাশক্তি, আছে প্রেম-ভালোবাসা, আছে বিবেক-বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি।

ফেরেশতাদের মাঝে এসব গুণ নেই। তাঁরা ভাবতে পারে না, তাঁদের কোন অভাববোধ নেই, তাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে না। নিজ থেকে কিছুই জানতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যতটুকু তাদেরকে জানান ততটুকুই তাঁরা জানেন। এর বেশি কিছু ভাবার শক্তি তাদের নেই। মূলকথা এদের থেকে কোন Sensory Impulse স্রষ্টার কাছে প্রেরিত হয় না। কিন্তু আদম জাতির বুদ্ধির ব্যাপারটি সৃষ্টির Sensory গুণ পয়দা হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এসব তত্ত্ব ধর্ম ও দর্শনের কথা।

আদমী বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তার অভাববোধ আল্লাহর নির্দেশই পূর্ণ হয়। তার জীবন যৌবনের সমস্ত কামনা, বাসনাসহ সকল ক্রিয়াকাণ্ড আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত পূর্ণ হয় না। মানব আত্মা নিজ রাজ্যের খবর রাখার বেলায় যেমন তার অভাব-অনটন দেখা শুনার দায়িত্ব পালন করে, সাথে সাথে আদেশ-নির্দেশ দিয়ে যেমন দেহের অভাব পূরণ করতে সাহায্য করে, তেমনিভাবে এ জগতের প্রতিটি সত্তার খবর নেয়াসহ তাদের অভাব অনটন পূরণ করতে পরম সত্তা (আল্লাহ) আদেশ-নির্দেশ প্রেরণ করে থাকেন। ফলে আল্লাহর নূর অনেকভাবে সৃষ্টিতে পতিত হয়, যেমন হেদায়েত, বরকত, আদেশ, নির্দেশ, এগুলোও আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বা আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদির প্রভাব সৃষ্টিতে ঢেউ এর ন্যায় বিকশিত হয়। সেজন্য এ বিশ্বের ভর-শক্তির পরিমাপকে নির্ধারিত মনে করা ঠিক নয়। যারা অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের রূপান্তর বিশ্বাস করেন, তারাই শুধু বিশ্বের ভর-শক্তি Constant মনে করেন।

প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্ব প্রকৃতি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। এই বিশ্ব যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন এতে অভাববোধ ও বাঁচার প্রেরণা থাকবে। সাথে সাথে 'মহান' সত্তা তাদের অভাব ও বাঁচার খোরাক পূরণ করে যাবেন। এতে বিশ্বের ভর-শক্তির পরিমাণ প্রতি নিয়তই বাড়তে থাকবে। যতদিন এই বিশ্ব প্রকৃতির বর্তমান কাঠামো ঠিক থাকবে ততদিনই এর পরিমাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকবে। যারা বিশ্বের ভর-শক্তিকে Constant মনে করেন, তারা মূলত আল্লাহর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে ভাবেন (নাউযুবিল্লাহ)। এরূপ বিশ্বাস করা মোটেও ঠিক নয়।

www.nagorikpathagar.org

আলোকের দ্বৈত রূপ থাকলেও নূরের কোন দ্বৈত রূপ নেই। এ বিশ্বে যা কিছু আছে এসবই পরোক্ষভাবে আল্লাহর নূরের তৈরী। আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুর নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়ে এর মাঝে পেয়েছে শুধু তরঙ্গ আর তরঙ্গ (ঢেউ)। সৃষ্টির আদি সত্তা পরম স্রষ্টার মনের অভিব্যক্তির প্রকাশচিত্র বিধায় তার প্রকৃতি যে ঢেউ সাদৃশ্য হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মানব আত্মা বা আদম জাতির প্রকৃতি হলো স্রষ্টার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। আমাদের মনের প্রেরণা বা আদেশ-নির্দেশ যেমন মস্তিষ্কে ঢেউ-এর ন্যায় পতিত হয় তেমনি খোদার ইচ্ছার ব্যগ্রতা, তাঁর আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদি ঢেউ-এর ন্যায়ই প্রভাব বিস্তার করে। এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ বিশ্বের আদি সত্তা ঢেউ সাদৃশ্যই ছিল।

অনুরূপভাবে আল্লাহর নূর হলো এমনি এক ঢেউ সাদৃশ্য সত্তা যা আল্লাহর তরফ থেকে সৃষ্টিতে পতিত হয়। এ বিশ্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রকাশের আবরণ। মানব আত্মার প্রকাশের আবরণ যেমন এই মাটির দেহ তেমনি এই বিশ্ব-জাহান পরম স্রষ্টার প্রকাশের আবরণ। এতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পরিবারভুক্ত। মাটির দেহ যেমন মানুষের (আত্মা) আসল পরিচয়ের কিছুই নয়, তেমনি এ বিশ্ব খোদার অস্তিত্বেরও কিছুই নয়। দেহ যেমন আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি এ বিশ্ব-ভুবন আল্লাহর অস্তিত্বের ধারে কাছেই যেতে পারে না।

এরূপ স্পর্শহীন অবস্থায় থেকে আত্মা যেমন দেহকে শাসন করে, তার অভাব-অনটন দূর করতে আদেশ-নির্দেশ প্রদান করে, তেমনি এ বিশ্ব-ভুবন আল্লাহর অস্তিত্বের স্পর্শ না পেলেও তাঁর শাসনের অধীনে আছে। এর অভাব-অনটন তাঁর আদেশ-নির্দেশের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন– "আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও যমীনের নূর। তাঁর নূর-এর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি তাকের উপর প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপ রয়েছে একটা ফানুসের মধ্যে। ফানুসের অবস্থা এরূপ যেমন মোতির মতো ঝকমক করা তারকা। আর সেই চেরাগ যয়তুনের এমন এক বরকতওয়ালা গাছের দ্বারা উজ্জ্বল করা হয়েছে। যা না পূর্বের, না পশ্চিমের যার তেল আপনা-আপনি উথলিয়ে পড়ে। এভাবে আলোর ওপর আলো বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান একত্রিত রয়েছে। আল্লাহ তাঁর নূরের দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা আন-নূর)

আল্লাহ তা'আলার এসব জ্ঞানগর্ভ বাণী বুঝা খুব কঠিন। কারণ এই আয়াতগুলো অর্থের দিক থেকে একটি রূপক উদাহরণ মাত্র। এর সারমর্ম যে কি তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে অনেক জ্ঞানবীর মনীষীগণ এই সকল আয়াতের কিঞ্চিৎ তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাফহীমুল কুরআনের তাফসীরকারক উল্লেখ করেছেন, আভিধানিক অর্থে নূর অর্থ আলোক বা জ্যোতি হলেও এখানে আলোক বা জ্যোতি

www.nagorikpathagar.org

বলতে এমন এক উজ্জ্বল জিনিসকে বুঝানো হয়েছে যা অন্য জিনিস হতে সরাসরি বের হয়ে চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হয়। তবে আল্লাহর নূর সম্পর্কে এরূপ (আলোক) ধারণা করা সংকীর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিরই পরিচয় বহন করে। এই বিশ্বলোকে তিনিই একমাত্র প্রকাশ। কারণ, তিনি ছাড়া এখানে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নেই। আর যেসব জিনিস এখানে আলো দেয়, তাও তাঁরই দেয়া আলোকে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা দানকারী। অথচ আলোক দানকারী জিনিসের নিজের মধ্যে এমন কিছু নেই, যার দ্বারা এই কাজ সম্পাদন করতে পারে।" (সংক্ষেপিত)

আমরা পৃথিবীতে যত কাজ করি সেসব কাজের জন্য আমরা সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ উপলব্ধি করতে না পারলেও কার্যত তাঁর নির্দেশ ব্যতীত আমরা কোন কিছুই করতে পারি না। আমাদের মনের কার্যের অভাববোধের তাড়না সৃষ্টি হলেই বিশ্ব প্রভুর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অদৃশ্য স্নায়ু রজ্জুর মাধ্যমে আমাদের কাছে আদেশ-নির্দেশ প্রেরিত হয়। আল্লাহর অনিচ্ছাতেও অর্থাৎ আল্লাহর মর্জি বহির্ভূত কাজেরও তিনিই নির্দেশ দান করেন। সেজন্য তাঁর অনিচ্ছাতেও তাঁর আদেশ-নির্দেশ সৃষ্টিতে পতিত হয় বা উথলিয়ে আসে। অতঃপর সৃষ্টি আল্লাহর মুখাপেক্ষী কামনা করুক আর নাই করুক; কিংবা কাজ আল্লাহর মর্জি মতো হোক আর নাই হোক অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় হোক, সকল ক্ষেত্রেই যখন সৃষ্টির মধ্যে কর্মের অভাববোধের তাড়না সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহই আদেশ-নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব সৃষ্টির চাহিদার প্রেক্ষিতে কিংবা আল্লাহর ইচ্ছার ব্যগ্রতায় তাঁর পক্ষ থেকে সৃষ্টিতে যে সংকেত পতিত হয় সেসবের নামই 'নূর'।

পূর্বের প্রশ্নগুলো ছিল আল্লাহ কিভাবে, কিসের মাধ্যমে নূর সৃষ্টি করেছিলেন এবং নূরই বা কি জিনিস? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে একথা বলা যায়, নূর সৃষ্টির জন্য আল্লাহ কোন যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করেননি, এর জন্য কোন মাধ্যম দরকার হয়নি। এ নূর আল্লাহর ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রকৃতি ঢেউময়। এতে পরম স্থিতির জগৎ অবস্থান্তর হয়ে পরমগতি লাভ করে। সাগরের জলরাশিতে তরঙ্গ বা ঢেউ যেমন আপন মনে ওঠানামা করে তেমনি স্থিতির সাগরটি ঢেউময় হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় সেখানে কোন দ্বৈত রূপ ছিল না। আল্লাহর কুদরতি প্রেমের ডোরে ছিল সে জগৎ বাঁধা। এই অবস্থায় এসেও প্রশ্নের উদয় হয় তাহলে বিশ্ব প্রভু এতে দ্বৈত রূপ Positive ও Negative কি করে সৃষ্টি করলেন? প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক পন্থায় এর যদি কোন সত্যতা তুলে ধরা যায় তাহলে সৃষ্টির মূলে যে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন বিরাজমান তা প্রমাণ করা সহজ হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

পরম গতির জগৎ
(নূরের জগৎ)

[স্রষ্টার এরাদার (ইচ্ছার) "মহাস্পন্দন" থেকে পরম স্থিতির জগতটি পরিবর্তিত হয়ে পরম গতি লাভ করে। একে তথ্য জগৎ বা Information bit -এর জগৎও বলা চলে। এটিই Inspiratory Impulse বা নূরের জগৎ। স্রষ্টার এরাদার (ইচ্ছার) বিচ্ছুরিত সত্তাই নূর।]

www.nagorikpathagar.org

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সত্তার জন্ম তথ্য

যুগে যুগে মানবকুল সৃষ্টির রহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে আসছে। হাজারো ভাবনা আর চিন্তা থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। বিজ্ঞান ও দর্শন নিজ নিজ পরিসরে সৃষ্টি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে। এগুলোর মাঝে যেগুলো সত্য ও অকাট্য সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বস্তুবাদী কিছু অতি প্রগতিশীল অন্ধ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সবাই বিশ্বাস করে, এ বিশ্ব-অনন্তে অনাদি ও অনন্তকাল থেকে পরম সত্তা এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বর্তমান বিশ্বের সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কিছু চূড়ান্ত পর্বে আসতে ছয়টি ধাপ পার হতে হয়েছে। এক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় সে ধাপগুলোর অতিক্রমণ হয়েছে। এই ছয়টি ধাপের মধ্যে আমরা ভাবতে পারি, পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রথমেই নূরের কথা, তারপর Positive সত্তা, এরপর Negative সত্তা চতুর্থ পর্যায়ে আসে বস্তুর উপাদান ও বস্তু এবং পঞ্চম পর্যায়ে নিম্ন স্তরে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ, সবশেষে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে পৃথিবীতে মানব জাতির পদার্পণ।

এই অধ্যায়ের আলোচনার মূল বিষয় তথা প্রশ্ন হচ্ছে স্ত্রী ও পুরুষজাত কি করে সৃষ্টি হলো? প্রগতিবাদী বিজ্ঞানীদের ধারণা, অনস্তিত্বশীল বিশ্বে কোন এক বিন্দুতে হঠাৎ ভর-শক্তির জন্ম হলে সেখানে ঘনায়ন, রূপায়ণের মাধ্যমে প্রবল অভ্যন্তরীণ চাপের দরুন এক প্রচণ্ড আদিম বিস্ফোরণের ফলে এক কেলেঙ্কারী ঘটে যায়। এতে ঘূর্ণীভূত ভর-শক্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তখন থেকেই এ বিশ্বের সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ধারা চলতে থাকে।

কিন্তু তাদের এই ব্যাখ্যায় সৃষ্টির অনেক কিছুই উহ্য। তৎমধ্যে নারী-পুরুষের মতো জোড়া বন্ধন কিভাবে সৃষ্টি হলো, এর কোন ব্যাখ্যা নেই। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন ভর-শক্তির উদয় হলো? কে করলেন? এর ব্যাখ্যা তারা দেননি। এদের ব্যাখ্যায় অনন্তে কি ছিল, তার কোন জবাব নেই। যে জিনিস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা চলে এবং যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে জ্ঞানলব্ধ হয় সেই জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা হয়। একথা জানা থাকার পরও এসব অসার তত্ত্ব আজ বিজ্ঞানের বইয়ে পড়ার বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে। এসব অসার তত্ত্ব পড়ে অনেকেই বড় বড় ডিগ্রী নিচ্ছেন। জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবির খাতায় নাম লিখাচ্ছেন। কিন্তু যে জ্ঞান অন্ধ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সে জ্ঞান একদিন মূল্যহীন প্রমাণ হবে। তখন ডিগ্রীর অবস্থাও খালি কলসির মতো অল্প বাতাসেই নড়তে শুরু করবে।

www.nagorikpathagar.org

মূলত অনন্তের ব্যাখ্যা দেয়া মানবীয় চিন্তাশক্তির বহির্ভূত। কিন্তু মানব চরিত্র যেহেতু অনন্তের আগেও কিছু ছিল কিনা তা জানতে চেষ্টা করে, সেজন্য অনন্তের মালিকের পক্ষ থেকে তার জন্য সকল বিষয়ের সমাধান এসেছে। যে কিতাবে সেই সমাধান দেয়া আছে তার নাম আল কুরআন। যুগ যুগ ধরে নবী, রাসূলগণের (আ) মাধ্যমে অনেক আসমানী গ্রন্থ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মে, সুবিধাবাদীদের ফাঁদে পড়ে আজ কোন ঐশী গ্রন্থই আর আগের মতো অকাট্য ও অবিকৃত নেই। সুবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থে অনেক রদবদল, সংশোধন-সংযোজন করে বিকৃত করেছে সবক'টি ঐশী গ্রন্থই। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন।

আল কুরআন বিশ্ব বিধাতার সর্বশেষ ঐশী বাণী। যিনি সৃজন করেছেন এই বিশ্ব-জাহান তাঁর কথাই সেই মহাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বস্তু অবস্তু বলতে যা কিছু আছে এসবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, সেসব কিছুর রয়েছে জোড়া। অর্থাৎ জীব-জন্তু, গাছ-পালার যেমন রয়েছে জোড়া, তেমনি বস্তুর মূল আদান পরমাণুরও রয়েছে জোড়া। বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা ইলেক্ট্রোনের গতিবিধি ঋণাত্মক, অপরদিকে প্রোটনের রূপ ও গতিবিধি ধনাত্মক। এমনকি স্বয়ং আলোর কণারও রয়েছে দ্বৈত রূপ। বলতে গেলে মহাপ্রভুর ফেরেশতা জাতি ব্যতীত বিশ্বে যা কিছু আছে সবকিছুর রয়েছে জোড়া। এ বিশ্বের পরম সত্তা পুরুষও নন, নারীও নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তিনি অনাদিকাল থেকে এই রাজ্যের খবর রাখেন। বৈজ্ঞানিকগণ Positive এবং Negative কি করে উৎপত্তি হলো তা বলতে না পারলেও আল্লাহ এর সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। স্রষ্টার Positive এবং Negative সৃষ্টির কৌশলটি আমাদের কাছে বিচিত্র মনে হলেও, এ বিশ্বে কোন কিছুই কার্য-কারণ নীতির বাইরে সৃষ্টি হয়নি। তিনিই সৃষ্টির আদি পরিকল্পনার মধ্যে তার সম্প্রসারণ ও বিকাশের প্রক্রিয়া জুড়ে দিয়ে সৃষ্টিকে তিনি (আল্লাহ) চূড়ান্ত শিকড়ে নিয়ে এসেছেন। সৃষ্টির বিকাশের এই প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণের বাইরের কিছু নয়।

আমরা জগতের অনেক ঘটনাকে প্রকৃতির লীলাখেলা মনে করি। কিন্তু এসব প্রকৃতির নিয়মনীতি কার্য-কারণেরই ফল। সেজন্য কারণ ব্যতীত যেমন কার্য হয় না, তেমনি কর্তা ব্যতীত কারণ বলতে কিছু থাকে না। তাই কর্তার ইচ্ছাতে কারণ সৃষ্টি হয়। এখানে কারণ মূল প্রক্রিয়ার উপাদান। এই উপাদান কর্তাই সৃষ্টি করেন। কার্যের উপাদান 'কারণ' যখন সৃষ্টি হয় তখন কারণ থেকেই কার্য প্রকাশ হয়। সেজন্য আমরা 'কারণ'কেই অনেক সময় ঘটনার জন্য দায়ী করি। আসলে

www.nagorikpathagar.org

কারণের নিজস্ব কোন শক্তি নেই কোন ঘটনা জন্ম দেয়ার। মূলত কারণের ভেতরে যে গুণ থাকে সেটি ঘটনার জন্ম দিলেও এই গুণ তার সৃষ্টি নয়। 'গুণ' হলো অজড় এক প্রকার অনুভূতি। সকল অবস্থায় 'গুণ' মনের সাথে সম্পর্কিত। আবার গুণের সাথে চরিত্র সম্পর্কিত। কিন্তু এতোসব বিষয় বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে মাপা খুব কঠিন। বিশ্ব প্রভু নিজকে প্রকাশ করার ইচ্ছায় এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহর প্রকাশ হওয়ার ব্যগ্রতাই সৃষ্টির অস্তিত্ব পাওয়ার মূল কারণ। প্রত্যেক কাজের আগে এর পরিকল্পনাই হলো মূল বিষয়। তা না হলে এর ভিত্তি শক্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে।

এ বিশ্বে যখন সৃষ্টি বলতে কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ 'নূর' সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির এই আদি উপাদানের মধ্যেই এর সম্প্রসারণ ও বিকাশের কারণ খোদার পক্ষ থেকেই জুড়ে দেয়া হয়েছিল। এই নূর কী? তা কোত্থেকে, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে– সে সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। 'নূর' বলতে আমরা সে জিনিসকে বুঝি, যে সত্তার মাঝে নারী-পুরুষের মতো কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর ফেরেশতাকুল সরাসরি নূরের তৈরী। এঁদের মধ্যে কোন নারী-পুরুষ নেই। নেই কোন প্রবৃত্তির প্রবণতা। এঁরা কোন সময় আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে না। এঁরা ভাবতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বলা যায় এঁদের মাঝে কোন Sensory ব্যবস্থা চালু নেই। এর ফলে এঁদের প্রবৃত্তি বা অভাবের তাড়না উদয় হয় না। সৃষ্টির বিকাশ ও তার খবরাখবর রাখা Sensory ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোন মতেই সম্ভব নয়। মানব আত্মা যেমন তার দেহ রাজ্যের প্রতিটি রেণুকণার খবরাখবর রাখে Sensory ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর ইচ্ছায় যখন সৃষ্টিতে Sensory ব্যবস্থাপনা চালু হয় তখন এর মাঝে প্রবৃত্তি ও অভাবের তাড়না জাগে। যে সত্তার মাঝে এই গুণ পয়দা হয়, দর্শনের ভাষায় একে বলা হয় আদমীয়াত বা আদমী বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা। এই সত্তার মাঝে যে গুণ পয়দা হয় এই গুণ আল্লাহর কিঞ্চিৎ গুণের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর যেমন ইচ্ছা শক্তি ও প্রেম প্রবৃত্তি প্রকাশের ক্ষমতা আছে, সেরূপ এই সত্তার মাঝেও সেই গুণ ছিল। এতে ছিল Sensory বোধ। সেজন্য এই সত্তা থেকে স্রষ্টার কাছে তাঁর কামনা, বাসনা, অভাবের তাড়না ইত্যাদি রিলে হতো। ফেরেশ্‌তাগণ যখন আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে আপত্তি তুলেছিলো, তখন আল্লাহ তাঁদের সামনে আদমের জ্ঞানের মহত্ত্ব প্রকাশ করে তাদের তাক লাগিয়ে দিলেন। সেই জ্ঞান ছিল প্রকাশের ব্যগ্রতা যা ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল না। এই Sensory বোধের অভাবে ফেরেশতাদের থেকে আল্লাহ্‌র কাছে কোন তাড়নাই রিলে হয়নি। তাই তাঁরা 'নাম' বলতে পারেনি। তারা ভাবতে পারেনি, পারেনি ইচ্ছার ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে। 'নাম' বলার বিষয়টি আদমী জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। এই জ্ঞান এই

www.nagorikpathagar.org

সত্তার নিজের কোন কামালিয়াত নয়। স্রষ্টার ইচ্ছা থেকেই সে এই গুণ লাভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হলো এই আদমী বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তাকে কেন আমরা Positive (নর) জাত হিসেবে চিহ্নিত করি?

আমাদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হলো নর ও নারী কি এবং এ সত্তাকে এ নামে কেন ডাকা হয়। নর (Positive) হলো ইতিবাচক সত্তা। ইংরেজিতে Positive কথাটির অর্থ হলো বাস্তব বা প্রত্যক্ষ। এখানে স্রষ্টার নিগূঢ় ইচ্ছার প্রেক্ষিতে যা সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ (Positive) সত্তা। আর নারী হলো এমনি এক সত্তা যা Positive বা নর এর নেতিবাচক বা Negative তাড়না থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজিতে Negative এর বাংলা অভাববোধও করা হয়। খোদার ইচ্ছায় যখন ফেরেশতার পরিবেশে আদমী বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা আত্মপ্রকাশ লাভ করলো তখন তাঁর সমমনা আর কোন জাত সেখানে ছিল না। এ অবস্থায় সে একাকিত্ব বোধ করছিল। তাঁর ব্যগ্রতা ছিল সমমনা কাউকে পাওয়ার। এই ব্যগ্রতা তার অভাববোধ। এই অভাববোধের তাড়নাকে বলা যায় Negative তাড়না। পূর্বেই বলেছি আদম জাতি থেকে অভাববোধের তাড়না খোদার কাছে রিলে হয়। এতে করে যখন তাঁর থেকে খোদার কাছে অভাববোধের তাড়না রিলে হলো, তখন পরম কৌশলী আল্লাহ তাঁর অভাব পূরণ করার জন্য নির্দেশ পাঠালেন। খোদার এই নির্দেশের প্রেক্ষিতেই আদমী সত্তার অস্তিত্ব হতেই তার সমমনা বিপরীত শ্রেণী প্রকাশ লাভ করে। সৃষ্টির বিকাশের এই প্রক্রিয়া খুব সুন্দর। নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিউট্রন দিয়ে যখন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আঘাত করা হয় তখন মূল পরমাণুটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তারপর পর্যায়ক্রমে উত্তরোত্তর তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে চলে। নর থেকে নারী সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিও তেমনি উদাহরণযোগ্য এক মহাকৌশল।

যখন আদি আদম নর (আদম) থেকে অভাববোধের তাড়না সৃষ্টির Sensory ব্যবস্থাপনায় স্রষ্টার নিকট পৌঁছে ছিল তখন স্রষ্টা তাঁর সমমনা শ্রেণী সৃষ্টি করার প্রেক্ষিতে ঐ নরের দিকে নির্দেশ (Impulse) প্রেরণ করেছিলেন। এতে ঐ নরের আত্মিক সত্তা থেকেই তার অভাব পূরণ হয়। কাজেই নরের অভাববোধে বা Negative তাড়নার প্রেক্ষিতে যে সত্তা পয়দা হলো তার নামই নারী বা Negative শ্রেণী। হাদীসে কুদসীতে আছে– "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু সরাসরি স্বীয় হস্তে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যাবতীয় বস্তুকে বলেছেন, 'হও'। তখন তা হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ যখন আদম ও ফিরদাউসকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন এবং উহাকে (ফিরদাউসকে) বলেছেন; আমার ইজ্জত ও মর্যাদার শপথ! তোমার মধ্যে কোন কৃপণ আমার সান্নিধ্যে বাস করতে পারবে না। আর কোন নির্লজ্জ ব্যক্তি তোমার সুগন্ধ পাবে না।" দায়লামী এই হাদীসটি হযরত আলী (রা) সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন– "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একমাত্র মানব হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সে মানব হতে তার জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা-৪ : ১)

মহাপ্রভুর সৃষ্টি কৌশল আমাদের মতো নয়। নর-নারীর মিলন প্রক্রিয়ায় যেভাবে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হয়; আল্লাহ সেভাবে আদমকে জন্ম দেননি। কারণ আল্লাহর কোন সঙ্গিনী কিংবা সমজাতীয় দ্বিতীয় কিছুই নেই।

সুতরাং প্রশ্ন দেখা দিতে পারে তাহলে বিশ্ববিধাতা কিভাবে আদমকে পয়দা করলেন? এবং তার মাঝেই বা কি করে ইচ্ছা শক্তির উদয় হলো? এ প্রসংগে লক্ষণীয়, জগতের প্রতিটি রেণু-দানার মধ্যে প্রেমের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রেমের বাহ্যিক প্রকাশ এক ধরনের নয়। পিতার প্রতি পুত্রের প্রেম, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার প্রেম, গোত্রে-গোত্রে প্রেম, মানুষে-মানুষে প্রেম, বর্ণে বর্ণে প্রেম, এসবকে সৃষ্টি প্রেম বলা চলে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর প্রেম একটু ভিন্ন প্রকৃতির। নরের প্রতি নারীর প্রেম, কিংবা নারীর প্রতি নরের প্রেমে কাছে পাওয়ার এক প্রবল ব্যগ্রতা বিদ্যমান। এই ব্যগ্রতার মাঝে থাকে নিজের পরিচয় ও সান্নিধ্য প্রকাশের প্রবল আগ্রহ। সৃষ্টির মাঝে এই প্রেমবোধ কি করে আসলো? স্রষ্টার যদি সৃষ্টির প্রতি প্রেমবোধ না থাকতো তাহলে এই গুণ সৃষ্টির মাঝে আসার প্রশ্নই দেখা দিত না। একটি লৌহ খণ্ডকেও চুম্বক প্রেমের ডোরে আকর্ষণ করে। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় লৌহ খণ্ডের মাঝেও চুম্বকের গুণ পয়দা হয়। তখন ঐ লৌহ খণ্ডটিও কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত হয়।

সৃষ্টির আদি পরিকল্পনার বিচ্ছুরিত সত্তার প্রতি ছিল খোদার প্রেমবোধ। এই প্রেমবোধ হয়তো এক রকম ছিল না। আল্লাহর ছিল সৃষ্টি প্রেম। আল্লাহর সৃষ্টি প্রেমের সান্নিধ্যে সৃষ্টিতে প্রবৃত্তির গুণ পয়দা হয়। এই প্রেমখেলা নর-নারীর প্রেম খেলার সাথে সম্পর্কিত নয়। মহাপ্রভুর কুদরতি দৃষ্টির স্পর্শেই সৃষ্টিতে এই গুণ পয়দা হয়। সৃষ্টি যখন এই গুণে গুণান্বিত হয় তখন সে ভাবতে শেখে, প্রকাশ করতে জানে। তার আক্‌ল ফেরেশতাদেরকে চমকিত করে। এই সত্তা প্রত্যক্ষভাবে খোদার ইচ্ছার ব্যগ্রতার কুদরতি প্রেমের স্পর্শেই সৃষ্টি হয়। তাই একে Positive (প্রত্যক্ষ বা নর) জাতসত্তা বলা হয়। বস্তুত অজড় সত্তা রূহানী জগতের অন্তর্গত। জড় চিরন্তন নয় কিন্তু অজড় সত্তা বা আত্মা চিরন্তন। আত্মা আর দেহের নিবিড় সম্পর্ক থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, আত্মা যে আবরণ (জড়দেহ) দিয়ে নিজকে প্রকাশ করে, এটি সেই সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই এর প্রতিটি রেণু দানার মধ্যে রয়েছে জোড়া সম্পর্ক। মানব জাতির জন্য পৃথিবীর বাস্তব ক্ষেত্রটি অভাব পূরণ করার ক্ষেত্র। এখানে তাকে অভাব মেটানোর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বাণিজ্যের জন্য দেহ-নৌবহরটি দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

তাই এ জগতটি মানব জাতির জন্য বাস্তব ক্ষেত্র বা Positive ভূমি। এখানে যা কিছু সে উপার্জন করবে সেগুলোই Negative ভূমিতে ভোগ করবে। সে আলোকেই বলা যায় সুদূর অতীতের জগতটি এ জগতের দ্বৈত প্রকৃতির জগৎ। তাকে Negative dimension-এর জগতও বলা চলে। কারণ সৃষ্টির অভাববোধ বা Negative তাড়না থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয় সেটি Negative বস্তু। বিবি হাওয়া Negative প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। আদমের অভাববোধ থেকেই তার জন্ম। পরম কৌশলী আল্লাহ তা'আলার এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া আমাদের কাছে রহস্যময় মনে হলেও বাস্তব জীবনে তা প্রমাণ করা কঠিন কিছু নয়। আমাদের দেহের কার্য-পদ্ধতি থেকেই Negative এর উৎপত্তির ধারণা দেয়া সম্ভব।

আমাদের আত্মা নামের পরমবস্তুটি দেহের সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। এই আত্মা কোন সময় দেহের কোন অংশেই প্রবেশ করে না। দেহরাজ্যের এক গুপ্ত সিংহাসনে বসে আত্মা ফরমান বা নির্দেশ জারী করে। দেহ আত্মার নির্দেশ ব্যতীত কিছু করার অধিকার রাখে না। আত্মার কার্য ব্যবস্থা দেহের স্নায়ু-কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মনের নির্দেশ বা Impulse প্রথমে মস্তিষ্ক বহন করে। তারপর মস্তিষ্ক মনের নির্দেশের সূত্র ধরে দেহকে সেই মোতাবেক কাজ করার বার্তা প্রেরণ করে। এ নির্দেশ ঢেউ-এর ন্যায় কার্য সম্পাদনকারী অঙ্গে পৌঁছে। কখনো আবার দেহের অগ্রভাগ থেকে মনের কাছে অঙ্গের অভাববোধের তাড়না প্রেরিত হয়। এই সংকেত বহন করে Sensory nerve। অঙ্গের তাড়না পেয়ে মন তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এতে করে কার্য সম্পাদনকারী অঙ্গ হতেই তার ব্যবস্থা নেয়ার উপকরণ বের হয়। এ উপকরণ হলো বিশেষ ধরনের জৈব রস। তৎমধ্যে এসিটাইল কোলিন ও নরইপিনিপাইরিন উল্লেখযোগ্য। এসব জৈব রস মূলত ঐসব অঙ্গের স্নায়ুকোষ থেকেই নিঃসৃত হয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে তা নিঃসৃত হয় মনের নির্দেশেই। অঙ্গের অভাববোধের তাড়না না হলে মন কখনো নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না।

পক্ষান্তরে মন থেকে কখনো জৈব রসের উপাদান আসে না। মন শুধু তড়িৎ বার্তা প্রেরণ করে। কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ তৈরী হয় তাড়না প্রেরণকারী অঙ্গের স্নায়ুকোষের অগ্রভাগ থেকেই। আমাদের দেহের Sensory ব্যবস্থার কার্য প্রণালীর সাথে বিশ্ব বিধাতার সৃষ্টির প্রক্রিয়ার নীতিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ জগতের আদি উপদান নূর। এ নূরের সৃষ্টি ফেরেশতার পরিবেশে স্রষ্টা আদম (আ) কে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করেছিলেন। সৃষ্টির এই ধাপে জগৎ লাভ করে Sensory শক্তি। তাই আদমী জ্ঞান ছিল ফেরেশতাদের উর্ধ্বে। খোদা এই জাতি প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করেছেন বলে একে Positive বা ধ্বণাত্বক হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এই সত্তার মাঝে ছিল অভাববোধের তাড়না, ছিল সমমনা সাথী পাওয়ার ব্যগ্রতা।

www.nagorikpathagar.org

ছিল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ভাব। ছিল নিঃসঙ্গতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকুল আগ্রহ। প্রেমালাপ করার ছিল ব্যগ্রতা। কিন্তু তাঁর অভাব বোধের উৎকণ্ঠা সে গোপন রাখতে পারেনি। বিশ্ব প্রভুর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মহাস্নায়ু ব্যবস্থার Sensory সংকেত সে গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়। এতে করে আল্লাহ থেকে ফরমান জারী হয় তাঁর দিকে। তখন আদম ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঘুম ভেঙ্গে গেলে পাশে দেখতে পেল হাওয়াকে। আদমের অভাবপূরণ হলো। এই নতুন জাতি আল্লাহর নির্দেশেই আদমের অস্তিত্ব থেকেই পয়দা হয়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আসলো শুধু নির্দেশনামা। কিন্তু আদশের অভাববোধ থেকে জন্ম হওয়ায় তাকে দেখা হয় Negative বা ঋণাত্মকজনিত হিসেবে। আমাদের দেহের স্নায়ু কোষের অগ্রভাগ থেকে মনের নির্দেশ যেভাবে তার অভাব পূরণ হয় তদ্রূপ প্রক্রিয়ায় এই ঋণাত্মক জাতি পয়দা হলো। ঐশী বিধানে জীবন সমস্যার সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। আমাদেরও জানার আগ্রহ হয়; কি করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এর উৎপত্তি হলো। অথচ ঐশী বিধানে রয়েছে সে সমস্যার সমাধান। বিজ্ঞান কিন্তু এর কোন সঠিক তত্ত্বই তুলে ধরতে পারেনি। এই না পারার মূল কারণ হলো বিজ্ঞানী বলে আমরা যাদেরকে চিন্তা করি তারা আসলেই বাস করে দ্বৈবের রাজ্যে। তারা বিশ্বের মৌল উপাদান ও এর গতিকে চিরন্তন মনে করে। তাই এর আগের বিষয় নিয়ে তারা চিন্তাই করে না।

আমরা বাস্তব জীবনে স্রষ্টার নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজ করতে পারি না। দুনিয়ার জীবনে অভাব আমাদেরকে বার বার তাড়িত করে। কর্মের মাধ্যমে আমরা অভাব পূরণ করি। এতে বিকীর্ণ হয় দৈহিক কর্মশক্তি। এই জগৎ বস্তুজগৎ। বস্তু থেকেই আমরা শক্তি নেই। দুনিয়ার অভাববোধের তাড়না থেকে যদি কিছু সৃষ্টি হয় তবে তা হবে প্রতিবস্তুর সত্তা। আর এ জগৎ যদি Positive dimension এর জগৎ হয়, তবে আমরা একদিন চলে যাব Negative dimension-এর জগতে। মনের তাড়নায় খোদার নির্দেশে যেহেতু Negative এর উৎপত্তি হয় নিজ অস্তিত্ব থেকে, সেহেতু আমাদের কর্মফলের সত্তা এই মাটির দেহ থেকেই যে পয়দা হচ্ছে– এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই বিশাল জগৎ আল্লাহ একাই পরিচালন করছেন। সৃষ্টির অন্তরমূল পর্যন্ত এক অদৃশ্য স্নায়ুজাল বিস্তার করা আছে। এর মাধ্যমে সৃষ্টির খবরাখবর প্রেরণ করা হয়। এই স্নায়ুজালে অনেক দপ্তর আছে। প্রত্যেক দপ্তরের একজন দপ্তর প্রধান আছে। তাঁরাই খোদার নির্দেশে সৃষ্টিকে দেখাশুনা করেন। এঁদের প্রত্যেকের কার্যনীতি মোতাবেক নামকরণ করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এদের কার্যনীতির সাথে আমাদের মস্তিষ্কের কার্যনীতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। আমরা যদি সে আলোকে নিজেদের মধ্যেই জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করি, তবে কোথাও

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর রাজ্য ছাড়া আর কিছুই পাব না। তখন আর আমাদের প্রত্যক্ষ (Positive) ও পরোক্ষ (Negative) সৃষ্টি উৎসমূলও জানার বাকি থাকবে না।

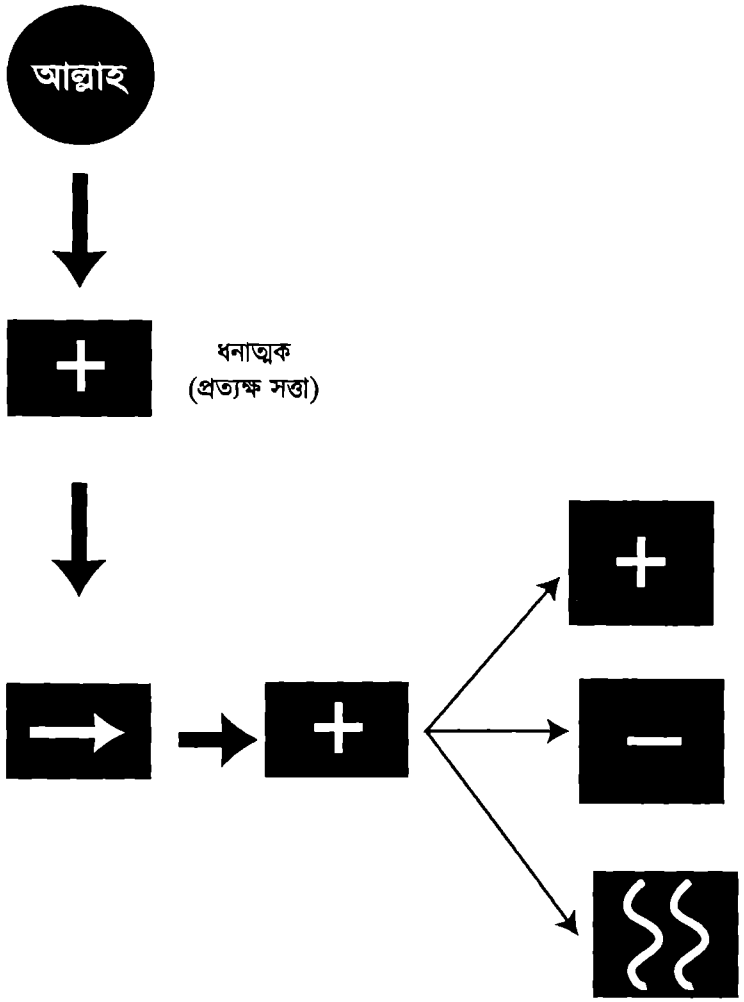

"(আল্লাহ) সেই একক সত্তা যিনি গঠন করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে এবং তা হতে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী।" (সূরা নিসা : ১)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর সৃষ্টি জগতের স্নায়ু রজ্জু

একটি গতিশীল গাড়িকে চালক ডানে বামে ঘুরায়, তার হাতের স্টিয়ারিং ডান-বামে ঘুরিয়ে। আবার থামানোর প্রয়োজন হলে তাকে চেপে ধরতে হয় ব্রেক। মানুষের তৈরী যন্ত্রযানের পদ্ধতি এরূপ হতে পারে বটে কিন্তু কম্পিউটারাইজ গাড়িকে চালক ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় দূর থেকে বোতাম বা সুইচ টিপেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে যন্ত্রে সুইচ টিপলে সেটি নিয়ন্ত্রিত হয়, সে যন্ত্র থেকে শুধু বের হয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গ বাতাসে ভর্তি ফাঁকা শূন্য দিয়েই উড়ে যায়। ঐ গাড়িতে থাকে এই তরঙ্গ বহন করার মতো একটি যন্ত্র, এই যন্ত্র তরঙ্গ বার্তার প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে। গাড়ির গতিবেগ কমানো বাড়ানোসহ যাত্রা বিরতি ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ দূরের চালকের হাতের ঐ যন্ত্রের তরঙ্গ বার্তার মাধ্যমেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটিও এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

আমাদের দেহযন্ত্রটিকে আত্মা এক ধরনের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করে। দেহের প্রধান দপ্তর বা সচিবালয় হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক দেহ সত্তার বিশেষ উপাদান। এই সত্তা মনের অংশ নয়। মূলত দেহ আত্মার প্রকাশের আবরণ। সেই হিসেবে মস্তিষ্কও দেহের অংশ এবং তার প্রকাশযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ভাণ্ডার। মনের যাবতীয় কাজকর্মের সংকেত মস্তিষ্ক বহন করে, অঙ্গের মাধ্যমে সে মোতাবেক কাজ করায়।

মস্তিষ্কের পুরো অংশটি একই ধরনের কাজ করে না। এতে কাজ করার বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। যে অংশ চোখকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম Optic centre. আবার যে অংশ শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম Heat regulating centre। এমনি করে এতে অনেক দপ্তর রয়েছে। তাছাড়া যে শাখাটি মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে গিয়েছে তার নাম Spinal cord। এখান থেকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের হয়ে একেবারে দেহের অগ্রভাগে এসে শেষ হয়েছে। এ শাখা-প্রশাখাগুলোরও নাম আছে। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন মঞ্জিল (Junction), আবার একটি স্টেশন বা মঞ্জিলের সাথে অন্য মঞ্জিলের যে সংযোগকারী পথ রয়েছে, তার নাম Ganglion।

আমাদের দেহের পুরো নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটি মনের আওতাধীন। এর সম্পূর্ণ কোষকলায় মনের সংকেত বহন করার মতো শক্তি সংরক্ষিত আছে। তাই মন দেহকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মন দেহের গতিবেগ কমানো বাড়ানোসহ নিথর অথবা

www.nagorikpathagar.org

কর্মচঞ্চল করে তরঙ্গ বার্তার মাধ্যমে। মনের পক্ষে বোতাম টিপে তরঙ্গ বের করতে হয় না। তার এরাদার চৈতন্য প্রবাহই মস্তিষ্ক হতে তরঙ্গ বের করে।

এই তরঙ্গ বার্তার মাধ্যমে কোষকলায় যে জৈব রস নিঃসৃত হয়, এতে অঙ্গ কর্মপ্রেরণা লাভ করে। দেহের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াতে এরই মাঝে যেমন রয়েছে বিভিন্ন দপ্তর, তেমনি বিশ্ব-জগতের মহা মস্তিষ্ক বা 'আরশেরও রয়েছে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। আমাদের মস্তিষ্কের কার্য প্রণালী অনুযায়ী এতে যেমন রয়েছে বিভিন্ন নামের মন্ত্রণালয়, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশ-এর কার্যনীতি অনুযায়ী তারও আছে বিভিন্ন নামের মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে লওহ, কলম, আসমান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর যমীন আমাদের দেহের মতো এক নিথর ভূমি। এর মধ্যে গতির বার্তা প্রেরিত হয়। আমাদের আত্মার সিংহাসন হৃৎপিণ্ড। কিন্তু আত্মা কখনো এর গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকে না। এই সিংহাসন কখনো আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে হৃৎপিণ্ডের চার দেয়ালের মধ্যেই সে গুপ্ত আসন নিয়ে বিরাজ করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেই স্থান খুব সংকীর্ণ মনে হলেও সে এখান থেকে গোটা দেহ-রাজ্যের খবর রাখতে পারে। এতে তার কোন ক্লান্তি বা তন্দ্রাও আসে না।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সিংহাসন হলো কুর্সী। কিন্তু আল্লাহ কখনো এর গায়ে হেলান দিয়ে থাকেন না এবং কুর্সী কখনো আল্লাহকে স্পর্শ করতে পারে না। এই গুপ্ত আসন থেকে আল্লাহ্ তার সৃষ্টিকে 'আরশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের মস্তিষ্কের শাখা-প্রশাখা যেমন দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত; তেমনি 'আরশের শাখা-প্রশাখা যমীনের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শাখা-প্রশাখা 'আরশের রজ্জু হতে ফেরেশতার বহর মাত্র। মূল আ'রশ যেমন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত তেমনি মূল বহরের শাখা প্রশাখাও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। কয়েকটি শাখা-প্রশাখার সংযোগস্থল হলো আসমানের মঞ্জিল। আর আসমান হলো একটি মঞ্জিল হতে আর একটি মঞ্জিলের মধ্যবর্তী সংযোগ পথ। এই পুরো সিস্টেমটি অদৃশ্য বলে আমরা এর কোন কিছুই দেখি না।

জ্যোতির্বিদগণ ভাবছেন, মহাআকর্ষক নামের এক বিশাল ছায়া পথের সমারোহ তার শক্তিশালী মহাকর্ষ শক্তি দ্বারা বিশ্ব-জাহানের ছায়া পথগুলোকে তার দিকে টানছে।

আল্লাহ বলেন– "তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত। নিজ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না– একমাত্র তাঁর পছন্দীয় রাসূল ছাড়া।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর তিনি তাঁর চারদিকে তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত করেন– যাতে করে এ প্রতীতি জন্মে যে, বাণী বাহকগণ আপন প্রভুর বাণীসমূহকে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর পরিব্যাপ্ত। আর তিনি প্রতিটি জিনিস গণনা করে থাকেন।" (সূরা-৭২ : ২৬-২৮)

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব হচ্ছে, মহাবিস্ফোরণের মুহূর্তপর মহাকাশে মহাজাগতিক রজ্জু সৃষ্টি হয় এবং এর বরাবর বিপুলায়তন গ্যালাক্সি ৩চ্ছ গড়ে ওঠে। এসব অদৃশ্য রজ্জু আদি ব্রহ্মাণ্ডকে আবেষ্টন করেছিল এবং এগুলোই বস্তুর পুঞ্জিভূত হবার নাভীমূল হিসেবে কাজ করে। টাফট বিশ্ব বিদ্যালয়ের জ্যোতিপদার্থবিদ আলেকজাণ্ডার ভিলেনকিন এসব রজ্জুকে অদ্ভুত বলে বর্ণনা করে বলেন, এগুলোর কোন আদি বা অন্ত নেই, অসীমে গিয়ে ঠেকছে।

এই অসীম রাজ্যটি যে মহাস্নায়ুবিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় তার নাভীমূল হলো আল্লাহ তা'আলার 'আরশ। মহামহিয়ানের এই দরবার ('আরশ) থেকে তাঁর হুকুমে বিভিন্ন শ্রেণীর মহাশক্তিশালী দূত বা ফেরেশতাগণ বিশ্বের কার্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কাজের ভিন্নতায় তাঁদের নাম ও কর্মশক্তি ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁরা আলোক তরঙ্গের চেয়েও ঊর্ধ্বগতিতে নিম্নজগতে নেমে আসে। আবার সৃষ্টির নিম্নজগৎ থেকেও অদৃশ্য সৈনিকগণ খবর রিলে করেন মূল দরবারে। জড় প্রকৃতির বাইরের সেই অদৃশ্য জগতের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না বলে আমাদের কাছে তা রহস্যময় মনে হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন আমরা কোন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখি তখন একে বলি অপ্রাকৃতিক ঘটনা। আসলে অপ্রাকৃতিক কাণ্ড অদৃশ্য জগতের মাধ্যমেই ঘটে। এই অদৃশ্য মাধ্যমটি মহানিয়ন্ত্রকের স্নায়ু রজ্জু। সুতরাং প্রাকৃতিক ঘটনাই প্রমাণ করে যে, এ জগৎ এক অদৃশ্য স্নায়ু রজ্জুর মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কার্যত প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সকল ঘটনাই এই স্নায়ু রজ্জুর মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মাধ্যমে পৃথিবীর নেক বান্দা এবং পাপীর কথাও রিলে হয়। পাপী যখন পাপ মোচনের আশায় অনুশোচনা করে (তওবা করে) তখন এক বিশেষ ব্যবস্থায় তার পাপ সত্তা রূপান্তরিত হয়ে যায়। মনের অনুশোচনার মাধ্যমে পাপ মোচন হলেও এই প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানের যুক্তি নির্ভর এবং তা বাস্তবে প্রমাণ দেওয়াও সম্ভব। আমরা যদি পাপ মোচনের অপ্রাকৃতিক কৌশলটি সম্পর্কে জানতে পারি, তবে সকলের পক্ষে তওবার গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো সৃষ্টি জগতের স্নায়ু রজ্জুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর বিশ্বাস ও কার্য এক হলে মূল সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট মনে হবে।

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ কিভাবে মাফ হয়

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর করুণা ও মহত্ত্ব বুঝা খুব কঠিন। তিনি পরম কৌশলী, পরম বিজ্ঞানী। তাঁর কোন কাজ অবৈজ্ঞানিক নয়। সৃষ্টির আদি অন্তে যা কিছু ছিল বা আছে, বা সৃষ্টি হবে, এসব তিনি দৈব প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেননি। সকল কিছুতে রয়েছে বিজ্ঞানের সত্যসিদ্ধ প্রক্রিয়া। আমরা যা বুঝি এতেও যেমন রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত উপাদান তেমনি যে জিনিস বুঝি না তাতেও রয়েছে বিজ্ঞানের কৌশল। মূলত না বুঝার বিষয়টি আমাদের জ্ঞানের স্থূলতার কারণে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করতে পারি না। এটা সসীমের দেয়াল। এই সীমা পার হওয়া খুব কঠিন।

আমরা জানি পাপী ব্যক্তি তওবা করলে তার গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ তা'আলার গোনাহ মাফের প্রক্রিয়া কি আমাদের বিচার ব্যবস্থার মতো?

রহিম করিমের গালে চড় মারল। বিচারের সময় রহিম করিমের হাত ধরে বললো, আমি ভুল করেছি– আমাকে ভাই মাফ করে দাও। করিম সন্তুষ্ট হয়ে বললো, যাও তোমাকে মাফ দিলাম। গোনাহগার বান্দা গোনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইল, আল্লাহ কি করিমের মতো বলবে, যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম? এরূপে মাফ হলে গোনাহর সত্তা আছে বলে প্রমাণ হওয়া কঠিন। কারণ গোনাহ সত্তাধিকারী হলে এভাবে মাফ করার মধ্যে বিজ্ঞানের কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে না। কিন্তু আল্লাহর কোন কাজ বিজ্ঞানের বাইরের কিছু নয়। তাছাড়া গোনাহ তো সত্তাহীন কিছু নয়। যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে, একে বিলুপ্ত বা নষ্ট করতে হলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুশীলন করা প্রয়োজন।

আল্লাহ বলেন– "প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।" (আল-কুরআন : ১৩২)

"সেদিন নিশ্চিতরূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতঃপর যার আমলের ওজন ভারি হবে, সে-ই কল্যাণ লাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতি বরণকারী।" (সূরা-৭ : ৮-৯)

আল্লাহ তা'আল্লাহর পবিত্র কালাম থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি মানুষের নেক ও বদ আমল সত্তাধারী হবে। এরূপ না হলে ওজন করার কোন প্রশ্নই আসতো না। তাই আমাদের বিচার ব্যবস্থার মতো মুখের উক্তির মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

গোনাহ মাফের প্রশ্নই আসে না। তওবাকারী সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে– "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারী ও অত্যধিক পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।" (আল-কুরআন)

মহানবী (সা) বলেছেন– "পাপ হতে তওবাকারী একেবারে নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় বটে; বাস্তবিকপক্ষে পাপানুষ্ঠানের পর অনুতপ্ত হলে পাপ সমূলেই বিনষ্ট হয়।" (আল-হাদীস)

গোনাহ করে তওবা করার পর তা বিনষ্ট বা মাফ হয়ে যায় একথা সত্য; কিন্তু কিভাবে তা বিনষ্ট হয়– এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। পাপ মাফ হওয়ার শর্ত হলো তওবা করা। কিন্তু তওবা করলে কিভাবে তা বিনষ্ট হয় তা আমরা জানতে পারি না। মুরব্বীদের মুখে শুনেছি, পাপী যখন তওবা করে কাঁদতে থাকে তখন আল্লাহর 'আরশের কাছে একটি খুঁটি নড়তে থাকে, তখন আল্লাহ ঐ খুঁটিকে জিজ্ঞেস করেন। হে খুঁটি তুমি থামছ না কেন? তখন খুঁটি থেকে গায়েবী আওয়ায হয়, তোমার এক গোনাহগার বান্দা পাপ করে মাফের আশায় কাঁদছে, তাকে মাফ না করা পর্যন্ত আমি স্থির হতে পারছি না। তখন জিজ্ঞেস করবেন, তারা কী আমাকে দেখেছে? খুঁটি জবাব দিবে, না। আল্লাহ, তারা না দেখে তোমার আযাবের ভয়েই কাঁদছে। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি থাম, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। এ ব্যাখ্যাটি আমার দৃষ্টিতে একটি রূপক বর্ণনা। আমাদের মতো সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাদের জন্য রূপক বর্ণনাই যথেষ্ট। কিন্তু এই সমাজে অনেক জড়বাদী আছেন যারা একে আজগুবি মনে করেন। তাদের কথা হলো এসব যুক্তি অন্ধকে হাতি দেখানো ছাড়া কিছু নয়। এর পেছনে বিজ্ঞানের কোন তাত্ত্বিক সম্পর্ক নেই। আমি পূর্বেই বলেছি অপ্রাকৃতিক বিষয় বুঝা খুব কঠিন। তবে অনেক সময় কঠিন জিনিস যুক্তি দিয়ে সত্যের কাছাকাছি এনে সহজভাবে মূল্যায়ন করা যায়।

প্রত্যেক রূপক বর্ণনার সারতত্ত্ব থেকে সূক্ষ্মাতীত যে সত্য খুঁজে পাওয়া যায়, সেখানেই থাকে বিজ্ঞানের সারাংশ। তাই এই রূপক বর্ণনাটির সারাংশ বের করলে গোনাহ বিনষ্ট হওয়ার মতো এক বৈজ্ঞানিক সত্য পাওয়া যাবে যা কিনা জড়বাদীদের হুঁশ এনে দিতে পারে। আমরা কোন ব্যক্তির অন্যায়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাই না বলে সাধারণত মৌখিকভাবে বলি তোমাকে মাফ করা হলো। কিন্তু যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে তাকে আমাদের মতো মাফ করে দিলে চলবে না। কারণ

www.nagorikpathagar.org

অস্তিত্ব বিনষ্ট করতে হলে প্রযুক্তির মাধ্যমেই করতে হবে। যেমন একটি গুণ নষ্ট বা বিনাশ কিংবা পরিবর্তন করতে হলে যেমন আর একটি গুণাধার সত্তার সাথে সংমিশ্রণ করতে হয়, তেমনি গোনাহকে বিনষ্ট করতে হলে কিংবা উত্তম মানে পরিবর্তন করতে হলে আর একটি উত্তম সত্তার সাথে সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। অন্যথায় অস্তিত্ব বিনাশ বা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বর্জ্য পদার্থের দুর্গন্ধ বায়ুর পরতে পরতে মিশে এক সময় তার অস্তিত্ব আর থাকে না। বায়ুর পরতেই তা লুকিয়ে যেন লুপ্ত হয়ে যায়। আতর, পারফিউম সুগন্ধি জাতীয় জিনিস। এ জিনিস ব্যবহার করলে দুর্গন্ধ লাঘব হয়। পাপ সত্তা সংক্রামক জাতীয় সূক্ষ্ম যন্ত্রণাকারী উপাদান। এর মান নিকৃষ্ট দুষ্কৃতিপূর্ণ। এ সত্তাকে বিনষ্ট করতে নিশ্চয়ই কোন গুণাধার সত্তার সাথে সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। তাছাড়া এর মান পরিবর্তন হওয়ার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকতে পারে না। সাদা কাপড়ে ময়লা লেগেছে, মুখে যদি বলি ময়লা দূর হয়ে যা, এতে যেমন কোন ফল হবে না, তেমনি গোনাহের উপাদান নষ্ট করতে গিয়ে, এরূপ বাক্য ব্যবহার করলে হবে না। সাবান দিয়ে যেভাবে ময়লা দূর করতে হয়, তেমনি গোনাহকে বিনষ্ট করতে হলে সাবানের মতো কোন উপাদান দিয়ে একে পরিষ্কার করতে হবে। আসলে গোনাহ যে উপাদানের মাধ্যমে বিনষ্ট হয় সে জিনিস খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। এ কারণে আল্লাহ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাপের অস্তিত্বকে বিনাশ করেন, সেই প্রক্রিয়াতে তওবা করার মাধ্যমে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে এক ধরনের নীতিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সম্পর্কের মাধ্যমে খোদার পক্ষ থেকে যে হুকুম বা নির্দেশ প্রেরিত হয় এর মাধ্যমেই গোনাহের সত্তার মান বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশ বা হুকুম আমাদের বাক্যালাপের মতো নয়। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে 'আরশের স্নায়ুমূল থেকে তরঙ্গের যে বহর নেমে আসে, এর নামই নির্দেশ। পক্ষান্তরে এই তরঙ্গের ঝাঁকুনির মাধ্যমেই গোনাহের সত্তার মান বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বলা হয়, আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তির গোনাহ মাফ করেন তখন তিনি গোনাহের সত্তাগুলোকে নেকে বা পুণ্যে পরিণত করে দেন। অথবা গোনাহের সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আমরা স্থূল চোখে গোনাহ কিংবা নেক নামের কোন সত্তার অস্তিত্ব দেখি না। আমি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ, পুণ্যের যে অস্তিত্বগত সত্তা তুলে ধরেছি, তাতে সকল যুক্তি ও ব্যাখ্যার সারাংশ হলো, পাপ ও পুণ্যের অস্তিত্ব ভিন্ন প্রকৃতির ঢেউ বা তরঙ্গ। এর মাঝে পাপ সত্তা কৃষ্ণকায়া ও ধূম্র প্রকৃতির। আর নেক সত্তা

www.nagorikpathagar.org

আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় প্রকৃতির। এই উভয় ধরনের সত্তা আমাদের আহার্য শক্তির বিকীর্ণ কর্মশক্তি। দৈনন্দিন কাজ কর্মের মাধ্যমেই তা নিঃসৃত হয়। পাপ নামের কৃষ্ণকায়া তরঙ্গ দানাগুলো এই অনন্ত অসীম জগতেই জড় হয়ে থাকে। সৃষ্টিকর্তা যখন ব্যক্তির গোনাহ মাফ করে দেন তখন এর অস্তিত্ব একেবারে শূন্য হয়ে যায় না। মূলত শক্তির বিনাশ না থাকায় এই সত্তা পুনঃবণ্টন হয়ে যায়। আমাদের অঙ্গের অগ্রভাগের আবেগ আবেদন-নিবেদনের প্রেক্ষিতে মস্তিষ্কের কোন অংশ আলোড়িত হয়ে যেমন সেখান থেকে তার অভাব পূর্ণ করার জন্য তরঙ্গ বার্তা প্রেরিত হয়; তেমনি তওবাকারীর আবেদন-নিবেদন এর প্রেক্ষিতে অসীম বিশ্বের মহাস্নায়ুমণ্ডলীর মূল দপ্তর 'আরশ নামের সচিবালয় থেকে যে তরঙ্গ বার্তা আসে এর মাধ্যমেই পাপ সত্তা পুনঃবণ্টন হয়ে যায়। হাদীসে কুদসীতে আছে–

মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন– "(হে ফেরেশতাগণ!) যখন আমার বান্দা কোন গোনাহ করতে মনস্থ করে কিন্তু তখনও তা করেনি, তারপর যদি সে তা করে বসে তবে তার জন্য একটি গোনাহ লেখ। তারপর যদি সে তা হতে তওবা করে, তবে তা মুছে দাও। আর যখন আমার বান্দা কোন সওয়াব কাজ করতে মনস্থ করে কিন্তু এখনও তা করেনি তবে তার জন্য একটি সওয়াব লেখ। অতঃপর যদি সে তা সম্পাদন করে তবে তার জন্য দশ হতে সাত শত গুন পর্যন্ত সওয়াব লেখ।" ইবনু হাববান আবু হুরায়রা (রা) হতে এটি বর্ণনা করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগতের রহস্য বুঝা খুব কঠিন। তওবাকারীর পাপ মুছে যায়, বিনষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু কিভাবে হয়, এ ধারণা আমাদের নেই। এই বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মনীতিতে শৃঙ্খলাবোধ বিজ্ঞানের নীতিমালার যুগান্তকারী নমুনা। বীজ মাটির স্পর্শ না পেলে গাছ হয় না, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে স্তনে দুধ আসে না, কি বিচিত্র নিয়ম। তাই পাপসত্তা, অন্য প্রকৃতির (গুণাধার) সত্তার সাথে মিলন না ঘটলে বিনাশ হওয়া চিন্তা করা যায় না। সেজন্য পাপ নামের তরঙ্গ দানার সাথে আর এক প্রকার উত্তম তরঙ্গ দানার মিলন ঘটা আবশ্যক। তওবাকারীর আবেদন-নিবেদনের প্রেক্ষিতে এই উত্তম সত্তা সৃষ্টি হতে পারে কিংবা তা বিনাশ হতে পারে? এই প্রক্রিয়াটি কি বিজ্ঞানসম্মত? এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার খেয়ালে শব্দ বা তরঙ্গের ব্যতিচার ক্রিয়ার কার্যাবলীর কথা স্মরণ হয়। দু'টি শব্দ বা তরঙ্গের উপরিপাতন ক্রিয়া যেভাবে সম্পাদন হয় তাকে বলে ব্যতিচার ক্রিয়া। এই ব্যতিচার ক্রিয়ার ফলে তরঙ্গ দু'টির অবস্থা দু'রকম হতে পারে। এখানে হয়তো তরঙ্গ ধ্বংসকারী ব্যতিচার ক্রিয়া ঘটতে পরে (Destructive Interferance) অথবা গঠনমূলক

www.nagorikpathagar.org

সত্তা সৃষ্টির ব্যতিচার ক্রিয়াও (Constractive Interference) ঘটতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় মূল শক্তি বিনাশ হয় না। বরং শক্তি পুনঃবণ্টন হয় অথবা তার মান বৃদ্ধি পায়।

মূলত যখন নিকৃষ্ট বা দুষ্কৃতি গুণসম্পন্ন সত্তার সাথে উৎকৃষ্ট গুণাধারের সংমিশ্রণ বা ঘনায়ন ঘটে তখন মন্দ সত্তাটি রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তরঙ্গের ব্যতিচার ক্রিয়া পরীক্ষিত সত্য ঘটনা। এই সূত্র থেকে একথা বলা যায় যে, পাপ সত্তা মোচন বা বিনষ্ট হওয়া কিংবা পুণ্যে পরিণত হওয়া অবাস্তব কিছু নয়। খোদা তা'আলার 'আরশকে যদি আমরা সৃষ্টি জগতের মস্তিষ্ক মনে করি তাহলে মূল ঘটনাটি বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। পাপের দানা তরঙ্গ প্রকৃতির। পক্ষান্তরে ব্যক্তির আবেদন-নিবেদন প্রেরিত হয় তরঙ্গের ন্যায় বা ঢেউ আকারে। তারপর আ'রশ থেকে খোদার নির্দেশে যে শক্তি বা নির্দেশ প্রেরিত হয় তার প্রকৃতিও ঢেউ বা তরঙ্গের মতো। এর সাথে ব্যক্তির পাপ তরঙ্গের ঘটে উপরিপাতন। ফলে তা হয়তো পুনঃবণ্টন হয়ে যায়; অথবা উত্তম মান সম্পন্ন হয়।

এ জগতের সকল কিছু 'আরশের ছাদের নিচে অবস্থিত। এ অনন্ত অসীম বিশ্ব-জগতের কোন তলা নেই। কিনারহীন এই বিশাল জগতের তুলনায় আমাদের সৌরজগৎ একটি পরমাণুর মতোও নয়। এরপরও দেখা যায় আমাদের মস্তিষ্ক মনের আজ্ঞাধীন হয়ে দেহের আবেদন-নিবেদনে সাড়া দেয়। অঙ্গের চাহিদা মতো তার কামনা-বাসনা, ব্যথা-বেদনা, পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে মনের কোন গোলাভাণ্ডার নেই। সে শুধু তরঙ্গবার্তা বা নির্দেশ প্রেরণ করার জন্য মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে। কিন্তু অভাব পূরণ হয় নিজ দৈহিক সত্তার মাধ্যমে। বিজ্ঞানীগণ শূন্যমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন। তারা বলেন, এ বিশ্বের শূন্যমণ্ডল তরঙ্গ ধারণ করতে পারে। এটি তার বিশেষ গুণ। মূলত আমাদের দৃষ্টিতে যা শূন্যমণ্ডল, সেই পরিসরটিতে অপ্রাকৃতিক যে অতি সূক্ষ্ম আবরণ আছে, এটিই বিশ্ব-জগতের স্নায়ুতন্ত্রের স্তর। বিজ্ঞানের দৃষ্টি এখনও সেই স্তরে পৌঁছতে পারেনি বলে তাকে শূন্যমণ্ডল মনে করি। আমরা যদি ড্রি-বগলীর মতো চিন্তা করি যে, তরঙ্গই বস্তু, তাহলে আমাদের আত্মা ও দেহের বিকীর্ণ সত্তার সাথে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক যে নিহিত রয়েছে একথা অস্বীকার করতে পারব না। তরঙ্গে তরঙ্গে যদি ব্যতিচার ক্রিয়া ঘটতে পারে তবে পাপ তরঙ্গের সাথে তওবাকারীর আবেদন-নিবেদন-এর প্রেক্ষিতে আল্লাহর 'আরশ থেকে তরঙ্গ বার্তা

www.nagorikpathagar.org

প্রেরিত হলে এ দুইয়ের মিলনেও ব্যতিচার ক্রিয়া সংঘটিত হবে। এরূপ এক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় পাপীর পাপ মোচন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

আমি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পাপ মোচনের যে প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছি, তা কোন হাদীস গ্রন্থে পাইনি। এমনকি আল-কুরআনের কোথাও হুবহু এভাবে বর্ণনা করা হয়নি। মূলত পুরো বিষয়টি আমার গবেষণার বিষয়। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। আসলে যিনি পাপ মাফ করেন তিনিই তা ভালো জানেন। আমি এতটুকু চিন্তা করেছি এ কারণে যে, যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আলেম সমাজের কথা, ইসলামী গবেষক বা চিন্তাবিদদের কথা এবং কুরআনের বাণী কিছু অজ্ঞ লোক না বুঝে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ভর নয় বলে মন্তব্য করে উপহাসের দৃষ্টিতে বর্ণনাকারীগণকে 'মৌলবাদী' বলে তিরস্কার করেন, সে কারণে আমি আমার গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে এর বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে আমি একথাও স্বীকার করছি যে, আমার যুক্তি আপেক্ষিক। বস্তুত আজ যারা বিজ্ঞান নিয়ে হৈ-চৈ করেন তাদের জানা উচিত যে, আল-কুরআন বিজ্ঞানের বৈরী কোন গ্রন্থ নয়। বিশ্বাসের সাথে এর প্রতিটি বাণী গবেষণা করলে দেখা যাবে কুরআন এক নির্ভুল মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এতে রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক পূর্ণতার বিধান। যা ইহকাল ও পরকালের মুক্তির দিশারী।

বিশ্ব-জগতের অসীম রহস্যের অন্তরালে অপ্রাকৃতিক নিয়মে কত কিছু যে ঘটছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের স্থূল দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখতে পারলে হয়তো বা পথ চলা হতো অসম্ভব। কখনো থমকে দাঁড়াতে হতো মাঝ রাস্তায় অথবা আহার-নিদ্রা সবই বিসর্জন দিতে হতো। অপ্রাকৃতিক নিয়মের বিস্ময়কর কাজ দেখি না বলেই আমরা ভয়হীনভাবে বেঁচে থাকতে পারছি। সেজন্য কখনো যদি কোন অপ্রাকৃতিক দৃশ্য আমরা দেখি তখন একে বিচার বুদ্ধি দিয়ে মাপতে পারি না। তখন এক কথায় বলি, সেটি অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু বিশ্বের কার্য-কারণ নিয়মের কাছে অলৌকিক বলতে কিছু নেই। যা কিছু ঘটে সকল কিছুই বিজ্ঞানসম্মত। রাসূল (সা)-এর মি'রাজ ভ্রমণ এবং তাঁর বাহনের ব্যাপারটিও আমরা অপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক কাজ মনে করি। কিন্তু এই ঘটনাটি যদি বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে সেখানে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ পাপ মাফের ব্যাপারটি যদি লৌকিকতার মধ্যে আনা যায়, তবে রাসূলের (সা) মি'রাজ যাত্রাও লৌকিকতার বিষয়।

www.nagorikpathagar.org

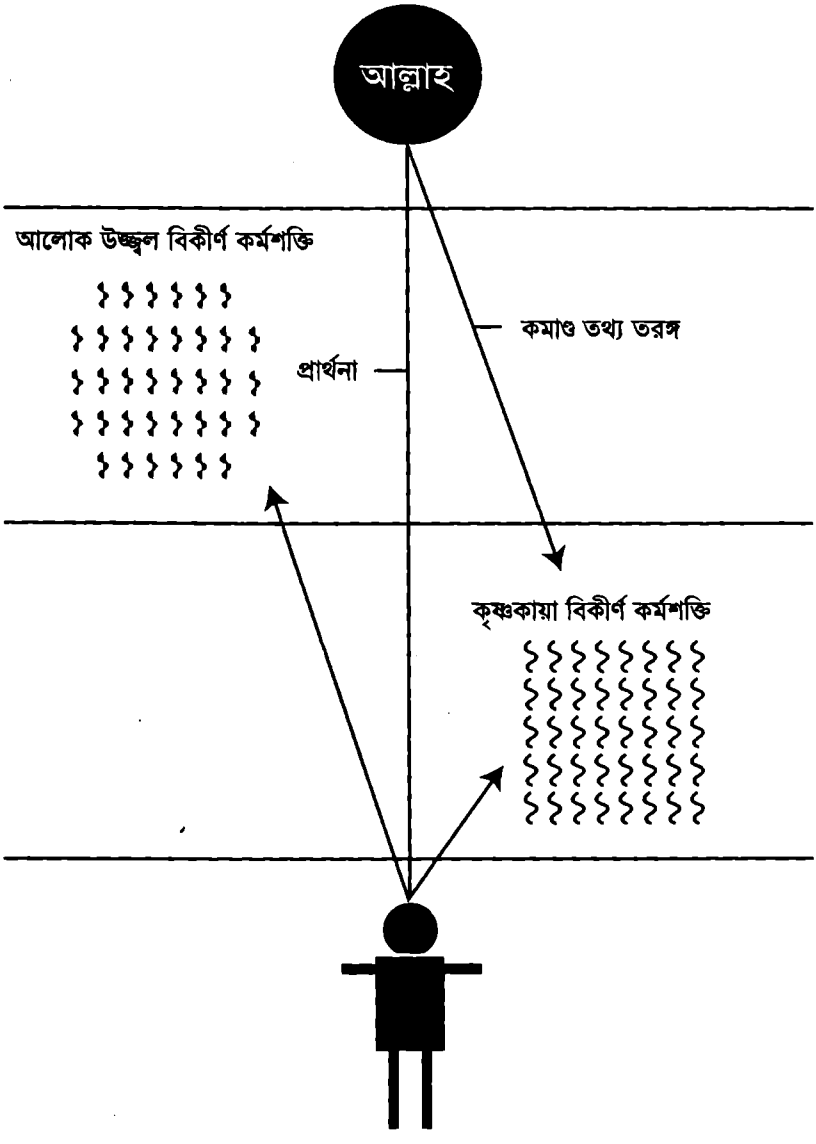

"পাপ হতে তওবাকারী একেবারে নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় বটে; বাস্তবিকপক্ষে পাপানুষ্ঠানের পর অনুতপ্ত হলে পাপ সমূলেই বিনষ্ট হয়।" (আল-হাদীস)

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মি'রাজ

মহাবিশ্বের পৃথিবী নামক এক ক্ষুদ্র গ্রহ থেকে মানবীয় গুণসম্পন্ন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) রজব মাসের ২৭ তারিখ সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য দেখার জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমায় তাঁর আমন্ত্রণে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করেন। সেদিন পৃথিবীর ধুলিময় জগতের এই বাসিন্দাকে নিয়ে যাওয়া হয় বোরাক ও রফরফ এর মাধ্যমে। পৃথিবী থেকে আল্লাহর 'আরশ পর্যন্ত যাত্রাকেই বলা হয় মি'রাজ। রাসূলের (সা) এই মি'রাজ যাত্রা কি সশরীরে হয়েছিল, না স্বপ্ন যোগে হয়েছিল তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেউ মনে করেন, রাসূলের মি'রাজ হয়েছিল সশরীরে। আবার অনেকেই মনে করেন স্বপ্নযোগে। কিন্তু রাসূল (সা) বলেছেন, তিনি সশরীরেই গিয়েছেন এবং সবকিছু স্বচক্ষেই দেখে এসেছেন। কিন্তু এরপরও যারা বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন, আমি বলব তাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টি প্রসন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি সশরীরেই গিয়েছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাধা ভেদ করে 'আরশ মহলে সশরীরে ঘুরে আসা বিচিত্র কিছু নয়। যারা বির্তক সৃষ্টি করেন, তারা মূলত বোরাক ও রফ্‌রফ্‌কে স্থূল বাহন মনে করেন, অথবা সময় সম্পর্কে তাদের ধারণা নগণ্য। সে যাই হোক আমরা যদি বোরাক ও রফরফকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কৌশল মনে করি তবে রাসূলের মি'রাজ যাত্রা যে সশরীরে হয়েছিল তা বুঝে আসবে। তাই বোরাক ও রফরফের যান্ত্রিক কৌশল ও রাসূলের (সা) মানব প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মানব দেহ জড়ধর্মী। এর আয়তন আছে, ওজন আছে। একে ভাগ করা যায়, ধরা যায়। তাই মানুষ শূন্যে হাঁটতে পারে না। আকাশের দিকে সাঁতার কেটে উড়তে পারে না। কিন্তু রাসূল (সা) কী জড়ধর্মী মানুষ ছিলেন? যেহেতু বলা হয় রাসূলের (সা) দেহের কোন ছায়া ছিল না; তিনি ছিলেন মহামানব। তাই তিনি জড়রূপী মানুষ হলেও তিনি আমাদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। আমি রাসূলের দেহ জড়, অজড় এ বির্তকে না জড়িয়ে বলতে পারি, তিনি জড়ধর্মী হলেই বা কী? তাতেও সশরীরে মি'রাজ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। নবীজি (সা) যদি স্বাপ্নিক অথবা আধ্যাত্মিকভাবে মি'রাজে গিয়ে থাকতেন এবং সেভাবে বর্ণনা করলেও তো যারা বিশ্বাসী তারা সকল ঘটনাবলী সেভাবেই বিশ্বাস করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি যা সত্য তাই বলেছেন। মি'রাজের যেসব ঘটনাবলী সাধারণ মানুষের কাছে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে, তা হলো রাসূল (সা) কী করে সশরীরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাধা অতিক্রম করে এতো অল্প সময়ে সুদুর পথ অতিক্রম করে আবার সেই রাতেই নিজ গৃহে ফিরে এসেছেন?

www.nagorikpathagar.org

মি'রাজ যাত্রার দূরত্ব যতই হোক না কেন কিন্তু সময়টা এতো অল্প ছিল যে, রাসূল (সা) ফিরে এসে দেখলেন তখনো দরজার শিকল নড়ছে এবং অযুর পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। এই রহস্য থেকে সত্যের সন্ধান করতে না পেরে সন্দেহবাদীরা আরও সন্দেহের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছিল। তারা রাসূলের (সা) কথাকে উপহাসের দৃষ্টিতে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের সামনে অনেক প্রমাণাদি তুলে ধরলেও তারা তা' বিশ্বাস করতে পারেনি।

এ যুগেও যারা মি'রাজ যাত্রার বাহনকে স্থূল প্রকৃতির কিছু মনে করেন এবং সময় সম্পর্কে নিতান্তই ধারণা রাখেন, তাদের অবাক হওয়ারই কথা। তবে সেযুগে যাঁরা একবাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন তাঁরা আল্লাহর নবীকে সত্যবাদী জেনে নবীজির প্রতি আল্লাহর বিশেষ মো'জেজা হিসেবে ধরে নিয়েই বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁদের ঈমান আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) প্রতি এতোই প্রসন্ন ছিল যে, তাঁরা একে বাস্তবধর্মী কিনা তা যাচাই বাছাই করারও চিন্তা করেননি। বরং সম্প্রতি বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় মি'রাজ যাত্রা আসলেই বাস্তবধর্মী। তাই যুগের সন্দেহবাদীদের সকল বিতর্কের মূল শিকড় উৎপাটন করার জন্য মি'রাজ-এর ঘটনাবলীর বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি তুলে ধরেছি।

সশরীরে মি'রাজের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

পৃথিবী ও 'আরশে মহল বহু দূরের পথ। কত দূরে হবে তা মানবীয় চিন্তার ঊর্ধ্বে। এতো দূর কি রাসূল (সা) এই দেহ নিয়েই গিয়েছিলেন, না অন্যকোন ব্যবস্থাপনায় গিয়েছিলেন, তা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি রাসূল (সা) আমাদের মতো জড়দেহী মানুষ হলেও তিনি ছিলেন বিশেষ গুণের অধিকারী। জড় পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় জড় পদার্থ এই তিন অবস্থা ছাড়াও শুধু ঢেউ বা তরঙ্গের আকারেও থাকতে পারে। পদার্থের কঠিন আবরণের ভেতরে থাকে বিদ্যুত ও জ্যোতি। শত কোটি বিদ্যুতের পুটলা একত্রিত হয়েই সৃষ্টি হয়েছে জড় দেহ। তাই স্থূল দেহকে জড়দেহ বলা চলে।

পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম দেহকে জ্যোর্তির দেহও বলা চলে। মূলত একই জিনিস ভিন্ন প্রকৃতিতে প্রকাশ হলেও শরীরি অস্তিত্ব পাল্টে যায় না। সুতরাং যে প্রকৃতির দেহ নিয়েই রাসূল (সা) মি'রাজ ভ্রমণ করুক না কেন, সকল অবস্থায় বলা চলে রাসূল (সা) সশরীরেই মি'রাজে গিয়েছিলেন। বোরাক নামক বাহন রাসূলের (সা) মানব

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতির দেহকে 'জ্যোতির দেহ' বানিয়েই সেই সুদূর পথ ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিলে।

মহানবী প্রথমে যে দ্রুতযানে চড়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার নাম 'বোরাক'। এ দ্রুতযান জিব্রাইল (আ) নিয়ে এসেছিলেন। বোরাক থেকে নেমে যে দ্রুতযানে চড়েছিলেন তার নাম রফরফ। এখন প্রশ্ন হলো এই দ্রুতযানগুলো কী? এগুলো কিসের তৈরী? এর গতিসীমা কত? কারণ, এগুলোর যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার সাথে রাসূলের (সা) মি'রাজ যাত্রার শারীরিক সম্পর্ক জড়িত।

এ দ্রুতযানগুলো কিসের তৈরী– এর জবাবে বলা যায়, জিব্রাইল (আ) যেহেতু নূরের তৈরী, অতএব সেগুলোও নূরের তৈরী। এগুলোর গতির তুলনা করতে গিয়ে বলা যায় এর গতি যদি আলোর গতির সমানও হয় তবেও দেখা দেবে বড় ধরনের সমস্যা। কারণ এ গতিতে গেলেও শুধু সাইরিয়াস গ্রহে যেতে সময় লাগবে ৯ (নয়) আলোকবর্ষ। কিন্তু পৃথিবী ও সাইরিয়াস গ্রহের দূরত্বের চেয়ে কম দূরত্বের মধ্যে তো আর আল্লাহর 'আরশ মহল অবস্থিত নয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় বোরাক ও রফরফ এর গতি আলোর গতিরও ঊর্ধ্বে ছিল। আমরা আলোর গতি জানি কিন্তু নূরের গতি জানি না। লক্ষণীয়, আলোক আর নূর এক জিনিস নয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, নূরের গতি যা ছিল সেই দ্রুতযানগুলোর গতিও তাই ছিল। এর চেয়ে বেশি বলা এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এর গতি নির্ণয় করা মানবীয় জ্ঞানের ঊর্ধ্বেই বলা চলে। এই দ্রুতযানগুলোর কাজের প্রক্রিয়ার সাথে রাসূলের (সা) মি'রাজ যাত্রার সার্বিক ঘটনাবলী জড়িত। তাই সেগুলোর কাজের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বোরাক ও রফরফের যান্ত্রিক কৌশল কেমন হতে পারে

বর্তমান দুনিয়ার প্রচলিত যানবাহনের মধ্যে রকেটই সবচেয়ে দ্রুতগামী। এর গতি যত বেশিই হোক আলোর গতির ঊর্ধ্বে নয়। তাছাড়া আলোর গতিতে মি'রাজ যাত্রা হলেও সময় এতো অল্প হওয়ার কথা নয়। এ আলোকেই ধরে নেয়া হয়েছে মি'রাজ যাত্রা হয়েছে নূরের গতিতে। মানুষ অক্সিজেন ব্যতীত বাঁচতে পারে না। তাই দেখা গেছে চাঁদের মতো জায়গায় যেতে নিতে হয়েছে অক্সিজেন। কিন্তু বেশিক্ষণ অক্সিজেন ব্যতীত না থাকতে পারলে অল্প কিছু সময় দম বন্ধ করেও থাকা যায়। এই ক্ষণিক সময় অক্সিজেন না হলেও চলে। আমরা যানবাহনে সশরীরে চড়ি আবার সশরীরেই ফিরে আসি। স্থল যানবাহনের মধ্যে যেগুলো মাটি দিয়ে চলে সেখানে যেমন সময় ও পথ চলার ঝক্কি ঝামেলা থাকে তেমনি

www.nagorikpathagar.org

আকাশযানেও একই অবস্থা। তবে সবচেয়ে নিরাপদ ও অল্প সময়ে ভ্রমণের জন্য এখনো যা আবিষ্কার হয়নি তা হলো এমনি এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি পুরো মানবদেহকে তরঙ্গায়িত করে বাতাসে ছেড়ে দিয়ে অন্য আর একটি যন্ত্র দ্বারা ঐ তরঙ্গকে পূর্ণ মানুষে রূপ দিয়ে দেয়া। এ ব্যবস্থায় টিভির বিদর্শন বিন্দু কিংবা বেতার তরঙ্গের মতো শূন্য দিয়ে উড়ে গিয়ে গ্রাহক যন্ত্রের কাছে আগের মতো রূপ নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া যাবে।

মি'রাজ যাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অল্প সময়ের ভ্রমণ। তাই দুনিয়ার প্রচলিত যানবাহনের কৌশলের মধ্যে একে চিন্তা করা ঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বে আমরা একই যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসে দূরের মানুষের ছবিসহ তার মুখের কথা শুনে থাকি। সাত সাগর তের নদী পার হয়ে নিমিষেই তা ধরা পড়ে গ্রাহক যন্ত্রে। বিশ্বকাপ খেলা চলছে জার্মানীতে, আমরা বাংলাদেশে বসে গ্যালারির দর্শকদের মতোই তা উপভোগ করছি। সময়ের সামান্যতম ব্যবধান নেই। এ ব্যবস্থায় প্রেরক যন্ত্রের পর্দায় কোন দৃশ্যের বা ব্যক্তির ফটো টিউবে নিয়ে তা বিভিন্ন আলোকের জোড়ালো বিদ্যুৎ ঝলককের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা বিন্দুতে বিভক্ত করে প্রেরণ করা হয়। এ ব্যবস্থাকে বলা হয় স্ক্যানিং বা বিদর্শন।

অন্যদিকে শব্দকেও রেড়িও ওয়েভে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয়। অপরদিকে গ্রাহক যন্ত্র সরাসরি বাতাস থেকে এই বিদর্শন বিন্দু ও রেডিও ওয়েভকে জড় করে বাস্তবের মতো প্রকাশ করে। এই ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি তার নিজস্ব অবস্থানে টিক অবিকলই থাকে কিন্তু পাঠানো হয় শুধু তার ছবির বিদর্শন বিন্দু। এভাবে যাত্রা হলেও পুরোপুরি সশরীরের যাত্রা বা ভ্রমণ হয়েছিল তা বলা যায় না। কিন্তু ছবিকে যেভাবে স্ক্যানিং করা হয় সেভাবে যদি পুরা মানুষটির দেহ স্ক্যানিং কার সম্ভব হয়, তবে ব্যক্তি তার পূর্বের জায়গায় অবিকল থাকার প্রশ্নই আসে না। তার পুরো জড় অস্তিত্বই স্ক্যানিং হয়ে যাবে।

আবার গ্রাহক যন্ত্রের কৌশল তাকে নিয়ে আসবে বাস্তবের মতো পূর্বের অবস্থায়। তবেই হবে সশরীরে ভ্রমণ। মানুষের পক্ষে এখনো এরূপ প্রযুক্তি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। হয়তো বা একদিন তা সম্ভব হতেও পারে। মানুষ না পারলেও খোদার পক্ষে এরূপ প্রযুক্তিতে রাসূল (সা) কে মি'রাজ ভ্রমণে নেয়া অসম্ভব কিছু নয়। এখন যদি ধরে নেই বোরাক ও রফরফ এমনি দু'টি কৌশলের নাম যার একটির মাধ্যমে রাসূলের (সা) পবিত্র দেহ মোবারকে নূরের বিন্দুর ন্যায় স্ক্যানিং করা হলো, অপরদিকে দ্বিতীয়টির মাধ্যমে ঐ নূরের স্ক্যানিং বিন্দুগুলো জড় করে বাস্তবের মতো রূপ দেয়া হলো। তাহলে সশরীরে ভ্রমণ অসম্ভব কোথায়? পৃথিবীর

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পক্ষে কী তাঁকে টেনে রাখা সম্ভব? তাঁর গতি যদি আলোর গতির চেয়ে ঊর্ধ্ব গতির হয় (কোটি কোটি গুণ বেশি) তবে চোখের পলকে পূর্বের গন্তব্যে ফিরে আসা অসম্ভব হবে কি?

অন্যদিকে চোখের পলকের মতো সময়ের জন্য অক্সিজেন নেয়ারই বা প্রয়োজন কী? আমার দর্শন মি'রাজ যাত্রার ব্যবস্থাপনা এমনি একটি উন্নততর কৌশল। যে আল্লাহ এই বিশ্ব-জগতসহ মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে এরূপ কৌশল তৈরী করা অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহর পক্ষে কোন কিছু সৃষ্টি করতে কারিগরেরও প্রয়োজন হয় না। তিনি শুধু 'কুন ফাইয়াকুন' বললেই সবকিছু হয়ে যায়।

আজকের বিজ্ঞান পদার্থ বলতে ঢেউকেও স্বীকার করে নিয়েছে। মানবদেহের স্থূল আকার ঢেউ-এর ন্যায় ধারণ করলেও সেটি ব্যক্তির অস্তিত্বেরই সত্তা। তাই রাসূল (সা) যেভাবেই যাক না কেন সেই ভ্রমণ তাঁর সশরীরেই হয়েছিল। মি'রাজ ভ্রমণের ক্ষণিক সময়টিতে তিনি পূর্বের অবস্থায়, আগের স্থানে অবিকল ছিলেন না। সেই সময় এতো নগণ্য ছিল যা খণ্ড করে দেখানো সম্ভব নয়। মূলত গতির পাল্লা সময়কে করেছে ছোট। তাই তিনি ফিরে এসে দেখলেন দরজার শিকল নড়ছে, অযুর পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। রাসূল (সা) যখন দিনের বেলা জনসমক্ষে মি'রাজ যাত্রার ঘটনাবলী এবং উল্লিখিত দৃশ্যাবলীর কথা প্রকাশ করলেন, তখন অনেক অজ্ঞলোক তা বিশ্বাস করতে পারেনি। আসলে গতির সাথে সময়ের যে বন্ধুত্ব আছে তা তাদের জানা ছিল না। গতি বাড়লে সময় যে খাটো হয় এ ধরনের বুদ্ধি বিবেচনাও তাদের ছিল না।

মহানবী (সা)-এর এই ভ্রমণ এতো দ্রুত গতিতে হয়, যা মানুষের কল্পনার ঊর্ধ্বে। সেই যাত্রার গতি সময়কে এতোই খাটো করেছিল যার মধ্য থেকে স্থান-কালের বন্ধন থেকে নতুন করে ঘটনাকে আলাদা প্রমাণ করা ছিল দুর্বোধ্য। বাস্তবে দেখা গেল সময় যখন ঘটনার ওপর চড়ে বসেছে, তখন সময়ের ক্ষীণতায় রাসূলের (সা) দেখে আসা ঘটনাবলীর সাথে যোগ বিয়োগ করে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া কষ্টই ছিল।

তাই এ যুগেও অনেকে বলে থাকেন, রাসূল (সা) ঊর্ধ্বরাজ্যে যাওয়ার সময় যাবতীয় জিনিস স্থির ছিল। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসলে আবার সকল কিছু চলতে থাকে। কিন্তু শূন্যের মধ্যে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বাস্তবে শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকার মতো কোন যুক্তি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক। কিন্তু সবকিছু গতিশীল অবস্থায় থাকার পরও

www.nagorikpathagar.org

তিনি ফিরে এসে সেসব দৃশ্য চলতে দেখে ছিলেন এবং তা যে দেখা অবাস্তব কিছু নয় সে কথা বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই প্রমাণ করা যায়।

গতি থেকে ঘটনার উৎপত্তি হয় একথা যেমন সত্য তেমনি দু'টি ঘটনার গতি যদি দু'রকম হয়, তাহলে দুই স্থানের দু'জন ব্যক্তির নিকট সময় জ্ঞান এক রকম মনে হবে না। যেমন পরস্পর দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি যদি দ্রুত গতিতে ঘটে আর অন্যটি যদি ধীর গতিতে ঘটে তবে যে ব্যক্তি দ্রুত গতির ঘটনার সাথে জড়িত থাকবে, সে এই গতির পাল্লা শেষ করে ধীর গতির কাছে এসে মনে করবে ঐ ঘটনাটি যেন স্থির হয়ে আছে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা যায়, ধরুন দু'জন লোক এক সাথে দাঁড়িয়ে আছে, তৎমধ্যে একজন ক্ষণিকের জন্য দু'চোখ বুঝে কি যেন ভাবছে, এরই মাঝে অন্য লোকটি তার সামনে থেকে আলোর বেগে উধাও হয়ে হাজার হাজার মাইল ঘুরে ফিরে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুনরায় সেখানে এসে হাজির হয়ে বললো, কি ব্যাপার! তুমি কত যুগ চোখ বুঝে দাঁড়িয়ে আছ? আমি ইতিমধ্যে কত দেশ ঘুরে ফিরে দেখে আসলাম, আর তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছ! তখন দাঁড়ানো লোকটির যদি স্থান কাল ও গতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকে, তাহলে সে বলবে এতো গাজাখোরি কথা। এ কী করে সম্ভব! তুমি না আমার সাথেই চলছ, তুমি এতো দূর গেলে কি করে? সেদিন নবীজির ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হয়েছিল।

আর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, গতি কি করে সময়কে খাটো করে দেয়। ধরুন কোন এক লোক বাজার থেকে মাছ কিনে এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল, মাছটি তাড়াতাড়ি কেটে রান্না কর। আমি গোসল করে আসছি। এই বলে সে ঘর থেকে বের হল। রাস্তায় এসে দেখল একটি দ্রুতযান দাঁড়ানো। তাকে নিতে এসেছে। সে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে সেটিতে চড়ে বসল। অমনি দ্রুতযানটি আলোর গতিতে (সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে) তাকে দুনিয়া ঘুরিয়ে নিয়ে আসল। সে এর মধ্যে বসেই বাইরের অনেক দৃশ্যাবলী লক্ষ্য করল। চলার পথে তার স্ত্রীর পিত্রালয়ের কাছ দিয়ে গেল। তার শ্বশুর বাড়ি হয়ত এক হাজার মাইল দূরে। সেদিন ঐ বেলায় তার শাশুড়ীকে পুকুরে গোসল করতে দেখে গেল। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টিও হচ্ছিল। এরূপ অনেক দৃশ্যই সে দেখল। তারপর দ্রুতযান থেকে নেমে খাওয়ার কথা মনে হল। এবার সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, আমাকে জলদি খাবার দাও। আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। একথা শুনে স্ত্রী জবাব দিল কি বলছ! এখনো তো মাছ কাটার জন্য দা'টিই হাতে নিতে পারলাম না। তোমাকে খাবার দেব কী দিয়ে? তখন স্বামী যদি বলে, আরে বোকা আমি সারা

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়া ঘুরে আসলাম, আর তুমি মাছ কাটতে পারনি? স্ত্রী যদি দূরদর্শী না হয় কিংবা স্বামীর প্রতি আস্থা না থাকে তাহলে এ কথা শুনে তার অবাক হওয়ারই কথা। মনে করুন স্ত্রী বিশ্বাস করল না তখন স্বামী বলল, তোমার মার কাছে জেনে দেখ তিনি এ সময় পুকুরে গোসল করছিলো, তখন প্রচণ্ড বৃষ্টিও হচ্ছিল। এবার স্ত্রী খবর নেয়ার চেষ্টা করল। জেনে দেখল, আসলেই ঘটনা সত্য। তবু সে বিশ্বাস করতে পারল না। কারণ স্বামীর প্রতি তার আস্থা ছিল না। কিন্তু লোকটির ছোট ভাই জ্ঞানী লোক এবং ভাইয়ের প্রতি আস্থাশীল, সে একথা শুনে বিশ্বাস করে নিল। রাসূল (সা)-এর ক্ষেত্রেও সেদিন এমনি ঘটনা ঘটে ছিল। যাঁরা বিচক্ষণ ও রাসূলের (সা) প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, তাঁরা নির্দ্বিধায় রাসূলের (সা) সকল কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সন্দেহবাদীরা সন্দেহের বেড়াজালেই ছিল নিমজ্জিত। তাই অসংখ্য যুক্তি প্রমাণের পরও তারা বিশ্বাস করেনি। গতি সময়কে খাটো করে ফেলায় রাসূল (সা) ফিরে এসে পূর্বের দৃশ্যাবলীকে চলতে দেখেছিলেন।

গতি থেকে সময়ের উৎপত্তি হলেও সময় এক আজব জিনিস। গতি ও স্থান এবং কাল পরস্পর নির্ভরশীল হলেও সকলের বেলায় সময় জ্ঞান এক রকম থাকে না। কারণ রাতের ক্ষণিক সময় কারও যদি দুঃখে কাটে, তবে তার কাছে সময় লম্বা মনে হবে। অপরদিকে পুরো রাতটাই যদি অন্যজনের সুখে কাটে তবে তার কাছে সময় নগণ্য মনে হবে। তাই কৃত্রিম ঘড়িতে যে সময় ধরা পড়ে তা প্রকৃত সময় নয়। সেজন্য রাসূল (সা)-এর কাছে মি'রাজের যে সময় জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছিল সেটিই প্রকৃত সময়। চলমান অবস্থায় অসংখ্য দৃশ্য অবলোকন করলে অনেক ক্ষেত্রে সময়কেও লম্বা মনে হয়। কিন্তু গতিশীল অবস্থায় অসংখ্য দৃশ্য ক্ষণিকেই অবলোকন করা যায়। সেজন্য বিশ্বে সময়ের কোন স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ নেই। সময় যেন সর্বত্রই লোকাল ও ব্যক্তি নির্ভর। মূলত সময়ের সাথে বস্তু বা বিশ্বের জন্মের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ সময় ব্যতীত বস্তুর কল্পনা করা যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি বস্তু ব্যতীত সময়ের অস্তিত্ব পাওয়াও কঠিন। তাই বার বার আমাদেরকে সময়ের ধাঁধাঁয় পড়তে হয়। সময়ের এই গোলক ধাঁধাঁ কাটাতে হলে যা' দ্বারা প্রতিক্রিয়া হয় সে পথ পরিহার করতে হবে। পরম স্থিতিশীল অবস্থায় শূন্য থেকে দোলক পিণ্ডটি ঘুরতে শুরু করলেই বিশ্ব জগতের উৎপত্তি আরম্ভ হয়। তাই যখন কিছুই ছিল না, তখন সময় বলতে কোন কিছুর জন্ম হয়নি। এই কঠিন অনস্তিত্বের মধ্যে কি করে এই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি হলো তা এখন জানার বিষয়। যিনি শূন্য পরিবেশে অস্তিত্বশীল জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তার পক্ষে ক্ষণিকেই মি'রাজ ভ্রমণ করানো অসম্ভব কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে নাস্তিক, আস্তিক ও কুরআনের ব্যাখ্যার পর্যালোচনা

একটি শিশু যখন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে দোলনায় দুলতে থাকে তখন থেকে শিশুটি অবাক দৃষ্টিতে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাছে যেন পৃথিবীর সবকিছু রহস্যময় মনে হয়। আমরা বুঝিনা শিশু তাকিয়ে কি দেখে। কিন্তু জ্ঞানী লোকের অন্তরদূরবীনে অবশ্য শিশুর তাকিয়ে থাকার রহস্য ধরা পড়ে। তারা মনে করেন শিশুটির ভাবনার বিষয়বস্তু হল, সে কিছু দিন পূর্বে ছিল না। তারপর কে তাকে জন্ম দিল, অন্ধকার রক্ষণশীল এক কুঠুরীতে? সেখান থেকে কেন আবার চলে আসতে হলো? মায়ের উদরে জরায়ু নামক রাজ্যের পরিসীমা খুবই স্বল্প। সেখানে হাঁটা চলার কোন ব্যবস্থা নেই। খাদ্যের জন্য ভাবনার প্রয়োজন পড়ে না। সে জগৎ সবদিক থেকে ছিল ঝামেলা মুক্ত। এই পৃথিবী তার তুলনায় অনেক বড়, অনেক রহস্যময়, অনেক ঝামেলাপূর্ণ। জন্মের পর প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে শিশু অবস্থায় যা ভাবা হয়েছে, এর কোনটিও আমাদের স্মৃতিতে নেই। কিন্তু ৫/৬ বছর হলেই শিশু যখন পিতা মাতাকে বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন ধরে নেয়া যায়, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় শিশুটিও ভাবনাহীন ছিল না। সেই থেকে দিনে দিনে পৃথিবীর রহস্যময় সকল কিছু তাকে ভাবিয়ে তুলে।

বয়স বৃদ্ধির পালা বদলে পৃথিবীর প্রতিটি রহস্য তাকে করে প্রশ্নের সম্মুখীন। একদিন পুব আকাশে উদীয়মান লাল টকটকে সূর্যটা দেখে ভাবে, এর উদয়ের রহস্যের কথা। রাতের বেলায় চাঁদকে দেখেও তার ভাবনার অন্ত থাকে না? তাই দোলনার বয়স থেকেই তার মাথায় ভাবনার দানা জমতে থাকে। এভাবেই শিশুরা হাজার রকম প্রশ্নের বোঝা মাথায় নিয়ে বড় হয়। ইত্যবসরে সে হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে, আস্তে আস্তে পাঠাশালার পড়াশুনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাঝ পথে এসে সবচেয়ে জটিল যে প্রশ্ন তাদের মাথায় কিলবিল করে, তা হলো কিভাবে এই বিশ্বের সূচনা হলো? কে সৃষ্টি করেছেন এই সুন্দর জগৎ? কেন সৃষ্টি করেছেন, তাকে যে দেখা যায় না, এর কারণই বা কি? ইত্যাদি .... ইত্যাদি। অথচ পাঠশালার শিক্ষাক্রমে তারা এসব প্রশ্নের যে উত্তর পায়, এতে তাদেরকে আরও সমস্যায় পড়তে হয়। দেখা যায়, মানব রচিত পুস্তকে এ সম্পর্কে যে তত্ত্ব দেয়া আছে, এর সাথে ধর্মীয় পুস্তকের তত্ত্বের অনেকাংশেই থাকে দ্বন্দ্ব। যারা ধর্মীয় শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকে তারা ভুল তত্ত্বের বেড়াজালে বন্দি হয়ে

www.nagorikpathagar.org

পড়ে। ফলে আজীবন ভুলের মধ্যেই ডুবে থাকে। তারা কোন সময়ই আলোর সন্ধান পায় না। পরিশেষে ভুলের অমানিশায় তাদের মৃত্যু হয়। কারণ মানব রচিত গ্রন্থাবলীর তত্ত্বে থাকে অসংখ্য মনগড়া যুক্তিহীন কথা। যার কোন উৎস পাওয়া যায় না। এগুলো মনের খেয়াল থেকেই রচিত হয়।

যেমন তারা মনে করে এই বিশ্ব-জগতে যখন কোন কিছুই ছিল না, তখন এর কোন এক বিন্দুতে হঠাৎ দৈবক্রমে ভর-শক্তির জন্ম হয়। এই ভর-শক্তিতে প্রবল অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি হলে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে সেই ভরশক্তি বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তখন থেকেই বিশ্বের সূচনা ও সম্প্রসারণ শুরু হয়।

এ যেন কেমন কথা!

যেখানে কোন কিছুই ছিল না সেখানে ভর-শক্তি সৃষ্টি হলো কী করে? আকাশে মেঘ নেই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এরূপ উদ্ভট আবির্ভাবের মাঝে যেমন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি কোথাও কিছু নেই এর মধ্যে থেকে ভর-শক্তি সৃষ্টি হয়ে গেল, এরূপ উদ্ভট আবির্ভাবের কথাও যেন আজব মনে হয়। এসব দৈব চিন্তার মধ্যে কোন কিছুরই আদি খুঁজে পাওয়া যায় না। যে তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ হয় না তার মধ্যে যে থাকে ভুল তথ্য, এটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তাই প্রকৃতির তাড়নায়ই এর আসল সত্য খুঁজে বের করা অনেকের জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা জানি পারমাণবিক শক্তির বিস্ফোরণে সৃষ্টির ধ্বংস আসে। অপরদিকে সমযোজী ও তড়িৎযোজী বন্ধনে নতুন সৃষ্টির সূচনা হয়। পক্ষান্তরে পরিকল্পনাহীন কোন কিছু সঠিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। ৩ বছরের শিশুকে আদর করে হাতে কলম দিয়ে লিখতে বললে, সে যে কি লিখবে তা যেমন বুঝা কঠিন তেমনি বিস্ফোরণধর্মী তত্ত্ব দিয়ে এই সুন্দর বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার ধারণা বিশ্বাসে আনাও কঠিন মনে হয়।

দশ তলা ভবন তৈরী করার আগে যেমন ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এর নক্সা তৈরী করে নিতে হয়, তেমনি এই বিশ্ব সৃষ্টির আগেই এর পরিকল্পনা করতে হয়েছে, একথা বিশ্বাস করতেই হবে। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীসহ আকাশের কোটি কোটি জ্যোতিষ্কের সুশৃঙ্খল পরিভ্রমণ সেই সত্যেরই সাক্ষী। পৃথিবীতে পাঁচটি গাড়ি এক সাথে চললেই দেখা দেয় সমস্যা, কিন্তু কোটি কোটি গ্রহ, নক্ষত্র আপন আপন গতিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে অসীম শূন্যে যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা দেখে অবাক হওয়ারই

www.nagorikpathagar.org

কথা। এরা ভুল করেও কোন দিন অন্যের স্থানে আসে না। কি সুন্দর এই বিশ্ব-জগতের সুষম গতির খেলা! এর কোথাও নেই কোন উচ্ছৃঙ্খলতা। নেই কোন আক্রোশ কারও প্রতি। কে এই গতির ধারক? কে এই গতির স্রষ্টা? যেখানে কিছুই ছিল না সেখান থেকে কার কথায় এই সুশৃঙ্খল গতির ঝরণা সৃষ্টি হলো? একটি মারবেলকে সরল পথে গতি দিয়ে ছেড়ে দিলে, সেটি সরল পথেই চলতে থাকবে যদি কোথাও সে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। কিন্তু একে তো কেউ না কেউ গতিশীল করার জন্য বল প্রয়োগ করতে হবে। এই বিশ্বে যা কিছু গতিশীল তার গতি কি চিরন্তন? এই প্রশ্নের উত্তরের সাথে এ বিশ্ব-জগৎ কোত্থেকে উৎপত্তি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, তার সত্যতা গেঁথে রয়েছে।

যারা জড়বাদী তারা বিশ্বাস করে, এ বিশ্বের বস্তু ও তার গতি চিরন্তন। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তিতে এ বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। তাই আল্লাহতে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণ এ বিশ্বের সূচনা নিয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। এদের ব্যাখ্যা ধর্মের ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু জড়বাদীরা বিশ্বের স্রষ্টাকে আঁড়ালে রেখে তাঁর অবাধ্য বান্দার ন্যায় এর উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মূলত বিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যাতে যতটুকু গড়মিল তা শুধু বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীগণের মারামারি কাটাকাটির বিষয়টি ধর্মীয় আলোকে দর্শন ও বিজ্ঞানের যুক্তি-তর্ক দিয়ে সমাধান করতে পারলে চরম অবিশ্বাসীরা পথে না আসলেও যারা উভয় সংকটের আবর্তে পড়ে মানসিকভাবে বিভ্রান্তিতে ভুগছেন, তারা হয়তো আলোর সন্ধান পাওয়ার আশা করতে পারেন। তাই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি কোত্থেকে হলো এ সম্পর্কে কে কি বলেছেন, তা তুলে ধরে সত্যের সন্ধানে আলোর মশাল জ্বালিয়ে ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে আসল তত্ত্ব বের করতে চেষ্টা করা দরকার।

বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে জড়বাদীদের ধারণা

লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ : ১৭৯৬ সালে ফরাসী গণিতবিদ পিয়ের লাপ্লাস (১৭৪৯-১৮২৭) এই তথ্য প্রচার করেন যে, সুদূর অতীতে বিশ্বে ছিল উষ্ণ গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জের সুবিস্তৃত নীহারিকা। এই বস্তুপুঞ্জ অনবরত পাক খেতে খেতে মাঝখানে জমে ওঠে, এর খানিকটা বস্তুর ঘনপিণ্ডে রূপ নেয়। তারপর এক সময় এই ঘন পিণ্ডটি সূর্যে পরিণত হয়। পরবর্তিতে সেটির চারপাশের বস্তুপুঞ্জ ঠাণ্ডা হতে শুরু করলে বস্তুপুঞ্জের আকার ছোট হয়ে আসে। কিন্তু ঘুরার বেগ বাড়তে থাকলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ঘুরন্ত খোলস পৃথক হয়ে পড়ে এবং সেগুলো জমাট বেধে নানা গ্রহ-উপগ্রহে রূপ নেয়।

www.nagorikpathagar.org

জীনসের আকস্মিক নৈকট্যবাদ : ১৯১৭ সালে বিশিষ্ট গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীনস (১৮৭৭-১৯৪৬) মহাবিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় বলেন, দু'টি নক্ষত্রের মধ্যে একটি ছিল সূর্য এবং অন্যটি অতি বিশাল নক্ষত্র। সেটি সূর্যের কাছ দিয়ে ঘুরে যাবার সময় আকর্ষণের টানে সূর্যের বুক হতে গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ পটলের আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে। এই বস্তুপুঞ্জ সূর্যের চারপাশে চক্রাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হয়।

ভাইত সেকার ও স্মিটের সংশোধিত নীহারিকাবাদ

১৯৪৩-৪৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ভাইত সেকার ও সোভিয়েট গণিতবিদ অটোস্মিট পৃথক পৃথকভাবে মত প্রকাশ করেন যে, উত্তপ্ত গ্যাসীয় বস্তু সূর্য হতে নয় বরং শীতল বস্তু কণিকা পুঞ্জের নিরন্তর গতিশীলতার ফলে অসংখ্য ছোট বড় পাকের সৃষ্টি হয়। তার চারপাশে ঘুমন্ত অন্যান্য বস্তু কণিকার সমাবেশ নানা আকারের শীতল আদি গ্রহ কণিকার পিণ্ড সৃষ্টি করে। শীতল সূর্যের ক্রমান্বয়ে বস্তুর সংকোচনে সংঘাতের সৃষ্টি হলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে তাপের উদ্ভব ঘটে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ও নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সংকোচনের ফলে অন্যান্য গ্রহ পরবর্তি পর্যায়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই মতবাদটিই বর্তমানের বিজ্ঞানীদের দ্বারা সমাদৃত।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই বিশ্বে যখন কোথাও কোন কিছু ছিল না তখন হঠাৎ একটা বিন্দুতে ভর-শক্তির সমাবেশ ঘটে। এই ভর-শক্তি অতি উচ্চ অভ্যন্তরীণ চাপে একটি ক্ষুদ্র এলাকায় ঘূর্ণীভূত আকারে সাবানের বুদবুদের ন্যায় অস্থিতিশীল সাম্যাবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল। এক সময় প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ চাপে এক প্রচণ্ড আদিম বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘূর্ণীভূত ভর-শক্তি চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকে এবং তখন থেকেই এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এখনও ক্রমবিকাশ ধারায় এই সৃষ্টি সম্প্রসারণ লাভ করছে।

এই ছিল জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে নিছক ধারণা। তাদের বর্ণনার স্বপক্ষে বিজ্ঞানের কোন প্রমাণ নির্ভর তত্ত্ব নেই। এটি এক প্রকার জঘন্য বিকৃত চিন্তা। এই চিন্তা মনের খেয়ালে উদ্ভাবনীয় ধারণা। এর মধ্যে অনেক কিছু উহ্য। তাদের বর্ণনায় কোথাও স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জগতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মকের যে জুটি আছে, এই জুটি কিভাবে সৃষ্টি হলো এর কোন সমাধান নেই। শীতল কিংবা উষ্ণ বস্তুপুঞ্জ অথবা ভর-শক্তি কিসের থেকে সৃষ্টি হলো এর কোন জবাব নেই। এহেন কোন কিছুই নেই থেকে যদি এতোসব সৃষ্টি হতে

www.nagorikpathagar.org

পারে, তবে এখন হয় না কেন? কে বন্ধ করে দিল এই প্রক্রিয়া? তারা এসব প্রশ্নের উত্তরের ধার না ধারে বলেন, দৈবক্রমেই এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও দৈবের নিয়মে তা চলছে। তারা আদিকাল থেকে এ বিশ্বে পরম সত্তা বলতে যে একজন ছিলেন একথা বিশ্বাস করতে নারাজ। কিন্তু স্রষ্টায় বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণ এই দৈব নিয়মের পক্ষপাতী নন। তারা মনে করেন, প্রাণ-মননশীল চৈতন্য শক্তির ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত এ বিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে না। আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীগণের ধারণা–

তারা মনে করেন, এ বিশ্ব-জগৎ কোন সময় দৈবের থেকে সৃষ্টি হয়নি। এর আইন-কানুন দৈবের কথা বিশ্বাস করে না। এ জগৎ সুপরিকল্পনাধীন ও নিয়মের বশীভূত।

বিজ্ঞানী জন ক্রীডল্যান্ড কথব্যান (গণিত ও রসায়ণবিদ পি. এইচ. ডি., কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়) বলেছেন, শক্তি যখন নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয় তখন এই রূপান্তর প্রক্রিয়া অত্যন্ত আইনানুগভাবে অগ্রসর হয় এবং রূপান্তরের ফলে নতুন যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তা ইতিপূর্বে বিদ্যমান পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব আইনেরই অধীন হয়। সেজন্য তিনি মনে করেন অনুভূতিহীন, প্রাণহীন জড় পদার্থ আপনা আপনি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে, অতঃপর দৈবক্রমে নিজেরাই নিজেদের ওপর আরোপিত হয়েছে তারপর দৈবক্রমেই তারা তাদের ওপর আরোপিত আছে, একথা সত্য নয়। নিঃসন্দেহে এই মহাবিশ্ব রীতি ও ক্রমের জগৎ, বিশৃঙ্খলার জগৎ নয়। এটি আইনের জগৎ। দৈব ও লক্ষ্যহীনতার জগৎ নয়।

অন্য আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেছেন, সকল পদার্থের পর্যায়বৃত্ত সারণীতে তার অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলো ইলেক্ট্রোন, প্রোটন, নিউটন যেভাবে সুসামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংগঠিত আছে তাতে প্রমাণ হয় এই বিশ্ব জগৎ কোন দ্বৈবের সৃষ্টি নয় বরং এর সুশৃঙ্খলতা এক মহাপ্রজ্ঞাময় মহান সৃষ্টিকর্তার বিচার বুদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ।

এলমার ডবলিউ মরার (রিসার্চ কেমিস্ট) বলেছেন, একটা বিরাট চুল্লীতে আমাদের পক্ষে যদি অগণিত সংখ্যক প্রোটন, নিউট্রন ইলেক্টোন এবং আণবিক গ্লু (যা পরমাণুগুলোকে এক সঙ্গে ধরে রাখে) একত্র করে উত্তপ্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে পর্যায়বৃত্ত সারণীতে ঠিক যেমনিভাবে তারা সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একশত অথবা তার কাছাকাছি সংখ্যক নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ধর্মসম্পন্ন পৃথক পৃথক

www.nagorikpathagar.org

মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে, সেভাবে আমাদের পক্ষে সেগুলো সৃষ্টি করার পথে অসুবিধা কি? কিন্তু আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক সে ধরনের বস্তুর অণু অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত কোন একটি বিশেষ ধরনের বস্তুর অণু সৃষ্টি করতে পেরেছেন কী? বরঞ্চ পারবেন না এটি-ই সত্য। সুতরাং এসব সৃষ্টির পেছনে রয়েছে মহাপরিকল্পকের সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

বিশ্বজগৎ উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও এর পর্যালোচনা

ধর্ম এমনি এক মূলনীতি যা মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। যে ধর্মের মূলনীতিতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নেই, সেটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নয়। শৈশব থেকে বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত যেসব বিষয় নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোরও সমাধান ধর্মের বাণীতে থাকা প্রয়োজন। শিশুর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে শুনেছি, বাবা ঐ চাঁদটা কী? ঐ সূর্যটা কী? এগুলো কে সৃষ্টি করেছে? চাঁদটা কেন আমার সাথে সাথে যায়? সূর্যটা কেন আলো দেয়? এগুলো ক'দিন ধরে এভাবে ঘুরছে? শূন্যের মধ্যে এরা থাকে কি করে? এগুলো বানাল কী দিয়ে? ইত্যাদি, ইত্যাদি শত প্রশ্ন। তাদের মাথায় আবার পরিণত বয়সে প্রশ্ন উদয় হয়, এ বিশ্ব কী আদি হতেই এরূপ অবস্থায় ছিল? একথা ভাবতে গেলেই নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। যার কারণ হলো অতীত সম্পর্কে আমাদের ধারণার সীমাবদ্ধতা। কখন এই বিশ্বে প্রকৃতি নামক সুষমনীতির খেলা শুরু হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। বরং তা জানার কথাও নয়। এর মূলে হলো প্রকৃতির সুষমনীতির বিবর্তন খেলা। পৃথিবীতে মানুষের খেলাফত শুরু হয়েছে অনেক বছর পর। এর কোন সঠিক হিসেব আমাদের জানা নেই। কিন্তু তার আগে যে কত কোটি কোটি বছর চলে গেছে তাও আমাদের অজানা। সেজন্য আমাদের পক্ষে বিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেয়া যেন মার পেটে থেকে দুনিয়ার খবর বলা বৈকি! তাই এতে সত্যের লেশমাত্র আছে কিনা সন্দেহের ব্যাপার।

আমাদের জানার স্পৃহা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। মানুষকে সেই স্বভাব জাত প্রবৃত্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তাই আমরা ভাবনাহীন বসে থাকতে পারি না। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করতে হলে যিনি এর স্থপতি তাঁর কারিকুলাম, তাঁর পরিকল্পনার নীতি-নক্সা অনুসরণ করেই সন্ধান করতে হবে। আল কুরআন বিশ্ব স্থপতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের পূর্ণাঙ্গ বিধান। এঁর বাণী কোন মানুষের কথা নয়। যিনি এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন সেগুলো তাঁরই কথা। স্রষ্টার সেই অমীয় বাণী

www.nagorikpathagar.org

মনোযোগের সাথে হজম করতে পারলেই সত্যের আলো হৃদয় রাজ্যকে করবে আলোকিত। তখন বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে দৈব চিন্তার হবে অবসান। কারণ এতে জীবন জিজ্ঞাসার রয়েছে সার্বিক প্রশ্নের যুক্তিনির্ভর উত্তর।

জড়বাদীরা যেসব প্রশ্নের সমাধান আজো দিতে পারেনি, যেখানে তারা ঠেকে গিয়ে বলে, এসব প্রশ্ন এতোই জটিল যার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেখানে আল কুরআনে এসব প্রশ্নেরও সমাধান রয়েছে। জড়বাদীরা যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ আসলেই তারা তা নিজে থেকে জানার কথা নয়। এর উত্তর জানতে হলে যিনি চিরঞ্জীব, আদি ও অনন্তে বিরাজিত আছেন তাঁর কথাই বিশ্বাস করতে হবে। এ বিশ্বে যখন সৃষ্টি বলতে কিছুই ছিল না তখন পরম স্থিতিশীল পরিবেশে পরম সত্তা আল্লাহ ছিলেন অনাদি ও অনন্তের মালিক। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেননি এবং তিনি মানব প্রজন্মের রীতিতে কাউকে সৃষ্টি করেননি। বস্তু ও বস্তুর উপাদান সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ কোন কারখানা স্থাপন করেননি।

সূরা ইখলাসে আল্লাহ অনন্তের খবর জানিয়ে দিয়েছেন : 'বল (হে মুহাম্মাদ) আল্লাহ এক ও একক, আল্লাহ কারো উপর নির্ভরশীল নন, সমস্ত কিছু নির্ভরশীল, তিনি জন্ম দেন না, জন্ম গ্রহণও করেন না; তাঁর সমতুল্য আর কেউই নেই।"

তিনি কি প্রক্রিয়ায় এই সৃষ্টিকে পয়দা করেছেন তার জবাবও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন– "আল্লাহ যা খুশি তাই সৃষ্টি করতে পারেন; যখন তিনি কোন কিছু ঘটাতে চান; তখন তাকে বলেন 'হও', আর অমনি হয়ে যায়।" (সূরা-৩ : ৪৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে– "আমি যে জিনিসের এরাদা করি সেজন্য শুধু এতটুকু বলতে হয় 'হয়ে যাও' তাহলেই তা হয়ে যায়।" (সূরা-১৬ : ৪০)

তারপর আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"তিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা"। (সূরা-৪২ : ১১)

এ জগৎ তিনি কত দিবসে সৃষ্টি করেছেন তাও উল্লেখ করেছেন :

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি ছয় দিবসে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ তার আদেশের আনুগত্য করছে। (সূরা-৭ : ৫৪)

"তুমি বল, তোমরা কি তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করছ যিনি দুই দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তাঁর অংশীদার খাড়া করছ? তিনি বিশ্ব-জগতের রব।" (সূরা-৪১ : ৯-১২)

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআনের ঐশী বাণী থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এ জগতময় যা কিছু আছে, সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক পরম চিরঞ্জীব আল্লাহ তা'আলা। তাঁর সৃষ্টি কৌশলের মাঝে নিজের প্রচণ্ড ক্ষমতার বলিষ্ঠ প্রমাণ নিহিত রয়েছে। তাঁর হুকুম করলেই হয়ে যাওয়া বলিষ্ঠ ক্ষমতারই নিদর্শন।

আল কুরআনের বাণীতে রয়েছে নৈতিক বিশ্বাসের বীজ। এর আলোচ্য বিষয়বস্তু আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীবনের বাস্তবতাকে নিয়ে লেখা। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু শুধু পদার্থ ও শক্তি নিয়েই লেখা। বিজ্ঞানের পুস্তকে রয়েছে বৈজ্ঞানিক থিওরী। যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল। সেদিক থেকে কুরআন বৈচিত্রমণ্ডিত ও সার্বজনীন এবং চির অপরিবর্তনীয়। এতে রয়েছে প্রচুর গবেষণার উপাদান। কারও পক্ষে গবেষণা করার সুযোগ না হলে বিশ্বাস করলেও তার দায়িত্বের ত্রুটি হবে না। তবে যারা গবেষণা করবে তাদের জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত বেতন বা পুরস্কার যে থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই গবেষণার পথ হতে হবে কোরআন হাদীসের অবলম্বনে।

প্রকৃতপক্ষে আল কুরআন একটি আত্মিক ও মানসিক জ্ঞানের সার অংশ। যখন বস্তু কিংবা বস্তুর উপাদান অথবা প্রাণী কিংবা প্রাণের কোন উপাদান ছিল না, সেই সময়ের কথা আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি কুরআনের মাধ্যমে। যিনি সকল কিছুর অনন্ত, তাঁর পক্ষ থেকেই এসেছে এই কিতাবের বাণী। আমরা সে কিতাবের মাধ্যমে জানলাম এ জগৎ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি 'হও' বললেই তা হয়ে গেছে। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর ভেতর-বাইরে শুধু শূন্য আর শূন্য নয়। একে ভাঙ্গলে কিছু না কিছু পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হলো বস্তুর সার অংশ বা এর উপাদান কিসের তৈরী? এগুলো আসল কোত্থেকে? অস্তিত্বহীন শূন্যের মধ্যে এই উপাদান কী করে সৃষ্টি হলো? জড়বাদীরা বলেন, দৈবক্রমে হঠাৎ একটি বিন্দুতে ভর-শক্তির আবির্ভাব হয়। কি করে হলো, কে সৃষ্টি করলো, এর জবাব তারা দিতে পারেন না। ধর্মীয় বিধানের রীতিতে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয় আল্লাহর ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকে। তিনি নিজকে প্রকাশ করার ইচ্ছায় এই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তাই সৃষ্টির অস্তিত্বের পেছনে খোদার অভিব্যক্তিই হলো জগৎ সৃষ্টির প্রথম ধাপ। এর সত্যতার প্রমাণ রয়েছে হাদীসে কুদসীতে। যেমন : "আমি ছিলাম একটি গুপ্তধন, আমি প্রকাশ হতে চাইলাম, তাই সৃষ্টি করলাম এই সৃষ্টিকে। ইচ্ছা আমি পরিচিত হই।"

আল্লাহ নিজকে প্রকাশ করার জন্য প্রথম যে জিনিস সৃষ্টি করেন, তার মাধ্যমে এ বিশ্বকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। সে জিনিস হলো আল্লাহর 'নূর'।

www.nagorikpathagar.org

কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে :

"আকাশ-পৃথিবী সমস্তই আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি।" (আল কুরআন)

'নূর' নামের পবিত্র সত্তা আল্লাহর সৃষ্টির আদি উপাদান, এ কথা আমরা জানতে পারলেও, এই পবিত্র সত্তা যে কিভাবে পয়দা হলো এ সম্পর্কে আমরা এখনও সমাধানে আসতে পারিনি।

এই সত্তা তো কোন অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করা হয়নি, তাহলে এ জিনিস আসলো কোত্থেকে? মূলত স্রষ্টার অভিব্যক্তি বা ইচ্ছার ব্যগ্রতা থেকে যে জিনিস বিচ্ছুরিত হয়, সেটিই এই পবিত্র সত্তা। আমাদের মনের অভিব্যক্তি যেমন দেহ রাজ্যের শিরা উপশিরায় ঢেউ-এর ন্যায় জাগরণ তোলে, তেমনি খোদার ইচ্ছার ব্যগ্রতায় পরম স্থিতিশীল শূন্য বিশ্বে ঢেউ জাগিয়ে দেয়। ঢেউ নামের এই গতিশক্তিই (পরম গতিশক্তি) বিশ্বের আদি সত্তা। মহামনের আবেগের তাড়নায় অসীম শূন্যস্থান তরঙ্গের দোলায় দোল খেয়ে উঠলে পরম গতি নামের এক বিশ্ব সৃষ্টি হয়। বিশ্বের সমস্ত উপাদানের ভেতরে এখনও তরঙ্গের জোয়ার বয়। তাই একথা প্রমাণ হয় যে, অচেতন জড় বস্তুর উপাদানও প্রাণ-মনশীল চৈতন্য শক্তি হতে উদ্ভব হয়েছে। আদি অবস্থায় পরম গতিশীল সে জগৎ খণ্ডিত ছিল না। সেটি ছিল স্তূপের মতো অনড়। যার প্রমাণে বলা যায় আজ অবধি শূন্যমণ্ডল সেই গুণ হারায়নি। এটি বর্তমান কালেও বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে। তাঁরা বলেন, শূন্যমণ্ডলের রয়েছে তরঙ্গ ধারণ করার বিশেষ গুণ। এটি তার ব্যতিক্রমধর্মী গুণই বলা চলে। জড়বাদীদের অন্তঃসার শূন্য দৈব চিন্তার জগৎটিতে কি করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক যুগল জুটি পয়দা হলো এর কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু মহাপ্রভু এই দ্বৈত রূপ কি করে সৃষ্টি করেছেন তারও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

সৃষ্টির প্রথম পুরুষ হলো আদম (আ)। তাঁর কামনার সমমনা বিপরীত সত্তা নারী জাতি। তাঁর নাম হলো হাওয়া। আদম (আ) ও হাওয়ার বৈধ প্রণয়ের মাধ্যমে আত্মিক জগতের সকল আত্মাকুলসহ স্রষ্টার উদ্দেশ্যমুখী বিবর্তন প্রক্রিয়ায় 'নূর' থেকেই আলো ও তরঙ্গে পুটলি ইত্যাদিসহ জড় জগৎ, ফেরেশতার জগৎ, 'আরশ, কুর্সী, লওহ, কলম সবই তৈরি হয়। বস্তুর মৌল উপাদান হলো তরঙ্গের পুটলি। এখানেও ধনাত্মক ও ঋণাত্মকের প্রণয় জুটি রয়েছে। আত্মা ও জড়দেহ দু'টি ভিন্ন জিনিস হলেও সুদূর অতীত পেরিয়ে এ দুইয়ের মধ্যে মিলন ঘটলে সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে। তবে দর্শনের দৃষ্টিতে জড় উপাদানেও যেহেতু দ্বৈত রূপের সত্তা রয়েছে সে আলোকেই বলা চলে আত্মিক জগতের জ্যোতির কিরণ থেকেই এই জড় উপাদানের মৌল সত্তা সৃষ্টি হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআনে জগতের সকল কিছু সৃষ্টির মূল তত্ত্ব যুক্তিভিত্তিক কথায় প্রমাণ দেয়া হয়েছে। এতে বিরাট বিরাট বিষয়গুলো স্বল্প কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের মর্জি ও প্রকৃতিতে এর অনুসন্ধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করার দরজা খোলা আছে। মূলত কুরআনেই রয়েছে বিজ্ঞানের মাল-মসলা, যা মানুষকে জানার স্পৃহায় উজ্জীবিত করে। এদিক থেকে বিজ্ঞানের আলোচনা দীর্ঘ ও ব্যবহারিক কলা কৌশলসম্পন্ন হলেও কার্যত বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের কোন দ্বন্দ্ব নেই। আসলে যারা কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন তারা হলো জড়বাদী ও নাস্তিক। কালক্রমে এরা বিজ্ঞানেরও শত্রু। যাদেরকে বিজ্ঞানের জনক বলা হয় তাঁরা ছিলেন পরম আস্তিক। তাঁরা এ জগৎকে স্রষ্টার রহস্যময় অভিপ্রায়ের জগৎ হিসেবেই কল্পনা করেছেন। তাঁরা কখনো দৈব চিন্তার ধার ধারেননি।

আস্তিক বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এর পেছনে রয়েছে এক অকল্পনীয় মহাজ্ঞানী সত্তার এক রহস্যময় অভিপ্রায়। বিজ্ঞানীদের সুদূর প্রসারী চিন্তা ও জিজ্ঞাসা এখানে বিমূঢ় হয়ে যায়। বিজ্ঞানের চূড়ান্ততম অগ্রগতিও সেখান থেকে তুচ্ছ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু সেই অন্তহীন মহাজাগতিক উদ্ভাস বিজ্ঞানীদের এই সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের দিকেই পরিচালিত করে যে, এই মহাবিস্ময়কর সৃষ্টির একজন নিয়ন্ত্রক আছেন, যিনি অলৌকিক জ্ঞানময়। তাঁর সৃষ্টিকেই শুধু অনুভব করা যায়। কিন্তু তাঁকে মানব কল্পনায় বিধৃত করা যায় না।"

স্যার জেমস জীনস বলেছেন, "মহাবিশ্ব আমাদের সকলের মনের অতলে অবস্থিত এবং সকল মনের সমন্বয় সাধনকারী কোন এক মহান মহাবিশ্বজনীন মনে সৃষ্টি, মনে হয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যেন সেদিকেই প্রধাবিত হচ্ছে।"

এই বিশ্ব যেহেতু মহামনের অভিপ্রায়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফসল এবং এর মূল উপাদান 'নূর' যেহেতু কোন কোষাগারে রক্ষিত ছিল না, সেহেতু স্থির বিশ্ব-ভুবনের শূন্য পরিবেশটিতে তাঁর অভিপ্রায়ের স্পন্দনময় তরঙ্গ গতিই এ জগতের আদি সত্তা। কালক্রমে ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও নৈর্ব্যক্তিক এবং নিউট্রোনোর সমন্বয়ে তৈরী হয় জড় পদার্থের মৌল কণা। আমরা যদি সৃষ্টির অন্তরের Sensory বোধকে Positive হিসেবে ধরে নেই, তখন দেখা যাবে তার আবেগ তাড়নার ফলে মহামন থেকে যে নির্দেশ আসল এটি নৈর্ব্যক্তিক হলে এর ক্রিয়ায় Positive হতে সে সত্তা বিচ্ছুরিত হয়, যেটি Negative সত্তা। এ সম্পর্কে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কি করে সৃষ্টি হলো, সেখানে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সার্বিক দিক বিচার করলে কুরআন হাদিসে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া আছে, এতে

www.nagorikpathagar.org

কোন দিক অপূর্ণ নেই। এতে যেমন রয়েছে বস্তু ও আত্মার কথা, তেমনি রয়েছে ধনাত্মক, ঋণাত্মক, নৈর্ব্যক্তিক (Neutral) ও এদের বৈরী সত্তা শয়তানের কথা।

এতো সুন্দর বর্ণনা থাকার পরও ধর্ম জ্ঞানহীন অন্ধ বুদ্ধিজীবি জড়বাদীগণ বিশ্বের উৎপত্তিতে নিয়ে এসেছে দৈব চিন্তা। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, হঠাৎ একটি বিন্দুতে ভরশক্তি উৎপত্তি হলো কিভাবে, অভ্যন্তরীণ চাপ, ঘনায়ন, রূপায়ণ, আকর্ষণ, নৈকট্যবাদ ইত্যাদি হওয়ার কারণ কি? এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো কোন শক্তি তাদের বুদ্ধির ঝুড়িতে নেই। এদের বর্ণনায় নেই স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সুষমনীতির স্বাক্ষর। সব জায়গায় আছে শুধু বিস্ফোরণ আর বিস্ফোরণ। এরা সকল প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ। কিন্তু আল কুরআনের দৃষ্টিতে যারা বিশ্বের সূচনার কথা চিন্তা করেন, তাদের কথা হল সুষমনীতির পক্ষে, আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসের আলোকে তার অভিপ্রায়ের ফসল হিসেবে। এর জন্য তাদের পক্ষে কোন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে হয় না। তাই যেটি অপূর্ণ নয় সেটিই সত্য ও সুন্দর।

আল্লাহ বলেন– "তারা কি পৃথিবী ও আকাশের ব্যবস্থাকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে না? আল্লাহ যে বস্তু পয়দা করেছেন তার ওপরও কি তারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না?

"অবশ্যই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য"। (সূরা আলে-ইমরান : ১৯৯)

আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও রাত-দিনের ঘূর্ণন– এসব কোন কিছুই পরিকল্পনা বিহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এ জগতে প্রকৃতির নিয়মনীতি বলতে একটি বাঁধাধরা সুষমনীতি আছে। প্রকৃতির এই নিয়ম-নীতি পর্যবেক্ষণ করলে এর কোথাও কোন দৈবের আক্রমণ চলতে দেখা যায় না। আকাশে মেঘ না থাকলে যেমন আকাশ সাঁঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় না, তেমনি মেঘপূর্ণ আকাশের মেঘের কণাগুলো শীতল না হলে বৃষ্টি হয় না। মেঘহীন বৃষ্টি হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি কিছুই ছিল না এমন অনস্তিত্ব থেকে বিশ্বের এই সুন্দর কাঠামোর মূল উপাদান সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব। পক্ষান্তরে স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টি অস্তিত্বে আসাও অসম্ভব। নজরুল না হলে যেমন নজরুল সাহিত্য সৃষ্টি হতো না, সে আলোকেই বলা যায়, স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের কথা ভাবা অবাস্তব।

এরূপ ধারণায় যারা বিশ্বাসী তারা চেতনাহীন জড়বস্তুর মতো সীমাবদ্ধতা ও কুটিলতার মধ্যেই বন্দি। এদের অন্তর দৃষ্টিতে জড়তার ছানি ধরেছে। কিন্তু আমরা আজ যে জড় প্রাচীরে বন্দি এই জড় উপাদানের মূল স্তূপ নিয়ে চিন্তা করার আগে আমাদেরকে ভাবতে হবে এর মৌল উপাদান কোত্থেকে এলো। যারা এই

www.nagorikpathagar.org

মহাবিশ্বের মূল উপাদান গ্যাসীয় পিণ্ডের ন্যায় ছিল বলে ভাবেন, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, এই গ্যাসীয় পিণ্ডের মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নামের যে মৌলিক উপাদান রয়েছে, এগুলো সৃষ্টি হলো কি করে? মহাবিশ্বের আদি সুবিশাল নীহারিকা বা নেবুলা যা দিয়ে তেরী ছিল তার মধ্যে যে ভিন্ন ধরনের আদান ছিল এগুলো তৈরী হলো কিভাবে? মূল নীহারিকা থেকে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে অসংখ্য ছায়াপথের সৃষ্টি হলো, সেখানে কী পানি ছিল? পানি যদি না থাকে তবে পানি সৃষ্টির প্রক্রিয়া উদ্ভব হলো কি করে? অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে কি একসাথে লাগিয়ে দিলেই পানি তৈরি হয়ে যাবে? এর জন্য কী কোন সুষম বৈজ্ঞানিক নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই?

আসলে পরিকল্পনা ও আইনানুগ নীতি ও কর্মপন্থা ব্যতীত কোন কিছু সৃষ্টি হওয়ার কথা যারা চিন্তা করেন তাদের পক্ষে দৈব চিন্তা না করে যে উত্তর দেয়ার বিকল্প কোন পথ নেই। তাই বিবেক বুদ্ধিকে এরা নাড়াচাড়া না করেই বলে দেন, এই জগৎ দৈবক্রমেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধর্মের ঐশী বাণীতে ধর্মের ভাষায় স্থূল অর্থে কিংবা রূপক ইঙ্গিতে আত্মিক দ্বৈত রূপসহ আসমান জমিনে যা কিছু আছে, সেসব কিভাবে পয়দা হয়েছে তার সুন্দর জবাব দেওয়া আছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থূল অর্থকে কিংবা রূপক উদাহরণকে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে কুরআন থেকেই সকল যুক্তি পাওয়া সম্ভব।

মানব আত্মা আত্মিক জগতের সূক্ষ্ম উপাদান। এক আত্মা থেকেই তার সহধর্মিণী সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দু'জনের মাধ্যমেই আরও অসংখ্যজন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পৃথিবী, আসমান, জমিন সবই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে। এই পৃথিবী ও আসমান জমিনের বাহ্যিক সত্তার সকল উপাদান আমাদের বৈরী নয়। এর সাথে রয়েছে আমাদের পবিত্রতম সম্পর্ক। তাই সূক্ষ্ম চিন্তায় এ জগতের সকল উপাদানের মধ্যে যে দ্বৈত রূপ দেখা যায় এগুলোও এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রথম পুরুষ ও তার যুগল সম্পর্কে সহধর্মিণীর বৈধ প্রেমাবেগের মাধ্যমেই পয়দা হয়েছে। তারপর মর্তের জগৎ আদমের বাস উপযোগী হলে তাঁরা দু'জন নেমে আসেন নিম্ন জগতে। এখানে তারা বাণিজ্য করে ফিরে যাবে সেই অনন্তের দিকে। এসব কিছুই স্রষ্টার পরিকল্পনার সার্থক রূপ। তাই ধর্মে যারা বিশ্বাসী তারা দৈব ভূতের কথা চিন্তাই করেন না। লিভ টুগেদার নামের অশ্লীল স্বপ্ন তাদেরকে গ্রাস করতে পারে না। এ ধরনের ফিৎরাত বা স্বভাব দিয়েই মানব আত্মাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ বলেন :

"তোমরা ভয় কর সেই প্রভুকে যিনি এক আত্মা থেকে সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা হতে সৃষ্টি করেছেন তার সহর্ধমিণীকে এবং সেই দু'জন (আদম এবং হাওয়া) হতে তিনি সকল পুরুষ ও নারীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা-৪ : ১)

"এবং আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরা-৫১ : ৪৯)

"এবং তিনি সমস্ত জিনিসের যুগল সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা-৪৩ : ১২)

মানব আত্মা আত্মিক জগতের সত্তা। এটি রহস্যময় অবিমিশ্র সত্তা। একে ধরা যায় না, দেখাও যায় না। এটি অবিনশ্বর ও পরিবর্তনহীন। এর অস্তিত্ব অনুভব করার মতো। অপরদিকে দেহসত্তা বা জড়সত্তা যৌগিক জিনিস। এর আকার আকৃতি আছে। একে ভাগ করা যায়; ধরা যায়। এর ওজন নেয়া যায়। এটি নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। এ ধরনের জিনিস পরমূর্ত। এ জিনিস কখনো স্রষ্টার ভূমিকা নিতে পারে না। তাই সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বস্তুর আদি উপাদান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে শুরু হয়নি। কারণ বিবর্তনের ক্রমধারা এক ধাপে গড়ে উঠেনি। প্রথম ধাপের সিঁড়ি বেয়েই নিম্ন ধাপে নামতে হয়েছে। কিন্তু জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ ঊর্ধ্ব জগতের প্রাণ-মননশীল চৈতন্য শক্তির সুমহান ধাপটিই সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যাতে নিয়ে আসেননি। সে কারণেই তারা সকল প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ।

মূলত আত্মার প্রকাশের আবরণ বা খোলস হলো জড়দেহ। এর উপাদান আত্মার যুগল সম্পর্কের ন্যায় দ্বৈত গুণের সম্বন্ধশীল। তাই এটি নারীও নয়, পুরুষও নয় এমন কোন উপাদান থেকে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হয়নি। জড়বস্তুর কণাকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যে ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যাকে আর ভাঙ্গা সম্ভব নয় এমন পর্যায়ের উপাদানটিই হয়তো আত্মার যুগল পথ ধরেই নিম্নে নেমে এসেছে।

এর ঘনায়ন ও রূপায়নের মাধ্যমেই হয়তো আদি নেবুলার সৃষ্টি হয়। এখানে স্মরণীয়, সকল কিছুর আদি উপাদান হলো 'নূর'। এর মৌলিক রূপ এখনো বৈজ্ঞানিকদের অজানা রয়েছে। কারণ নূর ও আলোকের ধর্ম বিশ্লেষণ করলে যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় তা হলো, আলোকের দ্বৈত রূপ আছে কিন্তু নূর এই বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। দ্বৈত গুণহীন প্রত্যক্ষ সত্তা দিয়ে যদি এ জগতের মৌলিক সত্তা জন্ম হতো, কিংবা অচেতন দু'টি সত্তার সংস্পর্শের মাধ্যমে যদি এ

www.nagorikpathagar.org

জগৎ গড়ে উঠত, তবে সেই পথ এখনো খোলা থাকত অথবা প্রাণ-মননশীল চৈতন্য শক্তির সংশ্রব ব্যতীত যদি এ বিশ্ব সৃষ্টি হত তবে সুষমনীতির পরিবর্তে এখনও সর্বত্রই দৈব লীলা চলতে থাকত। যেহেতু এরূপ কোন দৈব লীলার কথা ইতিহাসের কোথাও ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই জড়বাদীদের তত্ত্ব সুষমনীতির বিরুদ্ধে সত্যের অপলাপ মাত্র। সেজন্য সত্য ও আইনানুগ ব্যাখ্যা পেতে হলে ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েই গবেষণা করা প্রয়োজন।

জড় উপাদান কঠিন, তরল, ও বায়বীয় অবস্থায় থাকে। এর সব ক'টি উপাদান কী একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে? আমরা মন থেকে বা কল্পনার দুয়ার খুলে এর যত উত্তরই দেই না কেন তার কোন সঠিক সূত্র দিতে পারব না। এটি যেহেতু আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির জিজ্ঞাস্য বিষয় সেহেতু ঐশী বাণী তালাশ করলে এরও সমাধান পাওয়া যাবে আশা করি। যেমন এই মর্তের মায়া ভূমিতে স্বর্গের আদম (আ) ও হাওয়া ফিরে এসে কি পুরুষ ও নারীর মডেলের রেডিমেট দু'টি পুতুলের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছিলেন? তাঁরা দু'জন দুনিয়াতে আসার মাধ্যমই যেহেতু বর্তমান বিশ্ব পূর্ণতার দিকে ফিরে যাচ্ছে, তাই এটিও আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির জিজ্ঞাস্য বিষয়। এসব প্রশ্নের যদি ধর্মীয় সূক্ষ্মনীতি তালাশ করে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তবে সবদিকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করা সম্ভব। আমার লেখা "আদমের আদি উৎস" গ্রন্থে আদম (আ) ও বিবি হাওয়া কোন পথে দুনিয়ায় আবির্ভাব হয়েছে– তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই পরিশেষে পাঠক মহলের কাছে ঐ গ্রন্থটি পড়ারও আমন্ত্রণ রইল। ❐

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

এ গ্রন্থখানি প্রণয়নে আমি অসংখ্য লেখকের মহামূল্যবান গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে যেসব গ্রন্থের নাম আমার স্মৃতিতে ছিল না সেগুলোর নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। তবে যেগুলো স্মৃতিপটে গাঁথা ছিল সেগুলোর নাম পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। আল কুরআনুল মাজীদ – আধুনিক প্রকাশনী

২। আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন – গোলাম সোবহান

৩। মৃত্যু যবনিকার ওপারে – আধুনিক প্রকাশনী

৪। বিশ্ব নবী – গোলাম মোস্তফা

৫। বাইবেল, কুরআন, বিজ্ঞান – ড. মরিস বুকাইলী

৬। কুরআন, মুহাম্মদ (সা), বিজ্ঞান – তাইফুর রহমান

৭। ইসলামী দর্শন – আল্লামা শিবলী নু'মানী

৮। বিজ্ঞান, সমাজ ধর্ম – প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম

৯। আদম ও শয়তান – মওলানা আঃ মতিন

১০। চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব – জন ক্লোভার মোনজমা

১১। কিমিয়ায়ে সা'আদাত – ইমাম গাজ্জালী

১২। সৌভাগ্যের পরশ মণি – ইমাম গাজ্জালী

১৩। ইসলামী সংস্কৃতির মমর্কথা – আধুনিক প্রকাশনী

১৪। হাদীসে কুদসী – আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (রহ)

১৫। জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম – অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

১৬। বিজ্ঞান না কুরআন – মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

১৭। স্নাতক পদার্থ বিজ্ঞান – মুসলেম উদ্দীন

১৮। উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান – ইসহাক ও নুরুন্নবী

১৯। আধুনিক বিজ্ঞান – আবদুল্লাহ আল মূতী সরফুদ্দীন

২০। Anatomy and Physiology for nurses _ Shella M. Jackson

২১। Pharmacology _ B. N. Ghosh

২২। ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে ও পরে – মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

২৩। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারী – ফরিদ ওয়াজদী আফিন্দী

২৪। সাময়িকী - মাসিক মদিনা, পৃথিবী, ঢাকা ডাইজেষ্ট, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংবাদ

www.nagorikpathagar.org

ISBN 984-300-000294-7

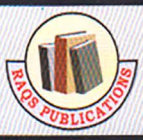

RAQS
Publications